মহারুদ্র

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বশ্রী সাহিত্য সমিতি
৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক—

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ

৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড

কলিকাতা—৬



জন্মাষ্টমী—১৩৬২

দাম চার টাকা

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীপ্রভাত কর্মকার :

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন প্রেস :

মুদ্রাকর :
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল :
নিউ মহামায়া প্রেস :
৬৫।৭ কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২ :

ব্লক মেকার :
সিটি আর্ট প্রডাকসন :

বাইণ্ডার :
ফ্রেণ্ডস বাইণ্ডিং কনসার্ণ :

এই লেখকের লেখা :

স্বাক্ষর :
সন্ধ্যারাগ :
চিতাবহ্নিমান :
জীবনরুদ্র :
কালরুদ্র :
মহারুদ্র :
জ্যোতির্ময় :
মেঘমেদুর :
হে-মোর দুর্ভগা দেশ :
পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ :
আশার ছলনে ভুলি :
তুঁহু মম জীবন :
জলে জাগে ঢেউ :

দরদী কবি—

শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

করকমলেষু

ফাল্গুনী

দীর্ঘকাল পরে 'মহারুদ্র' বের হোল। এতাবৎ এই বইখানি প্রকাশ করতে না পারার জন্য পাঠকগণের কাছ থেকে আমরা অসংখ্য অনুযোগ-অভিযোগ শুনেছি—যাকে আমরা সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

জীবনরুদ্র-কালরুদ্র-মহারুদ্র ফাল্গুনীর এক অসাধারণ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। তাঁর অনাসক্ত সৃজনী-প্রতিভার প্রকাশ।... তাঁর নায়ক বলে, "'মহাভারতের যুগ' অনাসক্তির যুগ; সঞ্জয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকলেই অনাসক্ত। এই সৃষ্টির যেন আবার প্রয়োজন হয়েছে পৃথিবীতে। নিস্পৃহ, মোহ-মমতাহীন হয়ে মানুষের জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করার দরকার আজ .. মঠ মাঠ মন্দির মানবসমাজ—সর্ব্বত্র বলতে হবে—'অন্নজলের ক্ষুধা আপনিই জাগে,—যৌন-ক্ষুধা জাগে যৌবনকালে স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে না দিলে জাগে না।' এই সেই পরম ক্ষুধা, যা জীবনকে করে জ্যোতির্ম্ময়—মৃত্যুকে করে অভীঃ।..."

ফাল্গুনীর এই সৃষ্টি আপনাদের অন্তর নন্দিত করুক, এই কামনা করি।

বিনীত

'দেবশ্রী'

জীবনরুদ্র * কালরুদ্র * মহারুদ্র

মানুষের শক্তিশালী মননশীলতার আলেখ্য

না, পরম ঔদাসিন্যে দেখলো সমস্ত ব্যাপারটা। কে ঐ অদ্ভুত কটি! ওকে যে পরম সাধুর থেকেও উঁচু মনে হচ্ছে। সাধু উঠে কাছে এসে তাকালো ওর পানে, তারপর বলল,

—আপনার ডেরা কাঁহা?

—ডেরা?—বিস্মিত লোকটি আধপোড়া বিড়িটা আঙুল দিয়ে ক হাসলো—বললো আমার ডেরা তামাম দুনিয়া!

—খানা-পিনা কাঁহা হোতা হ্যায়?—আবার শুধুলো সাধু।

—যাঁহা মিলতা হ্যায়— বলে উদাসীর মত লোকটা পোড়া বিড়িটা দিয়ে বলল, রাত ন' বাজা হ্যায়—আপকো ডেরা নেই হ্যায় তো সাথ আ-যাইয়ে— বলেই উঠলো।

চলতে লাগলো সেই বাউণ্ডুলে লোকটা, পিছনে সাধু—কাঁধে কম্বল, কমণ্ডলু আর আশা। কে জানে, কোথায় যাচ্ছে! সাধু কখানি এসে প্রশ্ন করলো—কাঁহা লে যায়েগা?

—আ-যাইয়ে সাধুজী!—উত্তর হোল।

আরো পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটার পর সাধু আবার প্রশ্ন করলো তনা দূর হ্যায়?

—আ-যাইয়ে— সংক্ষেপে জবাব হোল।

সাধু আর কিছু শুধুলো না, চলতে লাগলো ওর পিছনে। দীর্ঘক্ষণ চলেছে—বড় রাস্তা, গলি রাস্তা, পার্ক, মোড়—কত কি পার এল, শেষে সাধু অধৈর্য্য হয়ে বলল,

—আভি দের হ্যায়? কাঁহা তোমহারা ডেরা?

—তামাম্ দুনিয়া— বলে হাসল লোকটা, বলল—আ-যাইয়ে—।

আ-যাইয়ে' কথাটার ওপর শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে সাধুর। বলল,

—খালি আ-যাইয়ে বোলতা আউর চলতা, কাঁহা লে যায়েগা? তোমারা শ্বশুরাকা ঘরমে?

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

—জী হ্যাঁ— বলে উচ্চহাস্য করলো এবার লোকটি— বলল, শুনিয়ে সাধুজী, হাম ভূতভি নেহি হ্যায়, ভগবান ভি নেহি হ্যায়—আপকো মাফিক আদমি হ্যায়—ডর কাহে? আ-যাইয়ে—আউর দশ মিনিটমে পৌছা যায়েঙ্গা! হুঁয়া খানাভি মিল সেকতা, আউর রাতমে শোনেকো জাগা!

চলতে লাগলো আবার। আশ্চর্য্য নিরাসক্ত লোক! সাধুর জটাজুট, সুন্দর বেশ, লোটা-কম্বল দেখেও ওর মনে কিছুমাত্র যে শ্রদ্ধাসঙ্কোচের ভাব জেগেছে, এমন তো মনে হয় না! অথচ কেন ডেকে নিয়ে যাচ্ছে? কে ঐ লোকটি? কি ও?

ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছে দুজনে। রাত্রি প্রায় দশটা। শীতের হাওয়া দুজনকেই দখল করতে চায়, কিন্তু পথ-হাঁটার জন্য কাবু করতে পারছে না। অবশেষে যাত্রার শেষ হোল। ওরা এলো একটা মন্দিরের দরজায়। বেশ বড় মন্দির, অনেকখানি তার পরিধি—গঙ্গার কিনারে সারি সারি শিবালয়, এদিকে বিরাট দেউল—বেশ দেখতে!

—আ-যাইয়ে— বলল আবার লোকটা।

—চল— বলে সাধুও ঢুকলো ওর সঙ্গে।

গেটে ঢুকতেই একজন প্রশ্ন করলো লোকটিকে,—এত রাত্রে কোথা থেকে, কিশোর?

—এহি সাধুবাবাকে লিয়ে এলাম—থোড়া পরসাদ মিলবে জী?

—হ্যাঁ। এসো— বলে প্রশ্নকারী ওদের ভেতরে নিয়ে গেল।

মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই দেবমূর্ত্তি দেখা হোল না। সাধু প্রসাদ পেয়ে চত্বরের এক কোণায় কম্বল ঢাকা দিয়ে শোবার আয়োজন করছে, অকস্মাৎ পথপ্রদর্শক কিশোর এসে ওর কাছ ঘেঁষে বলল,—খবর আচ্ছা হ্যায় সাধুবাবা?

—কিসকা খবর? —সাধু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—ওহি, আপলোককা আশ্রমকা?

—তুমি কি করে জানলে আমার আশ্রমের খবর?

—হ্যাঁ, আমি সমঝে লিয়েছে। আপনাকে গুরুদেবকা সাথ আমি ছুঁয়াত ছিল। গালে ওহি যো আঁচিল, ওহি আপনা-লোককা দস্তুর হ্যায়। ও হামকো দেখলা দিয়া কর্ণবিজয় সাধুজী—আপনাকো গুরুজী। উ সাধুবাবা বহুৎ ভালা সাধু, দেশকা বহুৎ ভালা করতা থা।

সাধু বিস্মিত হয়ে উঠে বসে বললো—তুমি কে, তোমার নাম কি? কর্ণবিজয়ের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা?

নওকিশোর সব বলল—কেমন করে কর্ণবিজয়কে সে সাহায্য করেছিল কয়েকবছর পূর্ব্বে। সব শুনে সাধুরূপী সিদ্ধেশ্বর বলল, —আমার ভাগ্য যে তোমার সঙ্গে দেখা হোল। অবন্তী এখন কোথায় আছে, তুমি জান কি? আর আলোক?

—না, হামি খোঁজ লেবে। আউর আলোকদাদা কাঁহা, উভি নাহি জানে। আজ তো ঘুম যাইয়ে। কাল দিখা যায়েগা।

পরম নিশ্চিন্তে বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ওখানেই শুয়ে পড়ল নওকিশোর। সাধুও শুলো, কিন্তু ঘুম তার আসছে না। কত কি ভাবছে! সামনে স্রোতোচ্ছল গঙ্গার খানিকটা দেখা যায়। নিকটের রেলসেতুর ওপর একখানা ট্রেণ চলে গেল, তার শব্দ—রাতচরা পাখীর কণ্ঠস্বর—কত কি মিলিয়ে এক বিচিত্র জগৎ যেন প্রকাশিত হয়েছে ওখানে। কিন্তু সকলকে অতিক্রম করে সিধুর অন্তরে এক অজানা পুরুষের সৃষ্টিছাড়া সাধনার কথাই জাগ্রত হয়ে উঠছে, যিনি এখানে বিবাহিতা বধূকে ইষ্টদেবীরূপে আরাধনা করে বিশ্বে বিচিত্র সাধনার ইতিহাস রেখে গেছেন।

সিধু এসেছে এদেশে বিবাহ-না-করা এক বধূর খোঁজে—সত্যি সে সিধুর কেউ নয়, কোনোদিনই কেউ ছিল না। তবু কেন এল সিধু? সাধু সিদ্ধেশ্বরের এই কি সাধনা!

কম্বলে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো সিধু; শীতের দীর্ঘরাত্রি শেষই হয় না—অবশেষে অনেকটা রাত্রি থাকতেই উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতে মনস্থ করলো। চেয়ে দেখলো—নওকিশোর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। আধপোড়া বিড়িটা তখনও কাণে গোঁজা। সিধু উঠে গেল।

সাতবছর স্বেচ্ছাবন্দী আলোকনাথ।

দৈনিক সংবাদপত্রের কয়েকটা পাতা ছাড়া পৃথিবীর আর কিছুর সঙ্গে ওর যোগ নেই। শ্যামবাজারের এক আধো-অন্ধকার কুঠরীতে নিঃশব্দে ও কাটিয়ে দিল অঞ্জনার প্রাইভেট টিউটার হয়ে আর ওর বাবার অভিধান-সঙ্কলনের সাহায্য করে।

অঞ্জনা এর মধ্যে পড়া ছেড়েছে, বিবাহিত হয়েছে এবং দুটি সন্তানের মা হয়েছে। কিন্তু ওর বাবার অভিধান-সঙ্কলন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি বলে আলোককে তিনি বাড়িতেই রেখে দিয়েছেন। অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক,—আপনার সৎ খেয়াল নিয়ে বেশ আছেন। তবে সম্প্রতি তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল থাকছে না, তাই একদিন আলোককে ডেকে বললেন,—তাঁর গবেষিত এবং সঙ্কলিত অভিধান এবার ছাপার ব্যবস্থা করা হোক। আলোক এই কাজটা শেষ করে ছুটি পাবে।

ভাল একটা ছাপাখানার সঙ্গে অবিলম্বে চুক্তি করা দরকার; ছাপাখানার খোঁজে তাই বেরুল আলোক।

সহরটা যেন আগাগোড়া নতুন লাগছে ওর চোখে। পূরো সাতটা বছর সে বাড়ীর বের হয়নি। অন্য যে-কোনো মানুষের পক্ষেই এভাবে গৃহবন্দী হয়ে দিন কাটানো অসম্ভব, কিন্তু আলোক অনায়াসে এই স্বেচ্ছাবন্দিত্বকে স্বীকার করেছিল। সংবাদপত্রের পাতায় ভারতের শত সহস্র দুঃখদুর্গতির সঙ্গে সম্মুখের প্রসারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সহস্র.

সুখসমৃদ্ধির আশ্বাস সে সমানভাবে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু যে নির্ব্বিকার মন নিয়ে সে এই সাতটা বছর কাটিয়েছে, বাইরে বেরিয়েই সেই নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করা যেন আর সম্ভব হচ্ছে না।

কী বিশাল, বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে এই সামান্য সাতটা বছরের মধ্যে! অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলো আলোক—স্বাধীন ভারতের দিগন্তবিথারী আকাশ-বাতাস আর আলোক-পুলক ওকে যেন হাতছানি দিচ্ছে বাহির বিশ্বে বেরিয়ে আসতে। আনন্দের সাড়া সারা পৃথিবীতে! বাংলায় বাণীর আরাধনা-উৎসব বসন্তের আসন্ন আবির্ভাব ঘোষণা করছে—আলোক দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলো, কচিয়ে ওঠা দেবদারু গাছের পাতাগুলো···শীতের ডালিয়ার বর্ণ-বৈচিত্র্য···কৃষ্ণচূড়ার আকাশ-ছোঁয়া রক্তাভা!

চলেছে আলোকনাথ শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদার পথে। সেই পুরাতন কলিকাতা—তবু যেন নতুন লাগছে! সকালের সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত আজ ওর চোখে নতুন। যে স্বল্পালোকে সে সাতবছর অবস্থান করেছে, তার স্নিগ্ধগম্ভীর পরিবেশ যোগাসনের যোগ্য হতে পারে, কিন্তু বাহির বিশ্বের আলোক-প্রাচুর্য্য যেন বরবধূর বাসকসজ্জা! অপরূপম্—পরিপূর্ণমানন্দম্— কিন্তু—

কোথায় যেন বাধা পেল আলোকনাথ। কী যেন ব্যথার রাগিণী মলিন করে দিচ্ছে এই আনন্দের শুভ্র-সুন্দর বেশকে। কী সেটা!

আলোক অগ্রসর হতে হতে ভাবতে লাগলো, সংবাদপত্রের মারফৎ দেশের খবরগুলো তার সবই প্রায় জানা—দুঃখ-দৈন্য এবং সুখ-শান্তির কোনোটাই অজ্ঞাত নেই, তারই প্রকট রূপ আজ চর্ম্মচক্ষে দেখছে আলোক। কী দেখছে!—

দেখছে শুষ্ক হাহাকার—জমাট অশ্রু! প্রকৃতির রাজ্যে আনন্দ-সঙ্গীত, কিন্তু মানুষের অন্তরে কোথাও আনন্দের রেশ নেই। অথচ

আনন্দের দিন আজ, আজ বাণীবোধন-দিবস। দলে দলে সব ছাত্রছাত্রী চলেছে উৎসব-বেশে—ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন হচ্ছে—শত সহস্র প্রতিমা সাজানো হচ্ছে পূজামণ্ডপে—তবু যেন কী অভাব, কী এক অপ্রকাশ্য বেদনা ওদের সব আনন্দকে পাথর-চাপা করে রেখেছে!

অন্তরের সুতীব্র অনুভূতি দিয়ে আলোক অনুভব করলো, উৎসবের বাহ্যিক প্রকাশ যতই চাকচিক্যময় হোক, আভ্যন্তরীণ উৎস যেন শুষ্ক—যেন নিরস! কেন এই বেদনা মানুষের?

শিয়ালদার কাছাকাছি বড় একটা ছাপাখানায় এসে পৌঁছাল আলোক। এক বিখ্যাত মুদ্রণালয়। অতি অল্প অবস্থা থেকে এই প্রেস আজ কলকাতা সহরের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ম্যানেজারের সঙ্গে আলোকের পূর্ব্বপরিচয় থাকার জন্য সে প্রথমেই এখানে এসেছে। কিন্তু এখানে সেদিন চলেছে সরস্বতীপূজার আয়োজন।

আলোকের খেয়ালই ছিলনা যে আজ পূজার দিন—ছুটি, সমস্ত কাজ বন্ধ। প্রেসের শতাধিক কর্ম্মী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত; স্বয়ং ম্যানেজারও রয়েছেন ওখানে। সুবৃহৎ প্রতিমা সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে; পূজার দ্রব্যসম্ভারে মণ্ডপ পূর্ণ। আলোক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

এ পূজা ছাত্রছাত্রীর নয়, মধ্যবিত্ত চাকুরিয়াদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্ব্বাহ হবে। আলোক দেখলো, আয়োজনে ব্যস্ত সকলেই—আমোদও করছে সবাই, তবু যেন তাদের আনন্দ নেই। কোথায় যেন কি একটা কাঁটা বিঁধে আছে মনের কোণে।

মধ্যবিত্ত আজ বিত্তহীন—সামান্য চাঁদা দিয়েও উৎসব করবার মত অবস্থা নেই তার আজ, কিন্তু করতে হচ্ছে এই উৎসব। মালিক হয়তো বেশী কিছু দেবে চাঁদা, কিন্তু কর্ম্মীদের সামান্য বেতন থেকে যৎসামান্য দেওয়াও যেন কষ্টকর ওদের পক্ষে। আলোক একজন কর্ম্মীকে প্রশ্ন করলো—

—এই উৎসবের ব্যয় কি প্রেস-মালিক দিচ্ছেন?

—না। প্রেস থেকে ঘর, তেরপল, আলো আর লরী দেওয়া হবে। চাঁদাও কিছু দেবেন ওঁরা। বাকী সব আমাদের নিজেদের চাঁদা।

—আপনাদের চাঁদা কি, যে যেমন বেতন পান, সেই অনুয়ায়ী?

—না। সব দু'টাকা করে।

—এ পূজা কি না করলেই হোত না?

—বরাবর করা হয়। আগে মালিক মোটা চাঁদা দিতেন—প্রায় সবটাই দিতেন ওঁরা; এখন আর দেন না। তবু আমরা পূজা বন্ধ করিনি—

—আপনাদের দু'টাকা দেওয়া মানেই তো ক্ষতি!

—হ্যাঁ। কিন্তু উপায় কি?— হাসলেন লোকটি।

আলোক আরো কয়েকটা প্রশ্ন করে জেনে নিল, এঁরা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণ নিতান্তই আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই দুটি টাকা দণ্ড দিচ্ছেন।

এই মর্য্যাদাই কাল হয়েছে। কিন্তু উপায় কি? অভিজাত আর অনভিজাতদের মাঝামাঝি এই মধ্যবিত্তরা। দেশের সংস্কার-সংস্কৃতি এঁরাই রক্ষা করেন। এঁদের মধ্য থেকেই ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর জন্মান—এঁরাই রক্ষা করেন সমাজকে; কিন্তু এঁরাই আজ উৎসন্ন যেতে বসেছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত লোপ পাবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই, এ আশঙ্কা করা অন্যায় হবে না।

তাহলে কি থাকবে শুধু উঁচুতলা আর নীচুতলা? চিন্তা করতে করতে বার হয়ে আসছে আলোক, অকস্মাৎ পরিচিত ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হেসে বললেন,

—কি খবর আলোকবাবু? বহুদিন দেখি নি!

—হ্যাঁ, বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আজ তো আপনাদের পূজার দিন—কাজের কথা কিছু হবে কি ?

—কথা হবে না কেন ? কাজ আজ বন্ধ থাকবে, কথা হতে আপত্তি কি.? আসুন—অফিসঘরে আসুন !

সাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন তিনি আলোককে। মস্ত বড় টেবিলে রাশীকৃত কাগজপত্র—টেলিফোন, টেবিল-ল্যাম্প—ব্লটিংপ্যাড, কলিং বেল। বসলেন তিনি, আলোকও বসল চেয়ারে।

—হ্যাঁ—তারপর কি খবর বলুন।—ওরে, দু'কাপ চা দিয়ে যা—

চাকরকে হুকুম করলেন। আলোক এখানে সম্মানিত, কারণ, উৎপলার আশ্রমে ম্যানেজার থাকাকালীন সে এই প্রেস থেকে বিস্তর কাজ করিয়েছে। বহু টাকা দিয়েছে এখানে—তাই তার এত খাতির। আলোক হেসে বলল,

—একখানা বড় বই ছাপাতে হবে—শব্দকোষ—প্রায় শতাধিক ফর্মার মত হবে। আর খুব শিগ্রি ছেপে দিতে হবে।

—বেশ তো। পাঠ্যপুস্তকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। মার্চ্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ছেপে দেব। কী সাইজ হবে ?

আলোক সাইজ, টাইপ ইত্যাদির বিষয় বলে দর ঠিক করলো; আগামী পরশু থেকেই কাজ আরম্ভ করা হবে—ব্যবস্থা করে বেরিয়ে এল। বেলা তখন প্রায় বারোটা। কোন্ দিকে যাবে একবার ভাবলো আলোক—বাড়ীই ফিরে যাবে—কিন্তু কি ভেবে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকেই অগ্রসর হোল সে। কোনো কাজ নেই, তবু ও চলে এল ষ্টেশনে,—ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। দীর্ঘক্ষণ দেখলো আলোক মানুষের অবস্থা আর দুরবস্থা—বাস্তুহারার আর বাসাধিকারীর মানসিকতা; স্বার্থ আর পরার্থ আর পরমার্থ যেন একাকার এখানে—এই যাত্রী-তীর্থে, এই জীবন-সঙ্গমে !

ষ্টেশন দেখতে বড় ভাল লাগে আলোকের। চিন্তার এতো বেশী খোরাক ও আর কোথাও পায় না। এ যেন এক জীবন্ত মহাকাব্য—প্রতি সর্গে অনন্ত বিচিত্র চরিত্র রূপায়িত হচ্ছে! দীর্ঘকাল পরে এই জনবহুল ষ্টেশনে এসে আলোক অনুভব করলো—স্বল্পান্ধকার গৃহকোণের গভীর প্রশান্তি আর বিশালায়ত এই জনবহুলতার বিচিত্র তরঙ্গের মধ্যে তফাৎ যতই বেশী হোক, অন্তর দুটিতেই রস আস্বাদন করতে পারে। শ্যামল অরণ্য আর তৃণহীন মরু মানবচিত্তকে সমান আনন্দই দিতে সক্ষম, যদি সে-আনন্দ গ্রহণ করবার মত শক্তি থাকে।

বাস্তুহারার বেদনা আর ব্যস্ত দম্পতির অভিসারযাত্রায় নিরপেক্ষ দর্শকের রসগ্রাহিতা সমানভাবেই তৃপ্ত হতে পারে—কিন্তু…এক জায়গায় এসে থেমে গেল আলোকনাথ—দেখলো একটা মেয়ে, জীর্ণ তার দেহ—শীর্ণকায়া—কিন্তু মুখখানা চেনা—

—অপর্ণা ?— বিস্ময়ে যেন আঁৎকে উঠলো আলোক।

—হ্যাঁ, দাদাবাবু— বলে উঠে বসতে চেষ্টা করলো অপর্ণা।

কিন্তু আলোক ওকে ডাক দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। অভাগীর জীবনের সঙ্গে আর নিজেকে জড়াতে চায় না আলোক—জড়িয়ে লাভ কিছু নেই। ও নিজের কর্ম্মদোষেই ফল ভোগ করছে। আলোক চলে যাবে—অকস্মাৎ কিন্তু অপর্ণা কোনোরকমে গড়িয়ে এসে পড়লো ওর পায়ের উপর।

—ছাড় অপর্ণা—ছাড়—

—চারদিন খাইনি, দাদাবাবু—

—তা আমি কি করবো ?

—দাদাবাবু—ভগবান তোমাকে এনে দিয়েছেন!

—হবে— আলোক পকেটে হাত দিল; একটা সিকি অপর্ণার সামনে ফেলে দিয়ে চলে আসছে, অপর্ণা বলল,

—কোথায় আছ, দাদাবাবু— ?

—বলবো না— বলে নিষ্ঠুরের মত চলে এল আলোক। অনেকটা এসেছে—পিছন ফিরে দেখলো, অপর্ণা চেয়ে রয়েছে তার পানে। আলোক নিজেকে কঠোর হয়ে সংযত করলো—শ্যামবাজারগামী একটা চলতি ট্রামে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আলোক—বসে চোখ বুজলো।

উৎপলার আশ্রম।

সরকার এবং সাধারণের দানে 'উৎপলাশ্রম' এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। বহু বিচিত্র বিভাগ ওখানে। বহু নারীর আশ্রয়স্থান। কিন্তু উৎপলা এই দীর্ঘ কয়েকটা বছর যেন ক্রমাগত নিবে আসছে। আলোকের পদত্যাগের পর থেকে ওর কী যে হয়েছে, কে জানে। সে-ই এখনো আশ্রমের সেক্রেটারী, কিন্তু সই করা ছাড়া আর কোনো কাজই সে করে না। অথচ আশ্রমটা বেশ বেড়ে উঠলো। এর মূলে অবশ্য আলোকেরই পরিকল্পনা, কিন্তু একে কার্য্যে পরিণত করেছেন বিকাশবাবু।

বিকাশ এখানে যোগ দেবার পর থেকেই এর উন্নতি। কেন কে জানে, উৎপলার নিকট উপেক্ষিত হওয়ার পর থেকে বিকাশ যেন শতবাহু দিয়ে এই আশ্রমটাকে সাহায্য করতে চায়। উৎপলাকে যেন সে দেখিয়ে দিতে চায়—আলোকের থেকে বিকাশের যোগ্যতা বহু সহস্রগুণ বেশী। যেন বুঝিয়ে দিতে চায়, চারিত্রিক শুদ্ধতা আর দার্শনিক মতবাদই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। কর্ম্মনৈপুণ্যের কৌশলপূর্ণ প্রয়োগও একান্ত প্রয়োজন জীবন-যুদ্ধক্ষেত্রে।

উৎপলা কিন্তু ভেবেছিল, উপেক্ষিত হয়ে বিকাশ বিরুদ্ধে যাবে। কিন্তু হোল উল্টো—বিকাশ আশ্রমটাকে অভিজাত করে তুললো।

বর্ত্তমানে ওর নাম সহরের সকলের জানা। সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন খবরের কাগজের কলমে ওর নাম থাকে। আর মাসে অন্ততঃ একদিন কোনো-না-কোনো বিরাট ব্যক্তি ওখানে বক্তৃতা করেন। এমন একটা ব্যাপার এই আশ্রম আজ।

সেদিনও এমনি একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। জনৈক বক্তা ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। বিরাট মণ্ডপ বিপুলভাবে সাজানো হয়েছে। ফুল-মালা-আলোতে পরিপূর্ণ সভাগৃহে বিচিত্রভূষণা নারীদের মূর্ত্তি ওকে পূর্ণশ্রী-মণ্ডিত করছে একে একে। উৎপলা কিন্তু এখনো এসে পৌছায়নি—তবে আসবে, জানিয়েছে।

মিঃ ম্যাকু সর্ব্বাগ্রে এসেছেন। এসেছে বিকাশ, আর মন্দার প্রডাক্‌সন্সএর মালিক মিঃ সাহা। আরো অনেকে এসেছেন পরিচিত এবং অপরিচিত। সভাটা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়—বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য—শুধু প্রচার এবং অর্থসংগ্রহ।

উৎপলা এলেই বিশিষ্ট অতিথিকে মাল্যদানের ব্যাপারটা পাকা করা হবে। কে মাল্যদান করবে, এখনো ঠিক হয়নি। মিঃ ম্যাকুর কন্যা মারাঠী ঢংএ শাড়ী পরে অপেক্ষা করছে—তার ইচ্ছা, সে-ই মাল্যদান করে। কিন্তু উৎপলার সম্মাত আবশ্যক, তাই মিঃ ম্যাকু অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন।

উৎপলার গাড়ী এসে পৌছাল অবশেষে। নামালেন তাকে মিঃ ম্যাকু এবং বিকাশ। নমস্কারাদির আদানপ্রদানের পর উৎপলা বলল, ভগবান বুদ্ধের একটি আইভরি-মূর্ত্তি সে উপহার দেবে বক্তাকে।

মূর্ত্তিটি ছোট, কিন্তু বড় সুন্দর। কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রশ্নের উত্তরে উৎপলা জানালো—তার জনৈক বন্ধু বার্ম্মা থেকে এটি পাঠিয়েছেন।

—কে এই বন্ধু? প্রশ্নটা বিকাশের মনেই উঠলো সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু মুখে সে কথা বলা সম্ভব হোল না। কারণ, উৎপলা যতটা বলবার বলেছে, অধিক কিছু প্রশ্ন করে জানতে গেলে সে চটে যাবে।

সময় হয়ে এলো—মান্যবর অতিথিও আসছেন। মিঃ ম্যাকুর কন্যা মালা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ উৎপলার বিস্ময়কে অতিক্রম করে যে এসে পৌছাল, উৎপলা তাকে চেনে—সে সিদ্ধেশ্বর। সাধুর বেশ, হাতে কাঠের কমণ্ডলু।

উৎপলা নত হয়ে নমস্কার করে ওকে বসতে বলল, কিন্তু অতি বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো—এ কোথা থেকে এল এবং কেন এল? মান্যবর অতিথিও এলেন, এবং মাল্যদানাদির পর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আড়াই হাজার বছরের অতীত দিনকে যেন মূর্ত্ত করে তুললেন বক্তা। অতি চমৎকার তাঁর বলার ভঙ্গী—নির্ব্বাক হয়ে শুনছিল শ্রোতাগণ। উৎপলা কিন্তু মাঝে মাঝে সেই সাধুর পানে চাইছিল—কেন এল সিদ্ধেশ্বর আজ এখানে? এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা করতে পারছিল না সে। সভা শেষ না হলে ওকে প্রশ্ন করার অবকাশও পাওয়া যাবে না। তাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সভা শেষ হোল—সকলে বিদায় গ্রহণ করলেন; শুধু বিকাশ, ম্যাকু আর উৎপলার যাবার দেরী আছে। উৎপলা সটান সাধুজীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো,

—আপনার নাম সিদ্ধেশ্বর—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—অবন্তীর খোঁজে এসেছেন কি?

—হ্যাঁ। জানেন কি তার কোনো খবর?

—জানি। কিন্তু সে খবর এখানে বলার নয়।

—বেশ, আপনার বাড়ীতে যাব।

—যাবেন ? তাহলে আমার গাড়ীতে উঠে বসুন গে।

সাধু আর কোনো কথা না বলে উৎপলার গাড়ীতে এসে উঠল; চোখ বুজে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে উৎপলা এসে ওর পাশে বসে ড্রাইভারকে বাড়ী যেতে আদেশ করলো।

পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে উৎপলা ঐ সাধুবেশী সিদ্ধেশ্বরের পানে। ওর বিষয়ে অনেক কথাই জানে উৎপলা—অবন্তীর কাছেই শুনেছে। শুনেছে, অসাধাবণ ত্যাগী আব মানবত্ববোধে বিশ্বাসী এই সিদ্ধেশ্বর। গাড়ীর স্বল্পালোকে জটাজুটমণ্ডিত গৈরিকবাস সিধুকে দেখতে দেখতে উৎপলার মনে পড়লো—সিদ্ধার্থ সাধুদর্শনের পর গৃহত্যাগ করেন। সেই দিব্য পুরুষের জীবনালোচনাই সভায় শুনে এল উৎপলা। কিন্তু সাধু-দর্শনের পর সিদ্ধার্থের অন্তরে যে ভাব উদয় হয়, উৎপলার তো তা হবার কথা নয়। তবু যেন তার মানবীয় চেতনায় কিঞ্চিৎ দৈবী ভাব সে অনুভব করছে। প্রশ্ন করলো সিধুকে,

—আজকাল কোথায় আশ্রম আপনাদের ?

—ভারতের সর্ব্বত্রই আমাদের শাখা রয়েছে। তবে আমি এখন থাকি যমুনোত্তরী যাবার পথে একটা গুহায়।

—ওখানেই সাধনা করছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। কিছুদিন একান্তভাবে নির্জ্জনবাস না করলে নিজকে অন্তর্মুখী করা যায় না— সিধু যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বললো এই কথা।

—আশা করি, সে সাধনায় আপনি সিদ্ধ হয়েছেন ?

—না, পলা দেবী, সিদ্ধ হওয়া অত সহজ নয়। ওটা অভ্যাস মাত্র। কিন্তু আরোপিত ব্যাপার—আসে, আবার চলেও যেতে পারে।

—ইংরাজী ভাষায় কিন্তু বলে, অভ্যাস প্রকৃতিরই সমকক্ষ—

—হ্যাঁ—যতক্ষণ সেটা বজায় থাকে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তনও সম্ভব; এই দেখুন না, আমি-ই শৈশবে ছিলাম দুরন্ত, যৌবনের প্রথমদিকে চঞ্চল এবং চরিত্রহীন—বিলাসী; নাস্তিকও ছিলাম মনে হয়—এখন বিলাসিতা ছেড়েছি, চরিত্রও হয়তো শুধরে নিতে পেরেছি; কিন্তু মনকে আজও পরিপূর্ণভাবে অন্তর্মুখীন করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। বাসনা-ত্যাগ কি আজও হয়েছে আমার? জানি না, এখনো আসক্তির মূল কতটা রয়েছে কে জানে!

—অবন্তীর খোঁজে আসা কি আপনার আসক্তির জন্য? বৈরাগ্যবান পুরুষ আপনি—

—ঠিক তা মনে হয় না। শাস্ত্র-নির্দ্দেশ আর গুরু-আজ্ঞা—'সাত থেকে বারো বছরের মধ্যে একবার জন্মভূমি আর নিকট আত্মীয়দের খোঁজ করে দেখবে, তার পর সন্ন্যাস নেবে'। অবন্তীকে ছাড়া আমার আর কোনো আত্মীয় কোথাও নেই, জন্মভূমি তো ছেড়েই এসেছি—

—আপনি কি এখনো সন্ন্যাস নেননি?

—না। আমি এখনো ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়ে রয়েছি। সন্ন্যাস নেব এবার, অবশ্য অবন্তীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। কোথায় আছে সে?

—সে ভাল আছে। খুবই ভাল আছে। আছে এক মন্দিরে।

—মন্দিরে!— সিধুর কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ—দেবমন্দির নয়, শিশুদেবতার মন্দির। শিশু-বিশ্ববিত্যালয়, অথবা বিশ্ব-শিশুবিত্যালয়— হাসলো উৎপলা কথা বলতে বলতে।

—সে কোথায়? কি হয় সেখানে?

—কলকাতা থেকে শ'খানেক মাইল দূরে একটা জায়গা। ওর নাম 'মানবক-মন্দির'। হাজার বিঘে জমির উপর ঐ মানবক-মন্দির স্থাপন করা

হয়েছে। ওখানে মাতাপিতৃহীন অনাথ শিশুদের মানবতার আদর্শে পালন করা হয়। অবন্তী ওর অধ্যক্ষ। পরিকল্পনাও তারই।

—ভালই তো পরিকল্পনা। জায়গাটা দেখতে পারি নে? .

—নিশ্চয় পারেন। আজ রাতটা থাকুন, কাল সকালে আপনাকে নিয়ে যাব ওখানে। মোটরেই যাওয়া যাবে।

—কতগুলি ছেলেমেয়ে আছে?

—প্রায় শ'খানেক। যাদের কেউ কোথাও নেই এমন শিশুই ওখানে ঠাঁই পায়। ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত রাখার নিয়ম, তারপর স্বাধীনভাবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। খাঁটি ভারতীয় প্রথায় ওদের মানুষ করা হচ্ছে—দেখলে আনন্দ পাবেন আপনি।

—কালই যেতে আপনার অসুবিধা হবেনা তো?— সিধু সঙ্কোচের ভাবে শুধুলো।

—না। আমারও যাওয়ার দরকার একবার ওখানে।

—ওর আয় কি? কি ভাবে চলে ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়?

—সরকারী-বেসরকারী দান আর ওখানকার জমির ফসল, কারুশিল্প বিক্রী ইত্যাদিতে চলে যায়। কর্ম্মীরা সকলেই অবৈতনিক, খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছু নেন না। অর্থাৎ ওটা সম্পূর্ণভাবে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

—বেশ—চলুন দেখি। যদি সত্যি ভাল কোনো কাজ করছে অবন্তী, তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। আচ্ছা, আলোকের খবর জানেন?

—না। দীর্ঘদিন জানি না কিছু। কোথায় যে ডুবে গেল অতবড় আলোসূর্য্য, ভগবান জানেন!— উৎপলার কণ্ঠস্বরে অতি বিষাদময় সুর ধ্বনিত হোল। সচমকে চাইল সিধু ওর মুখপানে, কিন্তু গাড়ীর ভিতরটা আলোকিত নয়—মুখ দেখতে পেল না, শুধু শুনতে পেল উৎপলার সুদীর্ঘ শ্বাস-শব্দটা।

গাড়ী বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। উৎপলা নিজেকে কঠোরভাবে সংযত করে সিধুকে নামতে বলল। সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদ, উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত—সিধু দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে বলল উৎপলাকে,

—আমার কি পরিচয় আপনি দেবেন এখানে ?

—কেন ? অবন্তীর স্বামী।

—না। বলবেন আমি আলোকের বন্ধু—আপনার পরিচিত।

—আচ্ছা, তাই হবে। তবে পরিচয় দেবার খুব বেশী কেউ নেই এখানে। আমার বুড়ী মা আছেন। আসুন।

সিধু নেমে উৎপলার সঙ্গে সেই সুরম্য হর্ম্যে প্রবেশ করলো।

আলোক অস্বস্তি অনুভব করছে অন্তরে। অপর্ণার সঙ্গে দেখা হওয়াটা যেন একটা অসম্মান—অথচ কেন এমন মনে হচ্ছে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। মনে পড়লো, এক নিতান্ত দুর্দ্দিনে ঐ অপর্ণাই তার বান্ধবীর কাজ করেছে। সদ্যোজাত পরিত্যক্ত একটা শিশুকে নিয়ে যে মাতৃত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে সে প্রকটিত হয়েছিল, তাই দেখে আলোক বিশ্বজননীর দর্শন পেয়েছে,—ভেবেছিল। কিন্তু উৎপলার আশ্রমে অপর্ণার কীর্ত্তি এবং সুহৃদবাবুর সঙ্গে অপকীর্ত্তির কথাটাও আলোক জানতে পেরেছে খবরের কাগজ মারফৎ। সুহৃদবাবু কিছু টাকাও নিয়ে সরে পড়েছিল, তাই পুলিসে খবর দেওয়া হয়; ওরা ধরা পড়ে এবং খবরের কাগজে সবিস্তারে সে কাহিনী ছাপা হয়—আলোক

পড়েছে সে সংবাদ। সেই মাতৃরূপা অপর্ণার অধঃপতনের কাহিনী জানে বলেই হয়তো আলোকের মনে এই অসম্মানের ভাব জাগছে।

ট্রামের বেঞ্চে বসে বসে আলোক চিন্তা করছিল—নারীর শতসহস্র রূপের কথা। ঐ তুচ্ছ অপর্ণাই কত বিচিত্ররূপে দেখা দিল তার সুমুখে! কিন্তু অপর্ণা সত্যি কী, তাকি আজও জানে আলোক? জানা সম্ভব নয় কোনোদিন। হয়তো অপর্ণার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল ঐভাবে চলে যাওয়ার, তাই ওটা ঘটেছে। আলোকের সহিষ্ণু মনে আবার অপর্ণার প্রতি সহানুভূতি জেগে উঠছে।

ফিরে যাবে নাকি আলোক আবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে? না,—অপর্ণার যা হয় হোক, আলোক কী করতে পারে! অপর্ণার দুর্ভাগ্য অপর্ণা ভুগবে, যেমন আলোকের দুর্ভাগ্য আলোককে ভুগতে হচ্ছে। —এর নাম কর্ম্মফল। আলোক শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়লো।

ছাত্রী অঞ্জনার মেয়েটা ওর বড় নেওটা; কিন্তু আলোক বাড়ীর বার হয় না, তাই কোনো উপহারই তাকে এপর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে ওঠেনি; আজ কিছু একটা খেলনা কিনে নেবে ঐ বাচ্চা মেয়েটার জন্য। আলোক একটা দোকানে প্লাষ্টিকের সস্তা দুটো পুতুল কিনলো আর একটা ঝুমঝুমি। নিতান্ত সামান্য বস্তু, তবু ওর মন যেন পরম পরিতৃপ্তি লাভ করছে। ঐ বাচ্চা মেয়েটা হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে এই সুন্দর রঙিন খেলনা দুটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, কিম্বা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, অথবা দান করে দেবে অন্য কাউকে। তবু ওকে এই সামান্য উপহার দেওয়ার যে একটা তীব্র আনন্দ আছে, সেটা যেন আজই প্রথম অনুভব করলো আলোক। অঞ্জনা ওর কেউ নয়, তার মেয়ে আরো তফাৎ—কিন্তু সে শিশু, বিশ্ব তার আপনার, তাই শিশুকে 'দেবতা' বলা হয়েছে। আলোক খেলনা ক'টি নিয়ে বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগলো।

ঐ শিশুদেবতার সূত্র ধরে একটা সংবাদের কথা মনে হোল আলোকের। খবরটা কাগজে পড়েছিল। এই ক'বছরের ওর যা-কিছু বাস্তব জ্ঞান সবই কাগজের মারফৎ। মনে পড়ল, কোথায় যেন একটা শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পড়েছিল সে। মাঝে মাঝে তার রিপোর্ট কাগজে বের হয়, দেখেছে। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায়, মনে করতে পারলো না—শুধু মনে পড়ল, উৎপলা ঐ শিশু-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছে।—যাক্ গে···

বিরক্ত আলোক খেলনা নিয়ে বাড়ী ঢুকলো। অঞ্জনার কন্যা অচিরা দু'হাত বাড়িয়ে কোলে এসে পড়ল ওর। তিন বছরের বালিকা—খেলনার তার অভাব নেই, কিন্তু আলোকের হাত থেকে প্রথম উপহার বলেই কিনা কে জানে, ওর যেন আনন্দ সহস্রগুণ বেড়ে উঠলো।

—'মামা—মামা,—মা—মামা দিয়েছে' —বলে চীৎকার করছে।

—হ্যাঁ—মামা দিয়েছে, —বলে হাসল অঞ্জনা— বলল আলোককে,

—এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে, দাদা! আমি ভাবলাম, বহুদিন বাড়ী থেকে বের হওনি, কলকাতার পথঘাট ভুলে বাড়ী হারিয়ে ফেলেছো—

—হ্যাঁ, সেইরকমই অবস্থা—দেখলাম, নতুন রাস্তায় ছেয়ে গেছে সহরটা—পথ ভুল হওয়াই উচিত ছিল!

—হোল না কেন?

—এই বাচ্চাটার জন্যে— বলে আলোক মেয়েটার গালে চুমু দিল।

—ও-ই তাহলে তোমাকে বেঁধেছে, দাদা?— হাসলো অঞ্জনা,— কিন্তু সাতবছর তো ও ছিল না, মাত্র তিন বছর এসেছে—

—আগের চার বছরের যে-কোনো মুহূর্তে আমি পথ ভুলে চলে যেতে পারতাম, অঞ্জু! পরের তিন বছর আমি বাড়ীর বাইরে যেতে চাইনি।

—তা জানি। বেলা হয়ে গেছে, স্নান কর—বাবা খেয়ে শুয়েছেন।

আলোক স্নান করতে চলে গেল বাথরুমে। দীর্ঘ সাতবছর এই বাড়ীতে আছে সে। প্রাইভেট টিউটার হয়ে ঢুকেছিল, কিন্তু আজ কেউ জানিয়ে না দিলে কারও জানবার ক্ষমতা নেই যে আলোক এ বাড়ীর ছেলে নয়। সকলেই জানে, সে অঞ্জনার দাদা। অসাধারণ বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর চরিত্রবান—অবিরাম পড়া আর লেখা নিয়ে কাটায়, তাই বিয়ে করার ফুরসৎ হোল না। অথচ পাড়ায় এবং পরিচিতদের অনেকেই অঞ্জনার বাবার কাছে প্রস্তাব করেছেন আলোকের বিয়ের জন্য। অঞ্জনাও গোপনে গোপনে তার দু'দশটি বিশেষ সুন্দরী আর শিক্ষিতা বান্ধবীকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিয়েছে আলোকের সঙ্গে। কিন্তু কৈ, আলোককে কেউ বাঁধতে পারলো না!

সাত বছর কাটিয়ে দিল আলোক বৃদ্ধ ঐ ভদ্রলোকের কাজে সাহায্য করে। তবে একটা বিরাট কাজ ওঁরা করেছেন—এই সান্ত্বনা। বৃদ্ধ বার বার বলেন,—আলোক না এলে এ-কাজ তাঁর কোনোদিনই শেষ হোত না। নিজের পুত্র নেই, আলোক তাঁর পুত্রের কাজই করছে। শিষ্য এবং পুত্র সে একসঙ্গে। অত্যন্ত স্নেহ করেন তিনি আলোককে। এমন কি, তাঁর অন্তরের ইচ্ছা, আলোক বিয়ে করে সংসারী হলে তিনি নিজ বাসগৃহের একাংশ আলোককে দান করবেন এবং কিছু নগদ টাকাও। কিন্তু আলোক সব প্রলোভন এড়িয়েই যাচ্ছে। কোষ-গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ না হওয়ায় বৃদ্ধ আলোকের বিয়ে সম্বন্ধে বেশী চাপ দেন নি, এবার দেবেন—ভেবে রেখেছেন। কন্যাকেও অবহিত করে রেখেছেন এ বিষয়ে। কিন্তু অঞ্জনা বড় বেশী আশা করে না। আলোক এক আশ্চর্য্য ধাতুতে গড়া—এ সত্য অঞ্জনা খুব ভাল জানে।

অঞ্জনার শ্বশুরবাড়ী কলকাতাতেই। স্বামী ব্যবসাদার মানুষ—তাঁর নিজের অফিস আছে, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ীও আছে। তবে অঞ্জনাকে

শ্বশুরবাড়ীতে ঘর করতে হয় না। বাপের একমাত্র কন্যা বলে তিনি ওকে পিত্রালয়েই থাকতে দেন, নিজেই এসে দু'দশদিন থেকে যান এখানে। অঞ্জনা কদাচিৎ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দু'পাঁচদিন কাটিয়ে চলে আসে। এ ব্যবস্থাটা আপাততঃ চলেছে যতদিন অঞ্জনার বাবা পৃথিবীতে আছেন।

স্বামী সুশিক্ষিত এবং নানাগুণশালী, সুতরাং অঞ্জনা সুখী হয়েছে; কিন্তু মানুষের অন্তরে কোথায় যেন একটা অসুখের অন্ধকার থাকবেই, এ যেন বিধিলিপি—তাই আলোকের জন্য ওর মন কাঁদে। অমন একটা অপরূপ দাদা পেল অঞ্জনা, অথচ তাকে সংসারে বাঁধতে পারলো না—এ ওর বড় আফশোসের বিষয়। বহুবার বহু চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রেগে ও সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু বলে—'দাদা চিরকুমার সভার সভাপতি!' কিন্তু আজ আবার ওর মনে আলোকের জন্য চিন্তা জেগে উঠেছে বিশেষ একটা কারণে। ওর বান্ধবী করবী খুব ভাল মেয়ে—বাংলায় এম. এ. পাস করেছে, যথার্থ সুন্দরী আর সত্যিকার বুদ্ধিমতী। অঞ্জনা বহু আশা করে করবীকে নিমন্ত্রণ করেছে আজ সন্ধ্যায়—ইচ্ছা এবং আশা, যদি আলোক তাকে পছন্দ করে। করবী এতদিন কলকাতায় ছিল না, দিল্লীতে ছিল মামার বাড়ীতে।

আলোক বাথরুমে স্নান করছে আর অঞ্জনা ভাবছে, খাবার সময় দাদাকে বলবে সন্ধ্যায় তার আরতির সময় উপস্থিত থাকতে। আজ সরস্বতী পূজা—দাদা এখনো পূজা করেনি—করবে নিশ্চয়। ওর বাবা পূজা ক'রে, খেয়ে বিশ্রাম করছেন। আলোক বেরিয়ে এল।

—পুষ্পাঞ্জলি দেবে তো, দাদা—

—হ্যাঁ, চলো—ফুল-বেলপাতা কিছু রেখেছিস তো?

—কে জানে, আছে কিনা। তুমি তো বল, মানস-উপচারেই ভাল পূজা হয়।

—আমি বলি নে, শাস্ত্র বলেন—চল্—

প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ঘরটায় কাঠের চৌকীর উপর বহু পুস্তক সাজিয়ে তাতেই পূজা করা হয়েছে। মূর্ত্তি এ বাড়ীতে আনা হয় না। অঞ্জনার বাবার মত্—বর্ত্তমান কালের মূর্ত্তি ঠিক ধ্যানানুগ হয় না, তাই উনি পুস্তকের ওপর বাণীর আরাধনা করেন। নিতান্ত অনাড়ম্বর আরাধনা। পাড়ায় অনেক বাড়ীতে মূর্ত্তি আনা হয়—ঢাকঢোল বাজে; রেডিও আর এ্যাম্‌প্লিফায়ারে কান প্রায় ফুটো হবার যোগাড় হয় এ বাড়ী। কিন্তু নিঃশব্দে পূজা করে; সন্ধ্যায় শুধু অঞ্জনা একটা-দুটো গান গায়, ওর বাবা স্তোত্রপাঠ করেন—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু একটা গম্ভীর-সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ওখানে—যারা দেখে, তারা ভাবে অসাধারণ পূজা! আলোক এই সাত বছর এই পূজার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে।

—আজ পূজার সময় তুমি ছিলে না দাদা, বাবা খুব দুঃখ করছিলেন—

—আটকে পড়েছিলাম রে—ফিরতে দেরী হয়ে গেল। আরতির সময় নিশ্চয় থাকবো।

—হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। আজ আমার একটি পুরোনো বান্ধবী আসবে, দাদা—খুব ভাল গাইতে পারে।

—বেশ তো, মায়ের নাম গাওয়াবি তাকে দিয়ে।

—হুঁ, তোমার লেখা সেই গানটা ওকে দিয়েছি আমি—ও নিজে সুর দিয়েছে।

—কোন্ গানটা?

—সেই—"শুভ্র চরণ-পঙ্কজ-করে অন্তর করো নিরমল—

পদকুঙ্কুম-রঞ্জনে মম রক্তিম কর হিয়া-তল—"

—বেশ, শোনা যাবে— বলে আলোক পূজা করতে আরম্ভ করলো। দীর্ঘক্ষণ ধ্যানস্থ রইল আলোক, তারপর পুষ্পাঞ্জলি দিল মন্ত্র পড়ে; প্রণাম করলো।

—চলো, খাবে এবার— বলল অঞ্জনা।

—তোর বর আজ আসবে শুনছিলাম না?

—কি জানি—আসতে পারে বিকালের দিকে।

অকারণ এমন দু'একটা কথা বলে আলোক অঞ্জনার সঙ্গে। হয়তো খুব অকারণ নয়—ওকে মনে করিয়ে দেয় যে বাবা-দাদা ছাড়াও আর একজন আছে, যার কথা অঞ্জনার ভাবা দরকার।

আলোক বলল,—সে আসবে কিনা, সঠিক জানিস নে তুই?

—আসবে তো লিখেছে। তার বেশি আমি কি করে জানবো! চলো, বেলা তিনটের কাছাকাছি—খিদে পেয়েছে আমার।

—তুই এখনো খাসনি?

—তোমাকে ফেলে খেতে হবে নাকি?

—আহা! চল—চল—ভাইবোনে একসঙ্গে খাব—

আলোক তাড়াতাড়ি আর একবার প্রণাম করলো সরস্বতীকে, তারপর উঠে খেতে গেল। খেতে খেতে সে ভাবছিল, পৃথিবীর সব আত্মীয়কে হরণ করে এক নিতান্ত অনাত্মীয়ের অঞ্চলতলে যিনি ওকে বেঁধেছেন, তাঁকে নমস্কার—বারম্বার নমস্কার!

✓চঞ্চল নদীস্রোত···

সকালের স্নিগ্ধ আলোকে ঝলমল দিগ্‌দিগন্ত। দূরে বাঁশবন আর আমবাগানের শ্যামলাঙ্গ গাঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে জননীর স্নেহের মত।

সিদ্ধেশ্বর দু'চোখ মেলে দেখছিল বাংলামা'র এই স্নিগ্ধসুন্দর রূপ। পাশে বসে আছে উৎপলা—গাড়ী তীরবেগে চলেছে নদীকিনারের বাঁধা

রাস্তা দিয়ে। সিধু কেমন যেন সম্বিৎহারার মত বসে আছে; মন যেন ওর হারিয়ে গেছে প্রকৃতির এই রহস্যময় শ্যামলাভায়। কথা কইল উৎপলা,—ঐ-যে কলাগাছ দেখা যাচ্ছে,—ঐটি আশ্রম।

—ও— সিধুর যেন চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখলো কয়েকটি বাড়ীর ছাদ আর টালী দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে কলাগাছও।

উত্তরদিকে অজয় নদ, তারই কূলে এই আশ্রম। নির্জ্জন-নিঃস্তব্ধ স্থানটি—দূরে মেঘের গায়ে যেন ছায়ার মত কোন্ পাহাড়ের ইঙ্গিত দেখা যায়, ধ্যানস্তম্ভিত যেন কোনো যোগিরাজ! সিধু স্থানটির সৌন্দর্য্য দেখে সত্যি মুগ্ধ হোল। উৎপলা বলল,

—জায়গাটা প্রাচীন দিনের তপোবনের মত মনে হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, যদি সব রকমে তপোবন হয় তো আনন্দের কথা।

—হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগোপযোগী করে।

—পশ্চিমী প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা দরকার, নইলে সব-কিছুই বরবাদ হয়ে যাবে— বলে সিধু একটু থেমে আবার বলল,—ওদেশের সবই যে খারাপ, একথা আমি বলছিনে—আমার বক্তব্য, আমাদের জীবন মূলতঃ অন্তর্মুখী, ওদের বহির্মুখী—এই তফাৎটা যেন বজায় থাকে। কিন্তু আমরা যুগোপযোগী হতে গিয়ে ওদেরই অনুকরণ করে বসছি; যুগটা যেন একান্তভাবে ওদেরই। কিন্তু তা নয়। এদেশের যুগ এবং যুগধর্ম্ম এদেশের জলমাটির যোগ্য হতেই হবে। নইলে সবই ব্যর্থ।

আর কোনো কথা বললো না উৎপলা। গাড়ী গেটে দাঁড়াতেই আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে এসে অভ্যর্থনা করলো ওদের। সিধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে চারদিক—অবন্তীকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। হয়তো বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত থাকবে ভেবে, কোনো প্রশ্নও উৎপলাকে করলো না সিদ্ধেশ্বর। নিঃশব্দে নেমে ভেতরে এল।

সুন্দর আশ্রম—স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সবই সুরুচিপূর্ণ। ঘুরে ঘুরে দেখলো সিদ্ধেশ্বর উৎপলার সঙ্গে। অধিবাসিনীরা যে যার কাজে নিযুক্ত, —কিন্তু আশ্চর্য্য, অবন্তীকে কোথাও দেখা গেল না!

মন্দিরের মত একটি ঘর দেখে সিধু শুধুলো,—এখানে কি হয়?

—উপাসনা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে সমবেত উপাসনা হয়।

—সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্তু কোনো বিশেষ ধর্ম্মমতে নিশ্চয়ই?

—না। শুধু সার্ব্বজনীনভাবে ঈশ্বরের নামগান হয়— বলল উৎপলা।

সিধু ব্যাপারটা নিয়ে তখন আর কোনো আলোচনা করলো না। দেখতে পেল, ওপাশে দাঁড়িয়ে অবন্তী।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অবন্তী, যেন মাটির প্রতিমা। তার আয়ত চোখ অর্দ্ধনিমিলিত—উদাস। যেন কিছুই দেখছে না। সিধু ক্ষণেক তাকিয়ে রইল ওর পানে, কিন্তু অবন্তী তাকালো না। জানলা-পথে বাহিরের পানে চেয়ে রয়েছে। অজয়ের কিনারায় কাশফুলের হিল্লোল দেখছে যেন অবন্তী!

অবন্তীকে ডাকতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে আজ সিধুর। উৎপলা কখন সুট্ করে গৃহান্তরে সরে পড়েছে, সিধু জানতে পারেনি। এ ঘরে অবন্তী আর সিধু ছাড়া অন্য কেউ নেই। সিধু কি ডাকবে অবন্তীকে? হ্যাঁ, ডাকাই তো উচিত; কিন্তু লজ্জার আড়ষ্টতা ওকে বাধা দিচ্ছে। সে বাধা জোর করে সরিয়ে সিধু বলল,—অবন্তী!

—উঁ!··· অবন্তীর উত্তরটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল।

কোমল-সুন্দর মুখশ্রী অবন্তীর—সিধু তাকিয়ে দেখলো। কী বলবে? এতো কাণ্ডের পর এই নির্জ্জন নদী-সৈকতের আশ্রম-আবাসে যে নিজেকে সমাধিস্থ করতে এসেছে, তাকে বলবার কি আছে? কিন্তু কিছু বলতেই হবে; কিছু বলবার জন্যই এসেছে সিদ্ধেশ্বর। চেয়ে দেখলো ভাল করে, অবন্তীর সর্ব্বাবয়ব অপরূপ সুষমামণ্ডিত—

সুন্দরী অবন্তী অনবদ্যাঙ্গী হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে রূপে কোথাও চাপল্য নেই।

—ভাল আছ, অবন্তী?— সিধু অতি সাধারণ প্রশ্নই করলো অবন্তীকে।

—হ্যাঁ— বলে অবন্তী এগিয়ে এল ওকে প্রণাম করতে।

—থাক্, থাক্— বলে সিধু আবার প্রশ্ন করলো,—এখানে কতদিন আছ?

—অনেক দিন— বলে অবন্তী উঠে দাঁড়ালো প্রণাম সেরে।

এর পর আর কথা চলে না। দুজনেই চুপচাপ মিনিটখানেক। কিন্তু কথা কিছু বলতেই হবে। সিধু পরিপূর্ণরূপে অবন্তীর অভিমত জানতে চায়।

—এখানে যদি ভাল থাক আর এই কাজে আত্মার তৃপ্তি বোধ কর, তাহলে খুব ভাল কথা, অবন্তী—আমি সেই খবরটাই জানতে এলাম। এখানে নরদেবতার, শিশুদেবতার সেবায় কি তুমি জীবন উৎসর্গ করতে পারবে? যদি পার, আমি আশীর্বাদ করে যাব।

অবন্তীর মুখখানা লাল হতে হতে কালো হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ কথা বললো না অবন্তী, তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—আমার গোটা জীবনটাই ভুলময়, সিধুদা! আজও তার সংশোধন করতে পারছি নে। কেমন করে পারবো, তাও জানি নে।

—কেন একথা বলছো, অবন্তী?— সিধু প্রশ্ন করলো সোদ্বেগে।

—বলবো, কেন। এইমাত্র এলে। স্নানাহার কর। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার অনেক। ওবারের মত না-বলে পালিও না যেন।— ক্ষীণ হাসলো অবন্তী।

—না, তোমার কথা শুনতেই আমি এসেছি— বলে সিধু নদীর পানে চাইলো।

—এসো, তোমার থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দিই—বলে অবন্তী এগুলো।

—আমার সঙ্গে তোমার কী পরিচয় এখানে জানানো হবে, অবন্তী?

—কিছু না। তুমি এখানে শুধু একজন দর্শক—'ভিজিটার'—হাসলো অবন্তী।

দুজনেই অল্পক্ষণ চুপচাপ, অবন্তী-ই কথা বলল অতঃপর,

—তুমি নিরপেক্ষ দর্শকই তো রইলে চিরদিন, সিধুদা!

—এটা কি তোমার অভিযোগ অবন্তী?

—না-না— অবন্তী যেন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,—পাপ আমি অনেক করেছি, সিধুদা—কিন্তু তোমার মহিমাকে আমি কোথাও ক্ষুণ্ণ করবো না। তোমার ওপর কোনো অভিযোগ আমার কখনো নেই। আমি প্রতি সন্ধ্যায় প্রার্থনা করি, আগামী জন্মে যেন তোমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হতে পারি। এই জীবনে শিশু-সেবার কাজ নিয়ে কি সেই যোগ্যতা অর্জ্জন করা যাবে না, সিধুদা?

অবন্তী এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেললো, কিন্তু সিধু চুপ করে আছে। অবন্তী যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার বললো,

—তুমি হয়তো জন্মান্তর আর প্রার্থনা কর না, সিধুদা,—কথাটা বলে আমি কি অপরাধ করলাম?

—না—না অবন্তী, অপরাধ কিছু নয়। জন্মান্তর কারো হাতে নেই। তবে আমাদের সাধনা—নিষ্কাম সাধনা। আবার জন্মাবার কামনা করা নিষিদ্ধ আমাদের ধর্ম্মে। কিন্তু সে কথা থাক্। আমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হবার আকাঙ্ক্ষা না করে তুমি নিষ্কামভাবে এই সেবাব্রতে আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারলে আমি আরো সুখী হব। এ কাজ ঈশ্বরের কাজ বলে গ্রহণ কর। মনে কর, তোমাকে দিয়েই সৃষ্টিকর্ত্তা এ কাজ করাচ্ছেন। তুমি যন্ত্র মাত্র—

—ওসব পুঁথীর কথা, সিধুদা— হাসলো অবন্তী,—আমি তো ওভাবে গঠিত হইনি। আমার অন্তর বিলাসের আর ব্যসনের

আস্তানা। আজ যে এই জনহিতকর কাজ আরম্ভ করেছি, এর কতটা আত্মবঞ্চনা আর আত্মতৃপ্তির জন্য, তা খুঁজে বের করতে অঙ্ক কষতে হবে। তাতে যে সেবাব্রত আছে, তার নিষ্কামত্ব হয়তো ভগ্নাংশে এসে দাঁড়াবে।

—তা হোক, তবু এটাকে আশ্রয় করে তুমি কর্ম্মযোগে উন্নত হতে পার, অবন্তী! যদি তুমি সত্যি একাজেই জীবনপাত করতে চাও তো, একে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ এবং তাঁরই কাজ বলে গ্রহণ করলে বেশী তৃপ্তি পাবে।

—দেখি। এসো ভিতরে— বলে অবন্তী ওকে একটা পাকাঘরের মধ্যে আনলো। এটা গেষ্ট-হাউস। থাকবার সব ব্যবস্থাই আছে। তবে খুব ক্ষুদ্র আকারে।

সিদ্ধেশ্বর ঐ ছোট ঘরটার এক কোণায় কাঁধের কম্বলটা বিছিয়ে পাতল। কমণ্ডলুটা রাখলো একপাশে, তারপর বসল কম্বলের উপর।

—তুমি তো আতপান্ন খাও?— অবন্তী শুধুলো।

—না অবন্তী, এখানে ওসব ঝামেলার দরকার নেই। যা হয়, দেবে।

—এখানে অসুবিধা কিছু নেই। স্বপাক খাবে তো?

—না, অবন্তী—আলুভাতে ভাত। নিরামিষ। তুমিই রান্না করে দিও—

—আমি?— অবন্তী যেন চম্‌কে উঠলো,—আমার হাতের রান্না খাবে তুমি?

—হ্যাঁ,—কেন? একটু থেমে সিধু বলল,—মানুষের দেহে ভগবান থাকেন, অবন্তী! মানুষ কখনো ঘৃণার পাত্র নয়। আর তুমি তো জান, আমার প্রথম যৌবন কিভাবে কেটেছে! এক শালগ্রামের নুড়ি-ই আমাকে এই অবস্থায় এনেছেন। তোমাকেও আনতে পারেন। হয়তো আনছেন!… তুমিই রান্না করবে।

অবন্তী আর কিছু বললো না, ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু সিধুর উদার হৃদয়ের অপরূপ মহিমা ওকে অশ্রু-পঙ্কিল করে তুলছে! হতভাগিনী সে, এমন অসাধারণ পুরুষের সেবার সৌভাগ্য পেয়েও পেল না। নিঃশব্দে অবন্তী গিয়ে আতপতণ্ডুলের জন্য কাছের গ্রামে লোক পাঠাল। উৎপলা হেসে বলল,—ও তো বলল, সিদ্ধ চাল খেতে আপত্তি নেই—

—না, পলাদি, ওর ধর্ম্ম কোথাও আর ক্ষুণ্ণ করতে চাই নে।

—তোর এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, ওকে তুই আর নীচে, সংসারের বন্ধনে নামাবি না, কেমন?

—নীচে ওকে কেন নামাবো, পলাদি! নিজে ওর পায়ের ধূলো হতে পারলাম না বলে কি ওকেও ধূলোতে নামাবো!

—না,—তোর এই গৌরব অটুট থাক্!— পলা যেন আশীর্ব্বাদ করলো।

অবন্তী রান্নার আয়োজন করতে গেল সিধুর জন্য। এ অধিকার পেয়ে ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেছে। এক কোণের একটা বারান্দা গোবর দিয়ে নিকুলো অবন্তী—ছোটবেলায় বাড়ীতে এইভাবে ঘর-নিকোনো শেখা আছে ওর। তার পর বাসন ধুয়ে-মেজে কাঠের জ্বালে রান্না করতে বসলো স্নানপূতঃ শুচি হয়ে। ঠিক যেন পূজার ভোগ রান্না করছে কোনো মন্দিরের সেবিকা। উৎপলা সমস্তটা দেখলো—ভাবলো, সিধুকে সংসার-আশ্রমে আর হয়তো নামাতে চাইবে না অবন্তী। ভালই হোল। এই শিশু-আশ্রমটা ওরই গড়া, ওরই হাতে থাকলে ভালভাবে চলবে। নইলে উৎপলাশ্রমের মত এটাও বিলিতি-মার্কা হয়ে বিলাসের কেন্দ্র হয়ে পড়তে পারে। তবু অবন্তীর জন্য দুঃখ হচ্ছে উৎপলার। ঐ অসাধারণ সন্ন্যাসী স্বামী আজও ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য ফিরে ফিরে আসে, আর দুর্ভাগিনী অবন্তী ইচ্ছা সত্ত্বেও

যেতে পারে না তার সঙ্গে। কিন্তু অবন্তীর তবু তো আছে স্বামী সিদ্ধেশ্বর—সাধু হয়েও তো সে মনে রাখে অবন্তীকে। উৎপলার কে কোথায় আছে !···

জীবনের রুদ্র যেন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে জাগছে এখানে। সিধু চেয়ে দেখলো আঙিনার দিকে—অপরূপ দৃশ্য। প্রায় শতাধিক বালক-বালিকা দুই সারিতে পৃথক্‌ভাবে দাঁড়িয়ে স্তোত্রপাঠ করছে। বেদ থেকে আহরিত স্তোত্র—সমবেত কণ্ঠের মধুর ধ্বনি—চমৎকার শোনাচ্ছে সিধুর কাণে। নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও শুনলো কিছুক্ষণ। 'সুন্দর !'

নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করলো সিধু। স্তোত্রপাঠ শেষ হতেই তাদের ছুটি হয়ে গেল। নিয়মবদ্ধভাবে বালকরা একদিকে আর বালিকারা অন্য দিকে চলে গেল। সিধু বুঝলো, এক আশ্রমে অবস্থান করলেও এদের বাসস্থান পৃথক্ এবং দূরে দূরে।

বেলা অনেকটা হয়েছে—অবন্তী হয়তো রান্না শেষ করে ফেললো। সিধু তার পূজা শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল অকস্মাৎ। এতক্ষণ ঐ শিশু-দেবতাদের কণ্ঠকাকলি ওকে কেমন যেন মুহ্যমান করে রেখেছিল। সম্মুখের শালগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করে সিধু উচ্চারণ করলো—ওঁ ধ্যেয়ং সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণং সরসিজাসন···

পূজাশেষে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেল সিধু। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে ! চোখ মেলে চেয়ে দেখলো, এক অপরূপদর্শী বালক ওর মুখপানে তাকিয়ে রয়েছে। স্বয়ং নারায়ণ নাকি ! বিস্মিত সিধু বিহ্বল হয়ে উঠেছে, কিন্তু তখুনি বুঝতে পারলো, নারায়ণ নন, এই আশ্রমেরই এক বালক। কিন্তু কী চমৎকার চেহারা ! রূপ যেন উথলে উঠছে ওর অঙ্গে। নিষ্পাপ

নিষ্কলুষ মুখকান্তি। আয়ত-বিশাল চোখে বিস্ময়ের সমুদ্র! কে এ? কেন সিধুকে দেখছে এভাবে? কি ওর নাম?

প্রশ্নগুলো আকস্মিকভাবেই জেগে উঠলো সিধুর অন্তরে। কিন্তু ছেলেটিকে কিছুই প্রশ্ন করলো না সিধু—ওর সরল-সুন্দর চাহনি সিধুর অত্যন্ত ভাল লাগছে—কে জানে, প্রশ্ন করলে পালিয়ে যাবে কিনা! সিধু আবার চোখ বুজলো ছেলেটা কি করে দেখবার জন্য। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে চোখ খুলে দেখলো, ও তেমনি নির্নিমেষ চোখে সিধুকে দেখছে। ওর চোখে পরম বিস্ময়, যেন সিধুর মত কাউকে ও কখনো দেখেনি! এবার কিন্তু সিধু আর কথা না-বলে পারলো না। বলল, —তোমার নাম কি খোকা?

—জীবন— বলেই ছেলেটি এসে সিধুকে প্রণাম করলো ভূমিষ্ঠ হয়ে।

—কল্যাণ হোক— আশীর্ব্বাদ করলো সিধু ওর মাথায় হাত দিয়ে। বলল,—কতদিন এখানে আছ তুমি? কি পড়? কোন্ স্কুলে?

—অনেকদিন আছি। আপনি কে? আপনাকে তো কখনো দেখিনি? আপনি কি 'রুদ্র'?

—না বাবা,—আমি সামান্য মানুষ। রুদ্রকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—রুদ্রকে দেখবো। রুদ্র কোথায় আছে, জানেন? আপনি দেখাতে পারেন?

—না বাপ্,—রুদ্রকে দেখতে হলে সাধনা করতে হয়।

—আমি করবো সাধনা—আপনি শিখিয়ে দিন— বলে ও যেন পদ্মাসনে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। হাসি পাচ্ছে সিধুর! কিন্তু এই অপরূপ সুন্দর বালকের দীর্ঘ-পিঙ্গল কেশজালে আচ্ছাদিত কোমল মুখশ্রী যেন কৈলাসবিহারী মহেশ্বরের বালকরূপ—এমনিই মনে হচ্ছে সিধুর। মিষ্টস্বরে বলল,

—আরো বড় হলে সাধনা করবে। এখন থাক্—

—আমার অনেক বছর বয়স হোল—

—আরও বছর দশ পরে সাধনা করবে— বলে সিধু ওর পিঠে হাত দিল।

—আরো দশ বছর!— চোখ বিস্ফারিত করে চাইল জীবন ওর দিকে; বলল,—না, আপনি আমাকে আজই সাধনা শিখিয়ে দিন…

সিধুর পাশেই এসে বসলো জীবন; ঠিক সিধুর মতই পদ্মাসনে বসতে চায়—এবং আশ্চর্য্য যে, অতি অনায়াসে সে পদ্মাসন করে নিল। 'সমকায়-শিরগ্রীব' হয়ে বসে পড়ল জীবন—যেন কত কালের অভ্যাস!

আশ্চর্য্য হয়ে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করলো,

—এভাবে বসতে শিখলে কোথায় জীবন?

—আপনাকে দেখে—আপনি যে বসেছেন! আপনাকে বসতে দেখে শিখলাম।

—আশ্চর্য্য ছেলে তো!— নিজের মনেই বলল সিধু; তারপর জীবনকে বলল,—বল—

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

জীবন অতি অনায়াসে আবৃত্তি করে গেল শ্লোকটা। উচ্চারণ ঠিকমত না হলেও, তার মুখে ঐ স্তোত্রটুকু অপরূপ মিষ্ট বোধ হচ্ছে সিধুর। কে এই বালকরূপী! সিধু মুগ্ধবিস্ময়ে ওর পানে চেয়ে ভাবতে লাগলো, এমন চেহারা তো সচরাচর চোখে পড়ে না! এ যেন একটা অসাধারণ আবির্ভাব। জীবনকে প্রণাম করতে বলে সিধু ওর পিঠের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলো সুগৌর পৃষ্ঠদেশের লাবণ্য, হাত দিয়ে অনুভব করলো তার পেলবতা—যেন নবনীত কোমল দেবদেহ! সিধুর ইচ্ছে করছে ওকে কোলে তুলে আদর করতে, কিন্তু অকস্মাৎ অবন্তী আবির্ভূত হয়ে বলল,—খাবার আনবো?

—হ্যাঁ, আনো।

—যা জীবন, তোদের খাবার ঘণ্টা পড়ছে—অবন্তী বলল।

—যাই— বলল জীবন, কিন্তু ওর মন যেতে চাইছে না।

অবন্তী হেসে বলল আবার,

—তোর কি খাবার ইচ্ছে নেই, জীবন ?

—না মাসিমা, আমি খানিক পরে খাব।

কিন্তু সিধু অন্যের সাক্ষাতে খায় কিনা অবন্তীর জানা নেই, তাই সে সিধুর মুখপানে চাইল। সিধু ব্যাপারটা বুঝে বলল অবন্তীকে,

—তোমাদের শৃঙ্খলার যদি ব্যাঘাত না হয় তো ও থাক্ ; ওকে বড় ভাল লাগছে আমার। যেন কতকালের আপনজন মনে হচ্ছে।

—ওকে যে দেখে সে-ই ঐ কথা বলে। ছেলেটা এমন মায়াবী !

বলে চলে গেল অবন্তী খাবার আনতে। জীবন অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো—ওর পরণের হাফ্ প্যাণ্টটার বেল্ট কষে নিয়ে বলল,

—আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগছে। আপনাকে 'আপনি' বলতে ইচ্ছে করছে না। খু-ব—খুব আপনার মনে হচ্ছে, বাবা-জ্যেঠা-কাকার মতন।

—বেশ তো বাবা, আমাকে 'তুমি' বলবে।

—তাহলে তুমি আমাকে ঐসব শিখিয়ে দাও, ঐ পূজো আর সাধনা—আর…

—বলছি তো, আর একটু বড় হও—তখন শিখবে—

—তখন ! সে অনেক দেরি। আমি আজ-ই শিখবো—মানে, আজ থেকেই। বড় কি হব আবার ! আমি খুব বড় হয়েছি। আর, ছোট থাকলে ও-সব শিখতে নেই নাকি ?

ভাতের থালা নিয়ে অবন্তী এসে উপস্থিত হোলো। কী অসীম যত্ন করে যে ও আজ রান্না করেছে সিদ্ধেশ্বরের জন্য, তা জানেন শুধু ওর

অন্তর্য্যামী। এই অধিকার পেয়ে অবন্তী যেন ধন্য হয়ে গেছে। সিধুর খাওয়ায় পাছে তিলমাত্র ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় সে জীবনকে বলল,

—তুই এখন বাইরে যা জীবন—খাওয়া হলে আবার আসবি।

—না না, ও থাক্— সিধুই বলল,—ওকেও আমার খাবার থেকে কিছু দাও।

—সেকি! না। ওর খাবার ওখানে রয়েছে। তুমি খেতে বসো। —বলে অবন্তী ধরে দিল ভাতের থালা সিধুর সামনে। আতপান্ন, শাক-ভাজা, দুটো তরকারী, গাওয়া ঘি, ডাল। সিধু বলল,

—অনেক তো রেঁধে ফেলেছো! এতো বিলাসিতা আমার অভ্যাস নেই, অবন্তী!

—একদিনেই অভ্যাস হয়ে যাবে না— বলে অবন্তী যেন প্রতিবাদ করবার জন্যই বলল,— আর তোমার যে এখনো মায়া-মোহ আছে, তা ঐ ছেলেটার দিকে টান দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওকে তো ভালবেসে ফেললে, দেখছি!

—হ্যাঁ। কিন্তু ও তো শিশুদেবতা—ওর মধ্যে বিশ্বদেবের শিশুমূর্ত্তি দেখছি আমি।

অবন্তী আর কিছু বললো না। সিধুকে আর কিছু বলে তার খাওয়ার অসুবিধা ঘটাবে না সে। কিছু না বলে দেখতে লাগলো। সিধু অন্ন-নিবেদন করলো উপাস্য দেবতাকে, তারপর কিছু ভাত ডাল তরকারী একটা খালি পাত্রে নিয়ে জীবনকে বলল,

—এসো, প্রসাদ নাও—

দু'হাত পেতে প্রসাদ নিল জীবন, কিন্তু বলল হঠাৎ,

—তুমি খেলে না তো, প্রসাদ হোল কি করে? কে খেল যে, প্রসাদ!

—ঠাকুর খেলেন। এই ইনি— সিধু শালগ্রামের মূর্ত্তিকে দেখালো।

—কখন খেলেন, দেখতে তো পেলাম না! ওঁকে দেখা যায় না নাকি?

—দেখা যায়, জীবন! কিন্তু ওঁকে দেখবার সাধনা করতে হয়। তুমি কি করবে সে সাধনা?

—হুঁ—করবো। কি করতে হবে, বল— জীবন যেন অধীর হয়ে উঠেছে।

—বলবো। এখন ভক্তি করে ওঁর প্রসাদ খাও।

সিধু আহার আরম্ভ করলো; জীবন, কেন-কে-জানে, হয়তো সিধু আর অবন্তীকে একান্তে আলাপ করতে দেবার জন্য, অথবা সিধুর সমুখে আহার করতে লজ্জা বোধ করার জন্য প্রসাদের থালাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। অবন্তী এতক্ষণ কিছু বলেনি। এইবার আস্তে বলল,

—ওকে চেলা করবে নাকি তুমি?

—না অবন্তী, চেলা করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য্য বস্তু দেখছি—ওর শারীরিক গঠনে সাধুর লক্ষণ রয়েছে।

—যাঃ— যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো অবন্তী— জীবন শুনতে না পায়, এমনি আস্তে বলল—ঝির ছেলে, বাপের ঠিক নেই—ওর আবার লক্ষণ!

—এরকম অনেক হয়েছে, অবন্তী। দেবর্ষি নারদ, মহাত্মা বিদুর, ব্রহ্মর্ষি সত্যকাম···ঈশ্বর কোন্ দেহ আশ্রয় করে কি ভাবে অবতীর্ণ হন, কেউ জানেনা, অবন্তী!

—হবে— অবন্তী যেন লজ্জিত হয়ে নিজেকে সামলে বলল,— কিন্তু ওকে সাধু বানাবার আমাদের ইচ্ছে নেই। ওর খুব বুদ্ধি; একটু দুরন্ত, তবে অবাধ্য নয়—ওকে আমরা উচ্চশিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে চাই।

—তোমার ধারণায় সাধুরা কি অমানুষ, অবন্তী?

অবন্তী আবার লজ্জিত হোল, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ওকে সাহায্য করলো তৎক্ষণাৎ। বললো,— অমানুষ বলছি না, কিন্তু পাহাড়-পর্ব্বতে কৃচ্ছ সাধন করে মানুষের কী কল্যাণ করেন তাঁরা?

—তুমি জানো না, অবন্তী! তাঁদের ঐকান্তিক কল্যাণ-কামনা বিশ্বাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে ধরিত্রীর অঙ্কে মঙ্গলপ্রসূ শুভাবির্ভাব সম্ভব করে। জগতে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে বন-জঙ্গলের সাধু করতে চাইছি না। আর, আমার বা তোমার চাওয়াতেই যে কিছু হবে, তা নয়। কী হবে, তা যিনি হওয়ান তিনিই জানেন।

—তাহলে?

—তাহলে, কিছু না—উচ্চশিক্ষা দিলেই মানবশিশু মানুষ হয় না, না দিলেও অমানুষ হয় না। পরশু রাত্রে নওকিশোর নামে একটি পথের-মানুষ মানুষকে দেখে আমার মনে হোল, মানুষের জীবন যেন তাতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এমন নিরাসক্ত নির্ম্মল জীবন আমি কমই দেখেছি।

—কোথায় দেখলেন আপনি নওকিশোরকে?— বলে উৎপলা এসে ঢুকলো ঘরে। বলল, অফিসে কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল, তা চুকিয়ে এলাম। নওকিশোর আমার কলকাতার আশ্রমে ছিল। কোথায় দেখা হোল তার সঙ্গে আপনার?

—একটা পার্কে। ওর তো কোনো আস্তানা নেই, তবে কালী-মন্দিরে ও বোধ হয় খুব বেশী যায়। অসাধারণ ছেলে ও!— বলে সিধু উৎপলার পানে চেয়ে আবার বলল,

—আপনার আশ্রম সে ছাড়লো কেন?

—ওকে আমরা চাকর রাখিনি। আলোকবাবুর কাছে আসতো। এই জীবনের মা অপর্ণাকেও চিনতো সে। মাঝে-মধ্যে আসতো, আবার চলে যেতো। সত্যি, অনাসক্ত নির্ব্বিকার ঐ নওকিশোর। আবার যদি দেখা হয়, আমার কাছে তাকে আসতে বলবেন তো—

—আচ্ছা— বলে সিধু আহার শেষ করলো।

অবন্তী নিজের হাতে ওর থালা-বাটি উঠিয়ে নিল। গোবর দিল উচ্ছিষ্ট জায়গাটায়। ইতিমধ্যে জীবন বাইরে খেয়ে হাত ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উৎপলা দেখলো। জীবনকে বলল,

—যাও জীবন, খেয়ে নাও গিয়ে।

—আমি তো প্রসাদ পেলাম। আর খাব না।

—তাহলে রান্নাঘরে বলে এসো যে, খাবে না।

জীবন চলে গেল। এতক্ষণে সিধু অবন্তীকে প্রশ্ন করল,

—ও কে অবন্তী? কোথায় পেলে ঐ ছেলেটিকে?

—উৎপলাদির কোলকাতার আশ্রমে একটা ঝি ছিল, তারই ছেলে ও।

—অ্যাঁ! ঝির ছেলে?— বিস্ময়ে যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল সিধুর।

—হ্যাঁ, ঐরকমই আমরা জানি— বলে হাসলো অবন্তী; বলল, —ওর মা ঝি ছিল; ওর বাবা কে, তা তো জানি না। হবে হয়তো কোনো মহাজন—চলেগেল অবন্তী!

উৎপলা বলল,

—অপর্ণা পালিয়ে যাওয়ার পর জীবনকে আমার কাছেই রেখেছিলাম। এই আশ্রম তৈরী হবার পর ওকে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোনো ছেলে বা মেয়ের তো পিতৃপরিচয় নেই, সবাই পথের কুড়োনো শিশু···

—ওর পিতৃপরিচয়ের তো কোনো প্রয়োজন নেই, উৎপলা দেবী! বিশ্বপিতাই ওর পিতা।

—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পিতৃপরিচয় একান্ত দরকার সাধুজী!— হাসলো উৎপলা।

—কিন্তু ওরই জন্য কেবল ভাবছেন কেন? এতোগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে কারোই তো নেই সে-পরিচয়।

—না। কিন্তু ওর জন্য কেন জানি না, বিশেষ একটা চিন্তা আছে আমার,—হয়তো ওর সুন্দর চেহারা আর আশ্চর্য্য মেধার জন্য!

—ওর মা'র পরিচয়?

—অপর্ণা ওর মা নয়—এর প্রমাণ না থাকলেও, তার কাজে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। কে জানে, কে ওর মা-বাবা!— উৎপলা যেন অসহায় বোধ করছে।

—যদি একান্ত প্রয়োজন বোধ করেন, উৎপলা দেবী, এবং আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার নামটা ওর বাবা হিসাবে লিখে দিতে পারেন—

উৎপলার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলল,

—আপনার কাছে এই আশাই আমি করেছিলাম। কিন্তু অবন্তী ওর মা হতে চায় না—

—অবন্তী আমার বিবাহিতা পত্নী নয়, এখন হতেও চায় না আর। যে-কেউ এখন জীবনের 'মা' বলে পরিচয় দিতে পারে অথবা না-ও পারে। মার পরিচয় অনাবশ্যক।

—আমাকেই ও 'মা' বলে। বেশ, পিতৃপরিচয়ের কলমে আপনার নামটাই তাহলে লিখে নেবো।

—নেবেন।

দুজনেই অকস্মাৎ দেখতে পেল, অবন্তী হাসছে দরজায় দাঁড়িয়ে।

গৃহহারা মানুষের মিছিল! বীভৎসতার বাস্তব রূপ—অখাদ্যে কুখাদ্যে শীর্ণদেহে জীর্ণবস্ত্রে মানবস্রোত পীচঢালা পথ অতিক্রম করে

চলেছে অন্ন আর আবাসের দাবী নিয়ে—"মান্‌তে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে…"

কর্কশ কণ্ঠ ওদের কালিমাময় করে তুললো আকাশ-বাতাস!

ওরা চলেছে অভিযাত্রিক—তীর্থে নয়, তপস্যায় নয়—শুধু দেহের সঙ্গে প্রাণকে আবদ্ধ রাখবার জৈব তাগিদে। ওদের দেখলে স্থষ্টিকর্ত্তারও লজ্জা জাগবে, যদিও এ স্থষ্টি তাঁর নিজেরই পরিকল্পনা।

হ্যাঁ, নিজের স্থষ্টি-কল্পনাতেও স্রষ্টা দুঃখ পান মাঝে মাঝে। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করে সীতার দুঃখে কেঁদেছিলেন, একথা বিশ্বাস করতে বাধে না; অবিশ্বাস হয় না যে, অভিমন্যুর হত্যা-ব্যাপার লেখবার সময় ব্যাসদেবের নয়ন অশ্রুসজল হয়েছিল, শ্রীগণেশও কলম থামিয়ে কান্না রোধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্ম নাকি নির্ব্বিকার—শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে অর্জ্জুনকে নিয়ে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন—স্নেহের ভাগিনেয়ের নিধন তাঁর কাছে যেন কিছুই নয়; এইজন্যই তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—", ওঁর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। সর্ব্বত্র সব জেনেও তিনি নিশ্চল নির্ব্বিকার। এ চরিত্র ভারতের। মহাভারতেই এ চরিত্র আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিস্ময় এই চরিত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ধ্বংসের মধ্যেই তিনি নবস্থষ্টির প্রেরণা পান—ইচ্ছা করেন, আদেশ করেন। তাই মহাভারতীয় যুদ্ধের ধ্বংসের ইতিহাসে তিনি স্বয়ং কর্ত্তা, যদিও কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব ওঁর কিছুই নেই কোনোদিন।

আজও ভারতের তথা বাংলার ধ্বংস হয়তো ওঁর মনে নবস্থষ্টির প্রেরণা জাগাচ্ছে, জোগাচ্ছে নব অভ্যুদয়েব অবতরণ-পিপাসা। কিন্তু তাঁর স্থষ্টির বুদ্ধিজীবী মানুষ এই ধ্বংসকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, কে জানে! তাঁর চোখে যা কাব্য, তাঁর স্থষ্ট জীবের কাছে তা জীবন—মহিমময় মানুষ-জীবন!

কিন্তু কোথায় মহিমা! ক্লেদপঙ্ক-ক্ষরিত বিষাক্ত মানবভ্রূণ ওরা—দুর্ব্বার জৈবস্রোত যেন আকস্মিক বাধায় উচ্ছল হয়ে উপচে পড়ছে অরণ্য-পর্ব্বতে, মরু-প্রান্তরে—অস্থানে-কুস্থানে। উপায় নাই। জীবনকে ধরে রাখবার তাগিদ জীবের স্বতঃসঞ্জাত। তাই ওরা দাবী জানায় বাঁচবার—বাঁচিয়ে রাখতে চায় ওদের স্রোতোধারা…

চলেছে ওরা বিশাল রাজপথ অতিক্রম করে। অনশনে অবসন্ন হয়তো কেউ পথের পাশে বসে পড়লো; কেউ-বা পড়ে গেল পথের মাঝেই—কেউ হয়তো পতিতকে তুললো, কেউ-বা ওর উপর দিয়েই পা চালালো। কেউ 'আহা' বলল, কেউ-বা কিছুই বলল না—তবু ওরা চলেছে জীবনের জন্য জীবনকে বলি দিতে। মৃত্যু-সঙ্কটকে অতিক্রম করতে ওরা মরণের মুখেই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে!

তিনকোণা পার্ক একটা—শ্যামল ঘাসে সুন্দর, রূপময়। সহরের বড় তিনটি পথ ওর তিনদিক দিয়ে চলে গেছে জন-জীবনের কর্ম্মব্যস্ততায়, বিলাসের কেলি-নিকুঞ্জে আর নির্জ্জনতার নদীসৈকতে। মাঝের এই পার্কটি যেন ঐ তিন ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম। ওর মাঝে কবেকার এক রাজপুরুষের মর্ম্মরমূর্ত্তি মার্ব্বেলের বেদীর উপর খাড়া রয়েছে। বিড়ি টানছে নওকিশোর ঐ বেদীতে বসে। নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে আছে ঐ মিছিলটার দিকে। অবাধ জনস্রোত ' যেন নদীস্রোতের মতই চলছে। কিশোর মুখের ধোঁয়ার মতই ঐ মিছিলটাকেও ধোয়ার মত দেখছে—যেন কিছুই এমন দ্রষ্টব্য নয়। অথচ দেখবার অন্য কিছু নাই বলে ওটাই দেখা।

বিড়িটা প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার উঠবে হয়তো, হয়তো ঐ মিছিলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, কিম্বা বিপরীত পথ ধরে চলে যাবে নির্জ্জন নদীসৈকতে—কে জানে! পূর্ণ একটা টান দিল সে বিড়িতে।

—অপুর্‌ণাদি··· বলে উঠে দাঁড়ালো অকস্মাৎ। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পার্কের কিনারায় এসে ডাক দিল— অপু-র্‌ণা দিদি— !

—কে ?— চাইল ওর পানে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটা শীর্ণকায়া নারী।

হ্যাঁ, অপর্ণাই। কিশোরের ভুল হয়নি! ওর চোখের দৃষ্টি শ্যেনতীক্ষ্ণ।

—হামি কিশোর আছে। কোথাকে ছিলে তুমি এদ্দিন, অপুর্‌ণাদিদি ?

—সে অনেক কথা ভাই, কিশোর— বলতে বলতে পার্কের অনতিউচ্চ রেলিং ডিঙিয়ে অপর্ণা ভেতরে এসে দাঁড়ালো মিছিল ছেড়ে। বলল,

—তুমি কোথায় আছ, কিশোর ?

—হামি! হামি তো বরাবর আসমানকো নীচুমে থাকি, অপুর্ণা-দিদি!

বাংলাভাষায় জ্ঞানবুদ্ধি অনেক বেড়েছে কিশোরের, তাই ও এখন অপর্ণাকে 'অপুর্ণা' বলে সংশোধন করে নিল। অপর্ণা অকস্মাৎ ওখানেই বসে পড়ে বলল,

—ক'দিন যে খাইনি, কিশোর—কিছু খাওয়াতে পার ? আর তো হাঁটতে পারি না!

—হুঁ—লেকিন ইখানে তো কেউ কুছ্ বিক্রী করছে না, বহিন! চলো উধার।

—কোথায় ? আমি ঐ মিছিলের সঙ্গে যাব, ঠিক করেছি— অপর্ণা বলল।

—উস্‌মে গিয়ে কি হোবে ? কুছ না। চলো হামারা সাথ। আ-যাও, হামি পকড়কে লিয়ে যাব। দুটো রূপেয়া আছে হামার কাছে।

—দু' টাকা! কোথায় পেলে কিশোর ? চাকরী করছো নাকি ?

—নাহি। চাকরী-নোকরী হামি করবে না। উ বড়ি খারাব কাজ। মোটঘাট ·বইছে—আউর ঐসব সিনেমাবলাকো পোষ্টার, ওহি হাম

সাঁটে—ওহি কাম পাকড় লিয়া— কিশোর পার্কের একপাশে-পড়ে-থাকা বাঁশের মইখানা আর একরাশ ছাপা পোষ্টার দেখালো। অপর্ণা হেসে বললো,—ও-ও তো নোকরী!

—নেহি। খুসী হোবে, তো ছোড়্ দেবে ও কাম। কৈ-কো নোকর নেহি হাম। আ-যাও বহিন! ও কাম বহুৎ আচ্ছা কাম— হাজারমে দু'-দু'-রূপেয়া— বলে কিশোর টেনে তুললো অপর্ণাকে। বলল,

—ইস্পেলেনেড্মে আ-যাও—কুছ খেলা দেগা, তব্ ঠিক হো যায়গা।

বাঁশের হাল্কা সিঁড়িটা কাঁধে আর কাগজগুলো বগলে নিয়ে কিশোর আবার বলল,—এহি টিনোয়া তু লে, অপূর্ণাদিদি—

অপর্ণা আটার টিনটা নিয়ে চলতে লাগলো ওর সঙ্গে। কিছুটা হেঁটে শুধুলো,—তুমি থাক কোথায়, কিশোর? রাত্রে তো কোথাও শুতে হয়! আর কে আছে সেখানে?

—হামি থাকবার জাঘা কুছ করি নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী আউর কালীঘাট—ই তামাম হামার থাকবার ঠাঁই। রাতমে যাঁহা খুসী শো যাই।

এমন মানুষ কেউ থাকে বা থাকতে পারে, অপর্ণার জানা নাই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল,

—ঐ মিছিলের সঙ্গে গেলে খাবার-থাকবার জায়গা মিলবে, কিশোর। আমাকে তুমি ওখানে পৌছে দিও আবার—

—ডাণ্ডা ভি মিল্ সেকতা— বলে হাসলো কিশোর; বললো,— বহুৎ আচ্ছা। আও, কুছ খা লেও— বলে চৌরঙ্গীর মোড়ের মাথায় বাঁশের মইটা নামিয়ে কিশোর কাছের একটা দোকানে তেলেভাজা-মুড়ি কিনে আনলো একঠোঙা; দিল অপর্ণার হাতে। দিয়েই বলল,

—জাস্তি মৎ খাও, পেটমে দরদ হোগা।

কিন্তু অপর্ণা গোগ্রাসে গিলতে লাগলো খাবারগুলো। এমনকি, কিশোরকেও কিঞ্চিৎ ভাগ দেবার কথা ওর মনে হোল না। কিশোর নির্ব্বিকারচিত্তে একটা বিড়ি ধরিয়ে দেখছে ওর খাদ্য-চিবোনো!

—ক'রোজ খায়া নেহি, অপুর্ণাদিদি?— কিশোর প্রশ্ন করলো।

বাঁ-হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে দেখালো অপর্ণা, দু'দিন। কথাও বলবার সময় নাই ওর। কিন্তু গলা শুকিয়ে গেছে, খাদ্য গলছে না গলা দিয়ে, তাই বললো,—জল···

—হ্যাঁ, পানিভি লা' দেবে।— বলে কিশোর বিড়ি-মুখেই উঠে গেল।

কিন্তু কাছাকাছি জলের কল নেই। বিপন্ন কিশোর ভাবছে, কী করা যায়! সহরের অগণ্য পথচারী কেউ লক্ষ্যই করলো না, জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে একটা লোক জল খুঁজছে আর খানিক দূরে জলের জন্য হা-পিত্যেস করে বসে আছে এক নারী। জল পেলনা কিশোর; কাছেই একজন পিতলের কলসী-ভরা চা বিক্রী করছিল, তাই কিনে আনলো এক ভাঁড়—দিল অপর্ণার সুমুখে ধরে। অপর্ণা বলল,

—তুমি চা খাবে না, কিশোর?

—নেহি। তোম্ খা লেও। হামি দোসরা দফে খাবে।

চা-মুড়ি বেশ আরাম করেই খাচ্ছে অপর্ণা। খাদ্য এমনি বস্তু যে, এই কয়েক মিনিটে ওর মুখশ্রী সুশ্রী হয়ে উঠেছে। ক্ষুধারূপিণী জগৎজননী যেন আহুতি পেয়ে তুষ্ট হয়েই ওকে আবার যৌবন-সুষমা ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছেন—বর দিচ্ছেন! তৃপ্তির একটা মাধুর্য্যে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভরে উঠছে, দেখলো কিশোর।

কিন্তু ওর দেখার মধ্যে কোনো আগ্রহ নেই, নেই কিছুমাত্র ঔৎসুক্যও। অপর্ণা খাওয়া শেষ করবার আগেই দুটো বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে চাইতে আরম্ভ করেছে—এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিল অপর্ণা, এবার প্রায়-খালি ঠোঙাটা ওদের পানে ছুঁড়ে দিয়ে ভাঁড়ের বাকী চা-টুকু শেষ করলো।

—চলো, আব্, কাঁহা যায়েগা ?— প্রশ্ন করলো কিশোর।

—তোমার সঙ্গেই যাব। ওখানে, ঐ মিছিলে আর যাবনা আমি।

—হামার সঙ্গে!— বিস্মিত কিশোর বলল,— হামি কোথায় লিয়ে যাবে? হামার কি ঘর-বাড়ী আছে যে, তুমাকে লিয়ে যাবে—!

—তাহলে কোথায় যাব আমি? ঐ মিছিলে যেতে তো তুমিই মানা করছো—

—কুছ কাম পাকাড় লেও, অপুর্ণাদিদি! এ্যায়সে দিনগুজরান হোবে না। কুছ কাম করো—

—কাম পেলে তো করবো! দাও-না একটা কাজ জুটিয়ে।

কিশোর কোথায় কাজ পাবে! একটু বিপন্ন বোধ করাই স্বাভাবিক তার পক্ষে, কিন্তু নিজেকে কিশোর কদাচিৎ বিপন্ন বোধ করে। অপর্ণার জীবনের ইতিহাসের অনেকটাই তার জানা, তাই রুক্ষস্বরে বলল,

—কাজ তো তোমারা ছিল, অপুর্ণাদিদি—তখন ছোড় দে-কে ভাগা কাহে?

চুপ করে রইল অপর্ণা। খানিক পরে বলল করুণ কণ্ঠে,

—সে যা হবার হয়েছে, কিশোর! এখন কোনো কাজ না পেলে খাব কি?

—ও ভগবান জানে— বলে কিশোর বাঁশের মইখানা আর কাগজগুলো, এবং আটার বালতিটাও নিয়ে চলে যাবে—অপর্ণা তাড়াতাড়ি এসে বালতিটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে বলল,

—আমাকে ফেলে গেলে চলবে কেন? আমি কোথায় যাব? বাঃ!

জড়িয়ে ধরলো অপর্ণা ওর হাতখানা। কিশোর বিপদ বুঝলো। অপর্ণা যেন তার উপর একটা দাবী জানাতে চায়, এমনি ভাব। সহস্র

জনতাপূর্ণ রাজপথ। এখুনি যদি অপর্ণা চীৎকার করে ওঠে যে কিশোর তাকে পথে বসিয়ে পালাচ্ছে, সে কিশোরের বিবাহিতা বা ঐরকম কিছু, যা বলা অপর্ণার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়—তাহলে এখনি লোক জমবে, পুলিস আসবে এবং দুজনকেই হাজতে যেতে হবে।

—আরে, চিল্লাও মৎ— বলে কিশোর ওকে ধমকে থামিয়ে দিল। কিন্তু অপর্ণা ততক্ষণে ওর হাত থেকে আটার বালতিটা কেড়ে নিয়েছে।

কাছেই রাস্তার ওপর ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে; তার ড্রাইভার আদ্যোপান্ত দেখছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণে সে বলল,

—এ—তুমি কাম করবে? হামারা ভাইকা দুকান আছে, রুটি-মাংসকা দুকান—হুঁয়া ঝি-কা কাম কর্ সেক্তা। খানা-পর্ণা, আউর···

মাহিনার কথাটা হয়তো বলতো ড্রাইভারটি। কিন্তু কিশোর বলল,

—হ্যাঁ জি—ভগবানজি আপ্‌কো ভালা করে! লে যাইয়ে ইস্‌কো।

—আও। ওহি মোড় পর মেরা ভাইকা দুকান— সস্নেহে ডাক দিল সে।

—যা অপুর্ণাদিদি! কাম তো ভগবান মিলা দিয়া। যাও। আব্ খুসী হো—

অপর্ণা নিঃশব্দে ড্রাইভারের খোলা দরজা দিয়ে ট্যাক্সির সীটে বসলো এসে। বেশ আনন্দিতই বোধ হচ্ছে ওকে। কিশোর তেমনি নির্ব্বিকার; শুধু ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে নিল, এবং প্রশ্ন করলো ওর নাম, আর দোকানের ঠিকানা। ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বলল,

—অমর সিং। হামারা ভাইকো দোকানকা নম্বর তেয়াল্লিস, রাজ রোড···

ব্যস্, চলে গেল ট্যাক্সি অপর্ণাকে নিয়ে। এই মুহূর্ত্তে যে ফুটপাতে তেলেভাজা-মুড়ি চিবুচ্ছিল, ট্যাক্সির সীটে পরমুহূর্ত্তেই রাজরাণীর মত পা ছড়িয়ে বসল সে! নির্ব্বিকার শিবের মতই দেখলো নওকিশোর।

—দুনিয়া খোদাকো খেল! আলোক-দাদাবাবু বোলতেন—সব তামাম ভগবান্‌জিকা খেল হ্যায়—বাঃ!

আটার বালতিটা হাতে তুলে মইখানা টানতে টানতে চললো চির-উদাসী কিশোর বাড়ীর দেওয়ালে-দেওয়ালে সিনেমার পোষ্টার লাগাবার জন্য।

আলোক গানের আসরে বসলো এসে। না-বসে উপায় নেই। কারণ অঞ্জনাকে কোনো কারণেই ক্ষুণ্ণ করতে চায় না ও। আর অঞ্জনা সত্যি বড় ভাল মেয়ে। এমন শান্ত-স্নিগ্ধ নারী-চরিত্র বর্ত্তমান যুগে বিরল। ওকে পেয়ে আলোকের সহোদরার অভাব পূরণ হয়েছে।

আসরটি অনাড়ম্বরভাবে সাজানো—অঞ্জনা আড়ম্বর পছন্দ করে না। পূজাবেদীর সামনে মেঝেতে সতরঞ্চের ওপর সাদা চাদর—মাঝে একখানা বড় থালায় গোড়ে মালা, আর তার দু'দিকে দুটি ধূপদানে ধূপ পুড়ছে। এর বেশী কোনো সজ্জা নেই। ঐ আসরের একপাশে মেয়েদের আর অন্য পাশে পুরুষদের বসবার ঠাঁই। হারমোনিয়াম, সেতার, বাঁয়া-তবলা। একটা বেহালাও।

অঞ্জনার বাবা ঐ আসরের একধারে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশে আরো দুজন ভদ্রলোক ঐ পাড়ারই। অঞ্জনার স্বামীও এসে বসলো। ওপাশে কয়েকটি তরুণী; সবাই অঞ্জনার বান্ধবী। আলোক আসতেই অঞ্জনার বাবা ওকে ধরে পাশে বসালেন। গান আরম্ভ হোল। সংস্কৃত স্তোত্র গান করলো অঞ্জনা—চমৎকার গাইল।

—এর পর করবী গাইবে— বলে অঞ্জনা যে মেয়েটির দিকে চাইল, আসরের সেরা রূপসী সে। অনবদ্যাঙ্গী। গায়ের রং থেকে পায়ের গঠন

পর্য্যন্ত নিখুঁৎ। সেতার বাজাচ্ছিল করবী। সুন্দর বাজায়! অঞ্জনা সেতারখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিল ওর দিকে। করবী একবার চাইল সবার পানে হাসিমুখে, তারপর আরম্ভ করলো গাইতে।

কিন্তু এইসব অপরূপ সুন্দরী মেয়েরা, বিশেষ করে সহরের মেয়েরা তাদের রূপের প্রশংসা এতো বেশী পায় যে, তারা খুব ভাল জানে, তারা সুন্দরী। এতে তাদের অন্তরে যে আত্ম-অহমিকা জাগে, করবী তাব ব্যতিক্রম নয়। নিজেকে সুন্দর-সংযত করে সে বসেছে। অপরূপ ভঙ্গিমায় গ্রীবা বাঁকিয়ে গাইতে লাগলো একটা হিন্দী ভজন। রূপেব তুলনায় স্বর মিষ্ট না হলেও, ভালই গায় মেয়েটি। শোনবার মত গান ওর। নির্ব্বাক হয়ে শুনে গেল সকলে। অঞ্জনা আবার অনুরোধ করলো,

—আর একটা গা, করু…

একমিনিট থেমে করবী আবার গান ধরলো। আবার একটা হিন্দী গান—তার বাণী থেকে সুর বেশী। খেলিয়ে খেলিয়ে গাইতে লাগলো গানখানা, যেন পোষা পাখীকে উড়িয়ে দিয়ে আবার হাতের মুঠিতে ধরে আনছে। ভালই সাধনা করেছে করবী সঙ্গীতের। সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনলো। কিন্তু আলোক যেন কিছু বিমনা। অথচ আলোকের জন্যই আজকের আসরটা ডেকেছে অঞ্জনা। বরাবর সে চেয়ে ছিল আলোকের দিকে—করবীর গান শুনে আলোকের অন্তর কতখানি মুগ্ধ হয়, তাই দেখবার জন্য। কিন্তু আলোকের কোনো সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না! অঞ্জনা অন্য একটি মেয়েকে বলল এবার,

—তুই একটা গা ভাই, চৈতালী—

চৈতালী নামে মেয়েটি শ্যামলাঙ্গী; কিন্তু খুবই সুশ্রী। ওর দেহের গঠন দীর্ঘ, কোমল—লোমরাজিতে চারুদর্শন। বড় বড় চোখে ও চেয়ে ছিল সুসজ্জিত পুস্তক-প্রতিমার পানে। ধীরে যন্ত্রটা ধরে গাইতে লাগল

বিদ্যাপতির একটি পদ। বড়ই মিষ্টি ওর গলা, আর গায় অত্যন্ত দরদ দিয়ে। ওর শিল্পানুভূতি দরদে পরিপূর্ণ। সবাই খুসী হোল গানটি শুনে। কিন্তু আলোক তখনো উন্মনা।

—দাদা একটা গাইবে এবার— অঞ্জনা বলল আলোককে লক্ষ্য করে।

—না। ওঁদের একখানা বাংলা গান গাইতে বল না! যে-কোনো বাংলা গান—

আলোকের জবাবটা যেন কেমন রুক্ষ শোনালো সভার মধ্যে। অঞ্জনা কিন্তু জানে—হিন্দীগান যতই ভাল হোক, দাদা বাংলা গানই ভালবাসে। ক্ষুণ্ণস্বরে সে বলল,

—করবী পশ্চিমে থেকে হিন্দীগানই শিখেছে। চৈতালীর বাবা তাকে শিখিয়েছেন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি। আমি-ই তাহলে 'রবীন্দ্রনাথ' গাই?

—হ্যাঁ। গা— আলোক বলল যেন আদরের সুরে, শ্যামাসঙ্গীত গা না একখানা? গা—"শ্মশান ভালবাসিস বলে"··· আলোক নিজেই ধরে দিল, সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনাও গাইতে লাগলো। গুরু-শিষ্যার সঙ্গীত-চর্চ্চা অঞ্জনার স্বামী মুগ্ধ হয়ে শুনছে। বলল,

—আলোদা না এলে অঞ্জনা এতো সুন্দর হোত না— কথাটা বলল এক বন্ধুকে। বন্ধুটি ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে আসে। বড়লোকের ছেলে, নাম বিজয়। ভাল গাইতে পারে। তাই অঞ্জনা ওকেও নিমন্ত্রণ করেছে আজ। বিজয় বলল,

—আলোদা তোমাদের একটা সম্পদ। কিন্তু ওঁকে বাইরে আনবে কবে? এতাবৎ ঘরেই তো রইলেন!

—বাইরে ওঁকে নিয়ে আসতে পারে অঞ্জনা, আর কেউ পারে বলে আমার তো ধারণা নেই।

—অঞ্জনা দেবীকেই বল, ওঁকে বাইরে আনতে।

—চেষ্টা চলছে। —বলে হাসলো অঞ্জনার স্বামী।

আলোকের কণ্ঠস্বর এমন কিছু অসাধারণ নয়; কিন্তু সঙ্গীতে জ্ঞান প্রখর, আর দরদ দিয়ে ভাবকে মূর্ত্ত করে তোলে। তাই ওর কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান অপরূপ শোনায়। অঞ্জনার নারীকণ্ঠ-যোগে স্বরলহরী যেন গন্ধর্ব্বরাজ্য করে তুললো আসরটাকে। অঞ্জনার বাবা শ্যামাসঙ্গীত ভালবাসেন। বললেন,

—আর একটা গাও, বাবা! রামপ্রসাদী গাও—

আলোক আরম্ভ করলো—"আমি কি তোর কেউ নই, শ্যামা…"

অঞ্জনাও গাইছে ওর সঙ্গে। কিন্তু অন্য যারা এসেছে এখানে আজ, তাদেরই বেশী সুযোগ দেওয়া উচিত। করবী যেন কিছু অসন্তুষ্ট হয়েছে। উসখুস করছে সে। ওর যেন ভাল লাগছে না। ওর অপরূপ রূপের খাতিরে সর্ব্বত্র ও যে-প্রশংসা পায়, এখানে যেন তেমন কিছু হোল না। উপরন্তু ওর হিন্দীগানকে অগ্রাহ্য করেই আলোক যেন বাংলাগানের ফুলছড়ি ঘোরাচ্ছে। ওকি আবার গান নাকি! ঐ সেকালে রামপ্রসাদী উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত-মজলিসে কোণঠাসা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব কিছু বলা চলে না। করবী চুপ করে রইল গান শেষ হওয়া তক। শেষ হতেই বলল,—আমাকে এবার যেতে হবে অঞ্জনা— উঠে দাঁড়ালো।

—ওমা, সেকি রে? এখনি যাবি কি!

—হ্যাঁ। অন্য এক জায়গায় এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

—কিছু জল খেয়ে যা, আয়— অঞ্জনাও তার সঙ্গে উঠে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে খাবার দিল অঞ্জনা। বলল একটু ম্লান স্বরে,

—আলোদার লেখা গানটা তুই গাইলি না কেন করবী?

—ওঁর খোসামুদি করতে ওঁর গান গাইতে হবে নাকি!

—না ভাই, এমন কথা আমি বলছি না— অঞ্জনা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েই বলল,—খোসামুদি কেন করবি তুই! তা ছাড়া আলোদা

তো একটা 'ভ্যাগাবণ্ড'—না আছে চাল, না বা চুলো। ওর আবার কে খোসামুদি করবে?—সন্দেশ আর একটা দিই?

—থাক্, থাক্! আমি কারো চাল-চুলোর কথা বলছিনে, অঞ্জু! সকলেরই কি বাংলাগান ভাল লাগতে হবে? আমি হিন্দীগানই ভালবাসি।

—নিশ্চয়ই। তা ছাড়া হিন্দীগানই ক্লাসিক। বাংলা গান তো গানই নয়!

—ঠাট্টা করছিস?

—না ভাই। আমার দাদা অত্যন্ত সেকেলে হয়ে গেছে, তাই স্বীকার করছি! ওর জন্য একটা সেকেলে বৌ দেখবো আমি··· পুণ্যিপুকুর-পড়া!

—তা ভাল। ওঁর বৌ হবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই। তোর মনে যদি ওরকম কোনো ইচ্ছে জেগে থাকে আমার সম্বন্ধে তো দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার ওঁকে মোটে ভাল লাগেনি।

—তোর স্পষ্ট সত্যিকথা শুনে খুব খুসী হলাম, করবী। —বললো অঞ্জনা।

জলযোগ শেষ করে করবী চলে যাচ্ছে। বলল,

—তোদের চাকরকে সঙ্গে দে। আমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসবে। রাস্তাটা সরু গলি—একা যেতে ভয় করছে আমার।

অঞ্জনা চাকর রামচন্দ্রকে বললো করবীকে তুলে দিয়ে আসতে। এ-ঘরে ফিরে এসে সে দেখলো, স্বামীর বন্ধু বিজয়বাবু গাইছেন। বেশ কিছুক্ষণ গান চললো এর পর। কিন্তু অঞ্জনার যেন আর উৎসাহ নেই। এ উৎসব-আসর শেষ হলেই যেন ভাল হয় এবার। চৈতালীকে দিয়ে শেষ গান গাইয়ে অঞ্জনা শেষ করে দিল উৎসব। সকলকে জলযোগ করিয়ে বিদায় দিল। রইল ওর বাবা, ওর স্বামী, আর আলেকি··

—চলো বাবা, এবার তোমরা খাবে।— অঞ্জনা বলল।

—তোর মুখখানা মেঘলা কেন রে, অঞ্জু? হয়েছে কি?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—তোমার শ্যামাসঙ্গীত সবাই ভালবাসে না, দাদা…

—তাতে কি হয়েছে? কারো ভালবাসা আদায় করবার জন্যে তো আমার গান নয়, আমার গান আমার অন্তরের সম্পত্তি। সে শুধু বিলোবার জন্য।

—হ্যাঁ, সবাই সে দান কিন্তু নিতে চায় না…

—তারা দুর্ভাগা, অঞ্জনা—ওদের জন্য দুঃখ বোধ করিস্। ঠাট্ বজায় রাখতে দরদহীন অবোধ্য ভাষায় যারা গান গেয়ে বাহ্বা পেতে চায়, তাদের ওপর করুণা জাগুক তোর—আশীর্ব্বাদ করি…

অঞ্জনা এসে প্রণাম করলো আলোদাকে। তার পর বাবাকেও। ওর মুখশ্রী নির্ম্মল হয়ে উঠেছে। ওর স্বামী হাসছে বসে বসে। বলল,

—তুমি খুব নিরাশ হয়েছ, অঞ্জনা, কিন্তু ঐসব আতসবাজীকে দিয়ে আলোদার ওপর পরীক্ষা কেন চালাও তুমি…

—না, আর চালাবো না।—বাবা, চলো খাবে।

সকলে উঠে গেল ওঘরে।

* * *

নিজের সম্মান রক্ষা করতেই যেন উঠে চলে গেল করবী! কিন্তু বড় রাস্তায় এসে দোতালা বাসের লেডীস্ সীটে বসে সে যখন ব্যাপারটার আদ্যন্ত ভেবে দেখলো, তখন মনে হোল—আলোক তার কোনো অসম্মান করেনি। বাংলাগান গাইতে অনুরোধ করা অসম্মান নয় এবং বাঙালী মেয়ে হয়ে করবী একখানা বাংলাগান গাইতে পারবে না, এও খুব শ্লাঘার কথা নয়। কিন্তু করবী সর্ব্বত্র এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এযাবৎ পেয়ে এসেছে যে, অতি তুচ্ছ কারণেও ওর অন্তরে ঘা লাগে এবং পরে

বুঝতে পারে যে অকারণ ও ব্যথিত হয়েছে। আজকের ব্যাপারটা কিন্তু কিছু অন্য রকম।

অঞ্জনা তার দাদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল করবীকে। খুব বাড়িয়েই বলেছিল নিশ্চয়, কারণ করবী আলোকের মধ্যে অসাধারণ কিছুই দেখতে পেল না। অতি সাধারণ একটি যুবক। দেখতে অবশ্যই ভাল, সবল-সুস্থ-সুন্দর পুরুষ। কোনো মেয়ে ওকে বিয়ে করতে অরাজী হবে, মনে হয় না। কিন্তু তার জন্য নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করতে করবী অন্ততঃ রাজী নয়। অবশ্য তিনি যখন বাংলাগান গাইতে বললেন, তখন গাইলেই হোত একটা। পর পর দুটো হিন্দীগান না গাইলেই চলতো। কিন্তু করবীর ধারণা হয়েছিল, হিন্দী গানই তিনি পছন্দ করবেন। কিন্তু এখন এসব ভেবে কি আর হবে! করবী ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল আলোকের চিন্তা মন থেকে!

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে গিয়েই কিন্তু করবী অনুভব করলো, ঐ পুরুষটির মধ্যে একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে—অতি তীব্র সে শক্তি। অত সহজে ওকে ঝেড়ে ফেলা সহজ নয়। ওর মুখ থেকে একফোঁটা প্রশংসা পাবার জন্যও লোলুপ হওয়া যায় হয়তো। এমন গভীর আবেগময় কণ্ঠ করবী আর শোনেনি কখনো! হোক সে কণ্ঠ মিষ্টতায় কম; কিন্তু তার বাণী-ব্যঞ্জনায় বীণা না থাকলেও বেদনা আছে, আছে অনুভূতির সজল স্নিগ্ধতা। মেঘের কালো রূপের মত সে স্বর স্নিগ্ধ-গম্ভীর।

অকস্মাৎ আলোকের সম্পূর্ণ অবয়বটা মনে পড়ে গেল করবীর—যখন সে এসে বসলো, উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে দেখলো সকলকে—করবীকেও। হ্যাঁ, করবীকেও দেখেছিল সে। করবীর মনে হয়েছিল, এরই জন্য আজকের আসর যেন! ব্যাপারটাও সত্যি তাই। অঞ্জনার শেষের কথায় বুঝেছে করবী। কিন্তু এখন বুঝলো—ওরকম পুরুষকে শ্রদ্ধা করা যেতে পারে, ভালবাসা যায় না।...

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

অতঃপর করবী নিশ্চিন্তে বাসের গদীতে হেলান দিয়ে বসলো। শীত-বসন্তের মাঝামাঝি, তবু রাত্রের চলতি বাসে ঠাণ্ডা আসছে। করবী স্কার্ফটা গলায় টেনে দিল ভাল করে।

এই বাসে ওর বালিগঞ্জের বাড়ীর দরজায় গিয়ে নামতে পারবে। ট্রামে চড়লে বদল করতে হোত। ভালই হয়েছে। আর কোনো এন্‌গেজমেণ্ট নাই ওর আজ। পাড়ায় একটা সরস্বতী প্রতিমা এনেছে, সেখানে গিয়ে গান গাইতে পারে দু'একখানা। আর, নয়তো শুয়ে ঘুমুবে। কারো জন্য ওর অপেক্ষা করতে হবে না! ওর পঞ্চবিংশতি বছরের জীবন এখনো সম্পূর্ণ একলা। স্কার্ফটা আরো নিবিড়ভাবে চেপে ধরে করবী ভাবতে লাগলো—অঞ্জনার চেষ্টাটা শুভই, তার মধ্যে সত্যি করবীর জন্য মঙ্গলপ্রচেষ্টা রয়েছে, এবং অনেক আশা করেই অঞ্জনা আজ করবীকে ডেকেছিল ওখানে। নইলে শুধু গান গাইবার জন্য কলকাতা সহরে গায়িকার অভাব নেই।

করবী যেন অকস্মাৎ অনুভব করলো, নিজের গরিমা দেখাবার জন্য অমন চট্ করে উঠে না এলেও পারতো সে। দু'একটা কথা কয়ে আলোককে আরো একটু বুঝবার চেষ্টা সে করলো না কেন? হয়তো আলোক তার হিন্দীগান পছন্দই করেছে, হয়তো আলোকের মনে করবী সম্বন্ধে ভাল ধারণাই রয়েছে, কিম্বা হয়তো করবীর আকস্মিক উঠে-আসায় তার সম্বন্ধে ভাল ধারণাটা নষ্ট হয়ে গেল আলোকের মনে। খুবই বোকামি করেছে করবী! কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দরজায় এসে নামলো সে। বড়রাস্তার ওপরেই ওদের বাড়ী—নিজস্ব নয়, ভাড়াবাড়ী। তবে ওর বাবার অবস্থা খারাপ নয়, ওর দাদাও ভাল রোজগার করেন। করবী আদরিণী মেয়ে—সুন্দরী এবং শিক্ষিতা বলে বাড়ীর গৌরব।

কিন্তু ওর বিয়ে দেবার আয়োজন হচ্ছে না। ঘর মেলে তো বর মেলে না—এমনি ভাব। মাসকতক পশ্চিমে থেকে করবী তার আভিজাত্যে আরো নতুন অলঙ্কার ধারণ করেছে। ওর ইচ্ছে বিলেত-ফেরৎ কাউকে বিয়ে করে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে বিলেত-ফেরৎ আর না হলেও চলবে। শিক্ষিত মার্জিত-রুচি স্বাস্থ্যবান কাউকে পেলেই ওর বাবা-দাদা বিয়েতে মত দেবেন। কিন্তু করবীর ইচ্ছাটা এখনো উঁচু তারে বাঁধা রয়েছে। তাই ও আলোককে এত সহজে এড়িয়ে এল; কিন্তু আসার পর বুঝলো, বর হিসেবে আলোক অযোগ্য নয়। যদিও মুখে করবী সেটা স্বীকার করে না।

দোতালায় উঠতেই ওর বৌদি প্রশ্ন করলেন,

—কেমন দেখলি, করবী?

—কাকে?

—সেই আলো না অলকানন্দা!

—তোমার লিঙ্গ ভুল হচ্ছে, বৌদি। অলকানন্দা স্ত্রীলিঙ্গ। আমি যাকে দেখে এলাম, সে পুরুষ। অবশ্য সু কি কু, বিবেচ্য।

—বিবেচনাটা কখন করবি?

—শনৈঃ শনৈঃ— বলে করবী হেসে চলে যাচ্ছে, বৌদি বললেন,

—অঞ্জনা যার কথা অত করে বলে গেল, তাকে অত সহজে আমরা নাকচ করবো না। তোর দাদা ওকে দেখতে যাবে।

—কী— করবী দৃঢ়কণ্ঠে বলল,— দাদাকে মানা কোরো। আজকাল-কার বোনেদের জন্য পাত্র দেখতে যাবার আগে বোনের সম্মতি আবশ্যক। অঞ্জনা ভাল বলবেনা কেন! অঞ্জনার দাদা তিনি। নিজের ঘোল কেউ টক বলে না, বুঝলে বৌদি? তোমার দাদার সম্বন্ধেও তোমার ঐ অভিমত হবে নিশ্চয়।

—হবেই তো। অঞ্জনার দাদাকে তুই নাকচ না করলে—আমার দাদা···

—বদল-বিয়ে আমি পছন্দ করি না— চলে গেল করবী।

ও যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। চিন্তাশীলতাও আছে ওর। বর্ত্তমান যুগের মেয়েদের বিবাহ-সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে, ঠিক করলো। আজই লিখবে। ওদের একটা মাসিক কাগজ আছে, নাম 'যুগনারী'; করবী শুধু তার নিয়মিত লেখিকা নয়, রীতিমত পরিচালিকাদের একজন। 'যুগনারী'তে একটা প্রবন্ধ লেখবার উপাদান অন্ততঃ পাওয়া গেল, ভেবে করবী আনন্দিত হোল। এখুনি লিখতে বসবে। ওর আর তর সইছে না। আজ সরস্বতীপূজা—অনধ্যায়। কিন্তু বালিগঞ্জে ওসব শাস্ত্রের ধার ঘেঁষেও যায়না কেউ। করবী কাপড় ছেড়ে বেশ 'ঈজি' হয়ে লিখতে বসলো—"বর্ত্তমান বাংলায় শিক্ষিতা নারীর বিবাহ-সমস্যা"—কেটে লিখলো 'শিক্ষিতা কন্যা'—আবার কেটে লিখলো 'শিক্ষিতা তরুণী'। কিন্তু এটাও পছন্দ হচ্ছে না। শেষে শুধু 'বিবাহ-সমস্যা' লিখে প্রবন্ধ আরম্ভ করলো।

ওর মত শিক্ষিতা মেয়ের কোনো-কিছু লিখতে বসলে আটকাবার কথা নয়; কিন্তু আটকে যাচ্ছে। সব সময়ই মনে হচ্ছে যেন নিজের কথাটাই প্রকাশ করে ফেলছে করবী। নিজের অন্তরের দৈন্য—স্বামি-লাভের জন্য আত্মার ক্ষুধা…নাঃ, এরকম লেখা চলবে না! করবী সমস্ত প্রবন্ধটা কেটে আবার আরম্ভ করলো বেশ তেজগর্ভ ভাষায়। কিন্তু একি! সবটাই পুরুষদের উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিশেষ করে আলোকের উপরই যেন বিষটা গিয়ে পড়ছে। নাঃ, এও হোল না! করবী একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড়লো সেদিনকার মত।

সকালে স্নান সেরে সত্যিই সে লিখলো একটা প্রবন্ধ। লিখলো সে :

"বর্ত্তমান সমাজে মেয়েদের বিবাহ একটা বড় সমস্যা। লেখাপড়া শিখতে শিখতে তাদের বয়স তো বাড়েই, উপরন্তু তাদের মনটা দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং বিচারশীলতা বেড়ে যায়। এরকম অবস্থায় বাবা-দাদার

পছন্দকরা বরকে ঠিক সহজভাবে যারা গ্রহণ করতে পারে না—এবং অনেকেই পারে না,—তাদের মনে দুর্ভাগ্যের একটা কালো মেঘ জমে ওঠে। অপরপক্ষে বর্ত্তমান সমাজে নিজে দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে করার সুযোগও ঠিকমত পাচ্ছে না নারীগণ; কারণ পুরুষের দিকটা ঔদার্য্যে এখনো সুপ্রতিষ্ঠ হয়নি। তারা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির আস্বাদ পেতে চায়—বিয়ে করতে হলেই বাইশ হাত জলে পড়ে গিয়ে। কদাচিৎ কেউ এগিয়ে আসে। এরকম সমাজে যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, আর যদি বা হচ্ছে তো অপাত্রে, এবং এইভাবে রাশি রাশি নারীজীবন বলি দেওয়া হচ্ছে। দিন দিন শিক্ষিতা কুমারী-মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ তাদের কর্ম্মশক্তিকে ঠিকমত কোনো কাজেও লাগানো হচ্ছে না। এইভাবে দেশের নারী-শক্তি না-সৃজন-পালনে, না বা অর্থকরী উপার্জ্জনে লাগছে। একে অপচয় ছাড়া কি আর বলা যায়···”

দীর্ঘ প্রবন্ধটা শেষ করে করবী বেরিয়ে পড়ল ওদের ‘যুগনারী’ সম্পাদিকার বাড়ীর উদ্দেশে। এই প্রবন্ধটি তাঁকে মনোনীত করিয়ে এই মাসের কাগজেই ছাপাতে হবে। বেশী দূর নয়—পায়ে হেঁটে চলেছে করবী। পথে সীমার সঙ্গে দেখা। সীমা ওর পরিচিতা। বয়সে অনেক বড়—কুমারী।

—কোথায় যাচ্ছ, সীমাদি ?— করবী প্রশ্ন করলো।

—দীপ্তিদির বাড়ী। যাবি তুই ? তাহলে আয়, দুজনে একটা রিক্সা নিই।

—দীপ্তিদির বাড়ীতে যে আমিও যাচ্ছি, তা তুমি বুঝলে কেমন করে সীমাদি ?

—তোর হাতে ঐ-যে কাগজ—ওটা নিশ্চয় গল্প, না হয় প্রবন্ধ—দিতে যাচ্ছিস। আয়, রিক্সাতে শুনতে শুনতে যাব।

সীমা রিক্সা ডেকে করবীকে ওঠালো। নিজেও বসে বলল,

—পড়্, কী লিখেছিস।

—এখন থাক্, সীমাদি—ওখানে তো পড়তেই হবে, তখন শুনবে। এখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—বি. এ.-এম. এ. পাস-করা মেয়েরা তো প্রায় দেখি কুমারী থাকছে—যেমন ধর তুমি একজন, আমি একজন, —আমাদের চেনা আরো শ'খানেক জন। এই সমস্যার সমাধান কী, বলতে পার?

—ঐ বুঝি তোর প্রবন্ধের বিষয়?

—হ্যাঁ, শুধু সমস্যা। কিন্তু সমাধানের ইঙ্গিত আমি দিতে পারিনি।

—এখন সমস্যাটাই ছেপে দে, পরে সমাধান আর কেউ লিখবে।

হাসলো সীমা কথাটা বলতে বলতে। তারপর একটু ভেবে বলল,

—দেশের গতি আর নারীর প্রগতির সঙ্গে পুরুষের মনোগতি তাল রাখতে পারছে না, করবী! তারা চায় উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী বউ, সতী বউ, সখী বউ—কিন্তু শিক্ষিতা নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তারা মানতে :চায় না। এদিকে শিক্ষায় যে স্বাতন্ত্র্য পায় মেয়েরা, তাকে খর্ব্ব করতেও রাজী নয় কোনো মেয়ে। এই দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়ছে—কাজেই···

—ওটা তো সমস্যা, সীমাদি—সমাধান কী, তাই প্রশ্ন আমার।

—চল্ দেখি, দীপ্তিদি কি বলেন!

রিক্সা এসে পৌছালো দীপ্তি দেবীর বাড়ীতে। ইনি এম.এ., বি.টি., বিলাত-ফেরৎ এবং চিরকুমারী। বয়স কত ধরা যায় না। ধনীকন্যা এবং দীর্ঘকাল কোনো স্কুলে ভাল চাকরী করে এখন অবসর নিয়ে 'যুগনারী' বার করেছেন। মেয়েদের কাগজ, তাই লাভ না হলেও লোকসান হয় না। কারণ বর্ত্তমান প্রসাধন-শিল্পের যুগে মেয়েদের এই

কাগজে শাড়ী-চুড়ি, তেল-সাবান, স্নো-ক্রীমের যে বিজ্ঞাপন আসে, তাতেই কাগজের খরচ উঠে যায়।

দীপ্তি দেবী বিচক্ষণ সম্পাদিকা—তাঁর মতামত প্রায় য়ুরোপীয়, এবং বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ করে বলবার শক্তি রাখেন উনি। বেশ হাসিখুসী ভাব—সব সময়ই তরুণী সেজে অবস্থান করেন। ওঁকে ঘিরে বেশ একটি নারীচক্র গড়ে উঠেছে। প্রায় সকলেই কুমারী। বিবাহিতা যে দু'চার জন আছেন, তাঁরা অতি-বৃহৎ কারো স্ত্রী বা কন্যা—প্রায়ই 'লেডী' পর্য্যায়ের কিম্বা রাণী-মহারাণী পদ-সমৃদ্ধা। বাংলার এবং ভারতের সমস্ত নারীপ্রতিষ্ঠানের প্রগতিমূলক সংবাদ এঁরা রাখেন এবং সম্পাদকীয়তে মতামত ব্যক্ত করেন।

দীপ্তি দেবী মৃদু হেসে স্বাগত জানালেন সীমা আর করবীকে। ওখানে আরো তিনটি মেয়ে রয়েছে—একজন টাইপিষ্ট, অন্য দুজন সহ-সম্পাদিকা। ওদের অফিস বেলা আটটা থেকে বারোটা আর বিকাল চারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। মাঝে ঘণ্টা চার ছুটি। ফাল্গুনের কাগজ বের করতে হবে, তাই দীপ্তি দেবী খুব ব্যস্ত। বললেন,

—প্রবন্ধ-কবিতা কিন্তু আছে নাকি, করবী?

—হ্যাঁ। কিন্তু, শুনতে হবে—

সকলে পাশের ঘরে এসে বসলো। সহ-সম্পাদিকা দুজনও। করবী পড়তে আরম্ভ করলো তার প্রবন্ধ। দীপ্তি দেবী একটা সরু সিগারেট বের করে ধরালেন। এটা ওঁর অভ্যাস, সবাই জানে। পড়া চলতে লাগলো। দীপ্তি দেবী নিঃশব্দে শুনে গেলেন সবটা।

—সমস্যাই আছে শুধু, দীপ্তিদি—সমাধানের কিছুই আমি লিখতে পারিনি।— করবী কুণ্ঠিত হাস্যে জানালো।

—ঠিক আছে, সমাধানের ব্যবস্থা আর কেউ করবে। দে ওটা।

করবীর হাত থেকে প্রবন্ধটা নিয়ে 'অ্যাপ্রুভড্' লিখে সহ-সম্পাদিকার হাতে দিলেন তিনি, বললেন,—এখুনি প্রেসে পাঠিয়ে দাও।

বেয়ারাটা বাইরে ঝিমুচ্ছিল। তাকে ডেকে, লম্বা খামে মুড়ে ওটা প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। প্রেস দূরে—দশটার আগে তার অফিস খোলে না, অতএব তাড়ার কিছু নেই।

—এ মাসে রান্নার বিষয় তুমি কিছু লিখলে না, সীমা?— দীপ্তিদি বললেন।

—কৈ আর হোল! মাথায় কিছু আসছে না আর—

—চার পাঁচ দিন সময় আছে। যদি পার তো দাও কিছু লিখে।

—এমাসে 'রান্না' প্রবন্ধটা না হয় বাদ যাক্, দীপ্তিদি—আমি অন্য একটা কথা বলতে এলাম।

—কি?— দীপ্তিদি সাগ্রহে শুধুলেন।

—পথে-পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য কোথায় যেন আশ্রম হয়েছে একটা, খবর জানেন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমাদের উৎপলা করেছে সে আশ্রম। কেন? কী ব্যাপার!

—একটা ছেলেকে ওখানে রাখা যায় না? কিছু টাকাও না-হয় দেওয়া যাবে তার জন্য।

—তা, পলাকে বলে দেখতে পারি। কার ছেলে, কোথায় পেলে তুমি?

আধমিনিট উত্তর দিলনা সীমা। মুখশ্রী ওর করুণ হয়ে উঠলো। বলল,

—পথে-পড়া বলেই তার পরিচয় থাক্, দীপ্তিদি। যদি পারেন তো উৎপলাকে বলুন ফোনে। ওকে নিয়ে আমি কিছু বিপদে পড়েছি। মাত্র চার বছর বয়স—কেউ নেই তাকে দেখবার। রাস্তায় পড়ে থেকে সে মারা যাবে।

—আছে কোথায় ?

—ছিল এক বুড়ির কাছে। সে আজ দিন চার পাঁচ দেহ রেখেছে— বলল সীমা— ছেলেটা পথে পথে ঘুরছিল এঁটো পাতা চেটে। নওকিশোর নামে একজন পশ্চিমা ওকে আমার কাছে এনে দিল কাল সন্ধ্যায়। আমি ঐ বুড়ির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাই নওকিশোর আমাকে চেনে। বুড়িটাও পশ্চিমা ছিল।

—আচ্ছা, দেখছি— বলে দীপ্তি দেবী ফোন করলেন উৎপলাকে। উৎপলা তখনো বাড়ী ফেরেনি। ওর মা বললেন বিকালে ফোন করতে।

সীমা যেন অতিশয় বিপন্না বোধ করছে। দীপ্তি দেবী বললেন,

—ঘণ্টাকতক রাখ গিয়ে। আমি চারটের সময় পলাকে আবার বলবো— বলেই দীপ্তি দেবী নিজের মনেই যেন বললেন,

—কুমারী জননীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে দেশে—প্রতিকার কী, প্রতিরোধ করে কে ?

করবীও কথাগুলো শুনলো ওঁর।

সিনেমা-শিল্পে 'মন্দার প্রডাক্‌সন' একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এই ক'বছরে। পর পর কয়েকটা জনপ্রিয় ছবি তৈরী ক'রে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড় হয়ে উঠলো। অনেকে বলছেন, এঁরা বাংলার সিনেমা-শিল্পের গৌরব রক্ষা করেছেন। এঁদের সবথেকে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে নতুন নতুন অভিনেত্রী আমদানী এবং তাদের ট্রেনিং দিয়ে ভাল অভিনয় করানো। ট্রেনিং এঁরা কতখানি দেন, তা ভগবানই জানেন— কিন্তু সত্যি যে সুন্দরী নায়িকা নির্ব্বাচন করতে পারেন তা স্বীকার করতেই হবে। বর্ত্তমান বাংলায় এঁদের ছবি মানেই 'হিট' এবং 'হাউস ফুল'।

ইকনমিক ক্রাইসিস্ যতই চলুক দেশে—সিনেমা-গৃহের দরজায় লাইন লাগে, ডবল দামে টিকিটের ব্ল্যাক-মার্কেট চলে, এবং ধারে-পাশের চায়ের দোকানগুলো ভর্ত্তি হয়ে যায়। 'মন্দার প্রডাকৃসন' এর মধ্যে আরো দুটি নতুন হাউস তৈরী করিয়েছেন এবং তাঁদের নতুন ছবি 'জরদ্গব' এই নবনির্ম্মিত প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবার বিজ্ঞাপন সাড়ম্বরে ঘোষণা করছে। নায়িকা নাকি অসূর্য্যম্পশ্যা রাজকুমারী—যাকে দেখলে রূপকথা ভুলে যেতে হবে। এবার নায়কও নাকি আনা হয়েছে এক অতি-অভিজাত পরিবার থেকে—যার বাবা মদ খেতে-খেতেই মহাসমাধি লাভ করেছেন।

হাউসগুলো সাজানো হচ্ছে—আজই 'জরদ্গব' ছবির মুক্তি-দিবস। 'মন্দার প্রডাকৃসন'-এর অর্দ্ধেকের মালিক মিঃ সাহা একবার দেখতে বেরুলেন। কোথায় কেমন কি হচ্ছে, খবর নেওয়া দরকার। কিন্তু আর্টের কাজ নিজে দেখে তৃপ্ত হবার সঙ্গে কেউ সঙ্গী থাকলে অনেক বেশী ভাল লাগে, বিশেষতঃ যদি সেই সঙ্গী নারী হয়। তিনি মোটরে উঠেই এই কথাটা ভেবে গাড়িখানা সটান উৎপলার বাড়ীতে নিতে আদেশ করলেন। এই পরম অভিজাতা নায়িকাকে উৎপলাই সংগ্রহ করে দিয়েছে। অতএব নিশ্চয় তারও আগ্রহ রয়েছে হাউস-দেখা বিষয়ে।

কিন্তু উৎপলাকে আগে একটা ফোন করে দিলে সে তৈরী হয়ে থাকতে পারতো—ভেবেই, মিঃ সাহা গাড়ী থামিয়ে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে ফোন করে দিলেন উৎপলাকে। বললেন যে তিনি আসছেন পনর মিনিটের মধ্যে।

উৎপলা সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ফিরেছে। শরীর-মনের অবসন্নতা তখনো ওর দূর হয়নি। অন্য কেউ হলে নিশ্চয় সে যেতে

পারবে না বলে জবাব দিত ; কিন্তু মিঃ সাহাকে ওরকম জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। উৎপলা এই কয়েকটা বছরে মিঃ সাহার জালে বিশেষরূপে জড়িয়ে গেছে। অবশ্য তাতে ওর আর্থিক এবং সামাজিক বহু বিত্তই লাভ হয়েছে, কিন্তু উৎপলার স্বাধীনতা যেন বন্দী ওই মিঃ সাহার কাছে। তাই সে যাবার সম্মতি দিয়েছে ফোনে।

কিন্তু মনটা বিশেষ অপ্রসন্ন। তবু ওকে তৈরী হতে হবে। অতখানি পথ মোটরে আসার পরিশ্রম বড় কম নয়। উৎপলা স্নান করে তৈরী হতে যাবার পূর্ব্বেই শুনতে পেল মিঃ সাহার গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখখানাকে বিশ্রী করলো একবার উৎপলা।

বসবার ঘরে ঢুকে মিঃ সাহা দেখতে পেলেন সাধুবেশী সিদ্ধেশ্বরকে। কেন! উৎপলার বাড়ীতে সাধু কেন ? ওর কি গুরু-টুরু কেউ আছে নাকি! কথাগুলো নিজের মনে আওড়াবার সঙ্গে তিনি এসে বসলেন একখানা চেয়ারে। সিধু একপাশে কম্বলের আসনে বসে আছে। মিঃ সাহা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,

—আপনি কি উৎপলা দেবীর কোনো আত্মীয় ?

—আমি গৃহত্যাগী। আত্মীয়-অনাত্মীয় কিছু নেই আমার ; বিশ্ব আমার আত্মীয়।

—ওরে বাপ্—একেবারে বিশ্ব-বান্ধব !— বিদ্রূপ করলেন 'মন্দার 'প্রডাক্সন'-এর মালিক।

—আমি বিশ্বের বান্ধব হতে পারিনি, আমার অযোগ্যতা,— বিশ্বকে আমার বান্ধব মনে করি— বিদ্রূপটা অগ্রাহ্য করে অতি মিষ্টভাষায় বলল সিদ্ধেশ্বর।

মিঃ সাহা চুপ করে রইলেন একমিনিট, তারপর আবার কথা বললেন,

—তা বেশ। আশ্রম কোথায় আপনার ?

—আমি অনাশ্রমী, বাবা! যে দেবতা প্রতি গৃহমধ্যে অধিষ্ঠিত, তাঁরই দুয়ারে আমার আবাস।

—কিন্তু সব গৃহমধ্যে তিনি না থাকতে পারেন— কথা বলতে বলতে হাসলেন মিঃ সাহা।

—তিনি থাকেন— বললো সিধু,— শুকনো শিলায় তাঁর হিরণ্য-জ্যোতি বিকশিত, শ্যামল শস্যে তাঁর মরকত-কান্তি বিভাসিত—মানুষের দেহরথে তিনি বামনমূর্ত্তি! তিনি নাই, এমন কিছু হতে পারে না, বাবা! তিনি ঠিকই থাকেন, থাকেনা শুধু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস··· সিধুর কথা শান্ত-শীতলতায় অভিসিঞ্চিত।

—সে-বিশ্বাস আসবে কিসে?— তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন মিঃ সাহা।

—তাঁর কৃপায়। তিনি করুণা করে জীবাত্মার মধ্যে সেই পরম ক্ষুধা জাগিয়ে দেন।

—কৈ? আমাদের তো পরম ক্ষুধা দূরে থাক্, সাধারণ ক্ষুধাও বোধ হোল না তাঁর জন্য! তাহলে কি বুঝতে হবে, আমাদের জীবাত্মাই নেই?

সিধু এই বিদ্রূপটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য চুপ করে রইল। কিন্তু উত্তর দিল উৎপলা। কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়, ওঁরা দেখেননি। বলল,

—জীবাত্মা না থাকলে জীবন থাকে না, মিঃ সাহা! কিন্তু আমাদের জীবাত্মা জৈববৃত্তিতে সমাধিস্থ। কবর খুঁড়ে তাকে বের করতে সময় আর সাধুসঙ্গ দুটোই দরকার। বিদ্রূপের শ্যাওলা চাপা দিয়ে জীবনকে মনোরম করা যায়, জীবাত্মার আবিষ্কার করা যায় না। জীবনের কঙ্কাল যেদিন দেখবেন, জীবাত্মা সেইদিন আবিষ্কৃত হবে—

তীক্ষ্ণ আঘাত করলো উৎপলা। কিন্তু মিঃ সাহার 'লেডী' সম্বন্ধে অশেষ ধৈর্য্য। আঘাতটাকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বললেন,

—জীবাত্মা যদি থাকে তো, তাকে চিরদিন কবরস্থ রাখলে ক্ষতি কি, পলা দেবী!

—সে প্রেতত্ব পাবে। জীবনকে যতই সুন্দর করুন, আত্মার ভূতযোনি আপনাকে বিভীষিকা দেখাতে কসুর করবে না—মৃত্যু তার আদি রূপ, আধি আর ব্যাধি তার অনুচর, পরলোক তার পরিণাম। দম নিয়ে বলল,—চলুন, কোথায় যেতে হবে— ?

—ওঃ, আপনি দেখছি এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এরই মধ্যে!

—না, ওঁর শিষ্য হবার যোগ্যতা নেই আমার। ওঁর কিঞ্চিৎ সেবা করতে পেয়েছি, এই ভাগ্য!—চলুন—

ওঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন—মিঃ সাহা যেন কি ভেবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন,

—আপনিও আসুন-না সাধুজী আমাদের সঙ্গে ?

—আজ্ঞে না, আমার পক্ষে ওসব অনাবশ্যক!— বলে সিদ্ধেশ্বর চোখ বুজলো।

মিঃ সাহা গাড়ীর দরজায় উৎপলাকে তুলে দিতে দিতে শুধালেন, —খুব বড় সাধু নাকি ইনি ?

—উনি শুধু 'সাধু'। মানবাত্মা যেখানে নির্ম্মল-নিরঞ্জন, উনি সেখানকার মানুষ—

মিঃ সাহা আর কিছু না-বলে গাড়ীতে চড়লেন।

উৎপলার আগ্রহ কিছুমাত্র নেই; কিন্তু মিঃ সাহা তাঁর নতুন হাউসে নতুন ছবি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন—অতএব মুখখানা যথাসাধ্য প্রসন্ন করে বলল,

—'জরদ্গাব'—ছবির নাম! কী ব্যাপার ? গল্পটা কি ?

—চলুন, দেখলেই বুঝবেন। বাংলা গল্পের একটা অসাধারণ বস্তু! প্লট আমার নিজের, সংলাপের অধিকাংশও আমার।

—তাহলে কাহিনী-সংলাপ-চিত্রলিপিতে আপনারই নাম ?

—না না, পলা দেবী, ওরকম নাম নিয়ে কি হবে আমার? ওসব তো আমার দরকার নেই। ওর জন্য কিছু টাকা দিয়ে একজন নামকরা লেখকের নাম কিনে নেওয়া হয়েছে। মানে—আমার ডাইরেকশন-মত সে লিখেছে।

উৎপলা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। অপ্রয়োজনীয় ওর পক্ষে। তবে মিঃ সাহার সিনেমা-শিল্পে উৎপলার যথেষ্ট স্বার্থ জড়িত আছে। সে-সব কথা বাইরে অপ্রকাশ্য, তাই এখানেও আলোচনা করা হোল না।

মিঃ সাহা সিনেমা-গৃহের দরজায় গাড়ী থামবার পূর্ব্বেই দেখলেন, লাইন দিয়ে লোক টিকিট কিনছে। আনন্দে চোখ জ্বলে উঠলো ওঁর। বললেন,

—বাঃ! ছবিটা লোক টানবে, মনে হচ্ছে। মোটা টাকা পাবলিসিটিতে খরচ করবো এর পর—এখন নতুন ছবির নামেই তো দেখছি খুব ভিড়!

—এ ছবি চলবে নিশ্চয়— বলল উৎপলা।

—কেন? কি হিসেবে বললেন?

—যা একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছেন!—'জরদ্গব।' চমৎকার!

—হ্যাঁ, পলা দেবী। নামটাই আদত। নাম খুঁজে বের করতে আমাকে দু'এক রাত জেগে ভাবতে হয়। পুরোনো-পচা নাম আমি পছন্দ করিনে।

দুজনে নেমে ঢুকলেন ভেতরে। উৎপলা সটান গিয়ে একটা আসনে বসে পড়ল। মিঃ সাহা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে তদারক করে এসে বসলেন। হাউস ফুল।

শো আরম্ভ হোল।

হালকা হাসির ছবি। শিব থেকে শবকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করা হয়েছে ; শেয়ালও বাদ যায়নি। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসকে গোঁড়ামী এবং অন্ধ সংস্কার আখ্যায় অভিহিত করে গোটা গল্পটা গড়া ! সমাজের স্থবিরত্বকে আঘাত করবার জন্যই যেন ছবিখানা দেখানো হচ্ছে। হাসির খোরাক সবটাতেই।

আনন্দের জন্য মানুষ আসে এখানে, হোক সে আনন্দ হালকা হাসিতে বা ইতর ঘটনা-বিন্যাসে আকীর্ণ। দুর্দ্দিনের দুঃখের কশাঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য যেন মানুষ হুল্লোড় করে এসে ঢোকে এইরকম ছবির শো-হাউসে। এখানেও তাই হয়েছে। কিন্তু উৎপলা খুশী হচ্ছিল না। এ কি! মানুষের রুচি-বিকার ওকে যেন কুণ্ঠিত করছে। নীচের তলায় যখন দর্শকগণ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, তখন উৎপলা ওপরের সোফায় বসে ভাবছে—বাংলাদেশে ছায়া-ছবি এখন এই পর্য্যায়েই নেমেছে তাহলে! হয় ক্রাইম-ড্রামা, না হয় হাসির গল্প! মানুষকে আনন্দ দেবার মত সুস্থ-সুন্দর গল্প এখন চলে না বাজারে! ক্লাসিক তো বাদই দিতে হয়েছে। ভাল গান থাকলে এক শ্রেণীর লোক ছবিকে ভাল বলে, কিন্তু সেরকম ছবিও তো খুব বেশী পয়সা পায় না। মানুষের মন এতখানি হালকা হোল কি করে? চিন্তাশীলতা কি চলে গেল বাঙালীর?···

ছবি শেষ হোল। মিঃ সাহা একবার কাউণ্টারে গিয়ে বিক্রীর অঙ্কটা জেনে নিয়ে হাসিমুখে এসে বললেন,

—রিপোর্ট খুব ভাল। সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন।—চলুন—

—চলুন— উৎপলা উঠে এসে গাড়ীতে বসলো।

পথে মিঃ সাহা ছবির সাফল্য সম্বন্ধে বহু কথাই বললেন, কিন্তু উৎপলা কোনো সাড়া দিল না। ওর যেন মনে হচ্ছিল—এইসব হালকা ছবি পরিবেশন করা অপরাধ। মানুষকে এতে মানবত্ববোধ থেকে

বিচ্যুত করা হয়। ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করে পয়সা রোজগার করা হতে পারে, কিন্তু নিজের ধর্ম্ম তাতে বজায় থাকে না।

বাড়ীতে ঢুকেই উৎপলা সটান চলে গেল উপরের ঘরে। মিঃ সাহা এসে বসলেন ড্রইংরুমে। সিধু কম্বলের উপর বসে রয়েছে, দেখলেন।

—আপনি সেই থেকে বেরুননি সাধুজী?

—না— সিধু উত্তর দিল।

—আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের ছবি খুব ভাল উত্‌রেছে। এই টাকাটা প্রণামী দিচ্ছি, নিন— বলে মিঃ সাহা একগোছা নোট ফেলে দিলেন সিধুর আসনে। অনেকগুলো দশ টাকার নোট।

—এ আমি নিয়ে কি করবো?— সিধু ব্যাকুল-বিপন্ন ভাবে চাইল।

—কেন? আপনার আশ্রমে খরচ হবে।

—আমার তো আশ্রম নেই।

—আপনার নিজেরও তো দরকার? টাকাটা রাখুন।

—না, ধন্যবাদ। টাকার আমার প্রয়োজন নেই।

—আমি দিয়েছি, আর তো ফিরিয়ে নেব না?

—আপনি কোনো জনকল্যাণ-আশ্রমে দান করবেন। আমার অনাবশ্যক!

—অনাবশ্যক! টাকা বস্তুটা এত তুচ্ছ নয়, সাধুজী। লোটা-কম্বলও কিনতে হয়। ভিক্ষে করা থেকে অযাচিত দান নেওয়া ভাল।

—না— সিধু বললো,—অযাচিত সেই দানের মধ্যে থাকে দাতার অহঙ্কার। তার বদান্যতার প্রকাশ-গর্ব্ব। তাকে পাপ বলে মনে করি।

—পাপ!

—হ্যাঁ। আমার জন্য এই পাপ আমি আপনাকে করতে দেব না। এই দান আপনার দয়াবৃত্তি থেকে নয়, আপনার ধনগৌরব দেখাবার

জন্য। একে স্বীকার করলে আপনার পাপকে আমার প্রশ্রয় দেওয়া হবে। আমি মুষ্টিভিক্ষার মালিক। যাঁরা সৎ গৃহস্থ, ভিক্ষাদান করাকে যাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রাপ্তি বলে মনে করেন, তাঁদের দরজায় দাঁড়িয়ে ভগবানের নাম শোনাই—দেহরক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করি।

—এই বিশাল প্রাসাদটি বুঝি সৎগৃহস্থের বাড়ী, আর উৎপলা দেবী সেই সৎগৃহস্থ—কেমন ?

—আমি উৎপলা দেবীর কাছে দান গ্রহণ করতে আসিনি, দান করতে এসেছি তাঁকে ভগবানের নাম। তিনি ধনী হলেও এই 'নামধন' তাঁর নেই।

—বেশ তো। আমাকেও কিঞ্চিৎ নাম ধন দিয়ে দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

—আপনাকে আমি নামদানের যোগ্য পাত্র মনে করি না। আর নামদানের দক্ষিণা টাকায় দেওয়া যায় না, সে দক্ষিণা দিতে হয় শ্বাসে-শ্বাসে নাম জপ করে।

—আমি পারবো না, মনে করছেন ?— মিঃ সাহা আর বিদ্রূপ করতে পারছেন না। সাহস করছেন না। যতটা সম্ভব নিজেকে নীচু করেই তিনি ঐ কথা বললেন এবার।

—পারা-না-পারার কথা নয়, আপনার এখনো সময় হয়নি। ঈশ্বর করুন, যেন সে-সময় আপনার এই জন্মেই হয়।— সিধু চোখ বুজলো নিঃশব্দে।

পৃথিবীর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছেন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা। সে পরিবর্ত্তন শুধু মানবজগতে নয়, প্রকৃতির রাজ্যেও। ঋতু যেন যথাযথ সময়ে হচ্ছে না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ভূমির উর্ব্বরতা ক্রমেই কমে আসছে এবং নানা নৈসর্গিক উৎপাত আকস্মিক সম্ভব হচ্ছে।

মানবরাজ্যে মহামারী তো চলছেই—দুর্ঘটনার সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়ছে। কোথাও ভূমিকম্প, কোথাও জলপ্লাবন, কোথাও অগ্নিভয় শুধু নয়, মানুষের তৈরী বৃহৎ শিল্পগুলিতেও যেন পাইকারী হারে ঘটছে দুর্ঘটনা—খনিতে ধ্বস নামা, ট্রেনে কলিসন, সেতুর পতন, মোটর-বাসের বিপর্য্যয় যেন নিত্যকার ঘটনা। একে আরো ভয়াবহতা দিয়েছে দুর্নীতির অভিশাপ, দস্যু-তস্করের উপদ্রব, তার সঙ্গে সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা, জাতিগত-ভাবে জিগীষা।

এমনি একটা সময় আসবার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। কলি যত প্রবল হবে, ততই নাকি এসবের বাড়াবাড়ি চলবে। তাহলে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে মানুষ! কলির তো এখনো বহুবৎসর পরমায়ু! ভাবছে আলোকনাথ।

কোষগ্রন্থ ছাপার কাজ আজ আরম্ভ হবে—সেখানেই যাচ্ছে আলোক। 'কপি'র তাড়া বগলে এসে ট্রামে উঠলো। চিন্তা ওর নিত্যকালের সঙ্গী। কলির কথা ভাবতে ভাবতে কলকাতার কথা এসে পড়লো ওর চিন্তার পরিধিতে। সুবিশাল মহানগরী। কত লোক, কত বিচিত্র মানবজীবন! কত বিরাট মানব-মহিমা—কত ক্ষুদ্র মানব-চেতনা!

ট্রামের বেঞ্চে বসে ভাবছে আলোক—এই মহিমময় মানবজীবনের আদিম দিন থেকে এপর্য্যন্ত কত মহাপুরুষ, কত অবতারকল্প, কত সত্যদর্শী ঋষি এলেন—কত কি ভাল শেখালেন, কত পথ নির্দ্দেশ করলেন ভূমানন্দ লাভের জন্য—মানব-চেতনাকে ভাগবতী চেতনায় উন্নীত করবার জন্য—কিন্তু কি করলেন! মানুষের জৈব চেতনা কতটুকু উন্নত হয়েছে? আজও তো মানুষ তেমনি কাম-ক্রোধ-লোভ

তেমনি ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ! শুধু তাই নয়। স্বস্বার্থকে মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় মহিমান্বিত করে একজন আর-একজনকে শোষণ এবং শাসন করতে চায়। অপরের অগ্রগতি রোধ করে নিজের গতিকে বেগবান করতে চায়···

আরো অনেক কিছু ভাবতো আলোক, কিন্তু ট্রামে অকস্মাৎ একটা গোলমাল উঠলো—দেখা গেল, এক পকেটমার ধরা পড়েছে। পকেটমার এক স্ত্রীলোক—চড়-চাপড় তার অঙ্গে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আরোহী ভদ্রলোকদের পক্ষে, তাই শুধু কথার অজস্র আবিলতা বর্ষিত হচ্ছে মেয়েটির উপর; কিন্তু সত্যই মেয়েটি অপরাধী কিনা, কেউ যেন আর জানতেই চান না। একটা হুল্লোড় হৈ-চৈ অবস্থা। আলোক এগিয়ে এসে দু-একটা প্রশ্ন করে জানতে পারলো, জনৈক আরোহীর মনিব্যাগ খোয়া গেছলো; সেটি খোঁজ করবার জন্য সবাই যখন চেষ্টা করছেন এবং সকলের দেহ-তল্লাসী করবার কথা উঠেছে, তখন ঐ মেয়েটির সীটের তলায় ব্যাগটি পাওয়া যায়। ব্যাগ যে-ই অপহরণ করুক, সেই মেয়েটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। মেয়েটি ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে।

এতগুলো লোকের কথার বিরুদ্ধে সে কিছুই বলতে পারছে না। দেখেই মনে হয়, অভাবগ্রস্ত ঘরের যুবতী—কিন্তু তার সরল সুন্দর চোখেমুখে অপরাধীর লক্ষণ ধরা যায় না; বিপন্না বলেই বোধ হয়।

—ও যে ব্যাগটা নিয়েছিল, তার কি কোনো প্রমাণ আছে?—আলোক প্রশ্ন করল।

—ওর সীটের তলায় ব্যাগটা গেল কেমন করে, মশাই?—বললেন একজন। অন্যজন বললেন বেশ রাগতঃ স্বরেই, —ধরা পড়ার ভয়ে সীটের নীচে ফেলে দিয়েছে। আমরা সবারই পকেট অনুসন্ধান করবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ ঐ সীটের তলায় পাওয়া গেল।

—তাতেই প্রমাণ হয় না যে, ও চোর। পকেটমার এতো নির্ব্বোধ হয় না যে নিজের সীটের তলায় বামাল ফেলবে। নিশ্চয় কেউ ওর সীটেব তলায় ব্যাগটা ছুঁড়ে দিয়েছে—আপনাবা একটু বিবেচনা করুন···

আলোকের কথায় সবাই কিঞ্চিৎ যেন চিন্তিত হোলেন। আলোক আবার বলল,

—ব্যাগটা প্রথম কে দেখতে পান ওখানে?

—ইনি— বললেন একজন ভদ্রবেশীকে দেখিয়ে প্রথম বক্তা।

আলোক বলল,

—এঁর নজরটা ওখানেই সর্ব্বাগ্রে গেল কেন? মেয়েটির প্রতি সন্দেহের কোনো কারণ পূর্ব্বে তো ঘটেনি। এতো ভীড়ের মধ্যে সীটের তলায় ছোট ব্যাগটা উনি কি ভাবে দেখতে পেলেন?

সকলেই কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন সেই ব্যাগ-দেখা লোকটির পানে। সে লোকটিই এতক্ষণ বেশী গালাগালি দিচ্ছিলেন। আলোকের কথায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললেন,—আমার হঠাৎ নজব পডল ওদিকে।

—বেশ, আপনি কোথায় উঠেছেন ট্রামে?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—শ্যামবাজারের মোড়ে, পাঁচ-রাস্তায়।

—তুমি কোথায় উঠেছ?— আলোক এবার প্রশ্ন করলো মেয়েটিকে।

—ট্রাম-ডিপোতেই আমি উঠেছি, তখন ট্রামে কোনো লোকই ওঠেনি।

—আপনি কোথায় উঠেছেন?— এবার আলোক প্রশ্ন করলো ব্যাগের অধিকারীকে।

—আমিও শ্যামবাজারের [redacted]

—তাহলে দেখা যাচ্ছে— [redacted]য়েটি আপনার ট্রামে ওঠবার আগে থেকে উঠে [redacted]ই ভদ্রলোক প্রায়

আপনার সঙ্গেই ট্রামে উঠেছেন। তখন ট্রামে ভিড় হয়েছে এবং আপনার পকেট-মারার খুবই সুযোগ ঘটে গেছে। মেয়েটি ছিল সীটে বসে—আপনার পকেট-মারা কি করে তার পক্ষে সম্ভব হয়? যাদুবিদ্যা নিশ্চয় ঐ মেয়েটি জানে না?

আলোকের কথা বলার ভঙ্গীতে সকলেই হেসে উঠলো।

—আমি বলিনি যে এ-ই চোর— বলল ব্যাগ-দেখা লোকটি—আমার নজর ওখানে পড়লো, তাই আমি সকলকে দেখিয়ে দিলাম যে ঐখানে ব্যাগ রয়েছে··· বলতে বলতে ব্যাগ-দেখা লোকটি সুট করে নেমে গেলেন।

—এই—থামুন, যাবেন না— চীৎকার করে উঠলেন ট্রামের সকলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! লোকটি রাস্তার ভিড়ের মধ্যে অন্য এক চলতি বাসে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সকলেই বুঝলেন, উনিই চোর। মেয়েটি থরথর করে কাঁপছিল। আলোক সস্নেহে বলল, —বসো—তুমি বসো, তুমি চোর নও—

এতক্ষণে হু-হু করে চোখের জল নেমে এল তার। ছুটে এসে আলোকের পায়ের উপর পড়ে বলল,—আপনি ভগবান—আপনি আমার বাবা···আপনি···

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে আলোক আবার বসিয়ে দিল তার সীটে। নিজের আসনে তার আর বসবার দরকার নেই, কারণ ট্রাম প্রায় তার নামবার কাছাকাছি এসে পড়েছে; দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো—বহু স্থানেই এরকম হয়, সত্যি অপরাধী ধরা পড়ে না, অন্য এক নিরপরাধ শাস্তি ভোগ করে। ক'দিন আগে কাগজে পড়েছে, চেহারার সাদৃশ্য দেখে একজন সাধুকে পুলিশ চোর সন্দেহে দু'মাস হাজতে রেখেছিল। অকারণ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হাজতবাস করতে হোল দু'মাস। এমন কত হয়—কত হচ্ছে।

আত্মবিস্মৃত আলোকনাথ কখন ট্রাম-ষ্টপ্‌টা পার হয়ে গেছে; একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেশনের মোড়ে এসে গাড়ী দাঁড়ালো। বহু ব্যক্তি নামলেন, আলোকও নামলো। ওকে আবার খানিক পিছিয়ে যেতে হবে। নিজের উপর খুবই বিরক্ত হচ্ছে আলোক—নিরুপায় হয়ে ফিরছে, অকস্মাৎ ট্রামের সেই মেয়েটি একেবারে কাছাকাছি এসে বললো,

—আপনি কোথায় যাবেন, দাদা?

—ঐ ছাপাখানা। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

—আমি চাকরীর খোঁজে যাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে খুব বাঁচিয়ে দিলেন!

—ওর জন্য আবার ধন্যবাদ কেন? কোথায় চাকরী? কি চাকরী করবে তুমি?

আলোক প্রশ্নের সঙ্গে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলো মেয়েটিকে। নিতান্ত কচি মেয়ে—বয়স আঠার-উনিশ। শ্যামলা সুশ্রী। চোখদুটি আয়ত এবং উজ্জ্বল। দরিদ্রঘরের কুমারী কন্যা। আলোক বলল,

—লেখাপড়া কতটা শিখেছ? কাজ কিছু জান?

—আই-এ পাশ করেছি। টাইপ জানি। আমাদের বড় কষ্ট, দাদা! বাড়ীতে ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। বাবা-মা আছেন। কিন্তু কোনো রোজগার নেই বাবার। কী ভাবে যে সংসার চলবে, জানি না!

আলোক চুপ করে রইল। এরকম শত-সহস্র রয়েছে এই বাংলাদেশে। কী সে করতে পারে এর জন্য? চাকরীর ক্ষেত্রও জানা নেই আলোকের, যেখানে ওর জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। বলল,

—আমি নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি, বোনটি! আমার তো কোনো ফার্ম্ম জানা নেই, যে তোমার কোনো কাজ জুটিয়ে দেব! তবু তোমার ঠিকানাটা দাও,—যদি কিছু করতে পারি, চেষ্টা করবো।

—জয়ন্তী। তেত্রিশ বাই তিন বাঁশবেড়িয়া লেন—লিখে নিন, দাদা!

আলোক নোটবুকে ওর নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে আবার বলল,

—আমার নাম আলোক। কোনো কাজ যদি পাই তো তোমাকে লিখবো—এখন যেখানে যাচ্ছ, যাও··· বলে সে নিজেই চলে গেল।

কথা বাড়িয়ে বা হৃদ্যতা দেখিয়ে লাভ নেই। তাই একটু নিষ্ঠুরের মতই চলে গেল আলোক। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সেদিন অপর্ণাকে দেখার পরও আলোক এমনি নিষ্ঠুর হয়ে চলে গিয়েছিল। সে কি সত্যি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে? তার মনের দয়াবৃত্তি কি শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন!

ওপাশের ফুটপাতে উঠে আলোক তাকিয়ে দেখলো, এপাশের ফুটপাতে মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথায় ও যাবে, ও যেন জানে না—এমনি হতভম্ব ভাব। কিন্তু আলোক কিছুই করতে পারে না। দুটো টাকা দিলে ওর বিশেষ কোনো সাশ্রয় হবে বলেও মনে হয় না। আর এমন ক'জনকে আলোক দান করতে পারে! নিজেকে কঠিন করে আলোক জনারণ্যে লুকিয়ে গেল।···

বিরাট সেই ছাপাখানার কর্ম্মচক্র আবর্ত্তিত হচ্ছে। মেসিনের শব্দ আর মানুষের গুঞ্জন মিলে এক অপূর্ব্ব জগৎ যেন এখানে। আলোক অফিসে ঢুকে নমস্কার জানালো ম্যানেজারকে।

—আসুন— স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন ম্যানেজার।

—আজ থেকেই আমাদের কাজটা ধরুন তাহলে— আলোক বলল।

—হ্যাঁ, দেখি আপনার 'কপি'— ম্যানেজার হাত বাড়ালেন।

কিন্তু আলোক ঐ অফিস-ঘরে অন্য একজনকে দেখছে তখন। ওপাশের একটা টেবিলে একটি তরুণী নিবিষ্টমনে প্রুফ দেখছে। আলোক মুহূর্ত্তে চিনতে পারলো, তরুণীটি করবী। করবীও চাইল ওর পানে। তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম নামিয়ে এসে নমস্কার করে মৃদু হেসে বলল,—আপনি এখানে!

—হাঁ, কিছু ছাপাবার আছে। আপনার কি ?

—আমাদের 'যুগনারী' কাগজ এখানেই ছাপা হয় যে। আমার একটা লেখা আছে এ মাসে, তারই প্রুফ দেখতে এসেছি।

—ওঃ—ভাল।— আলোক কথা কেটে নিজের কাজে মন দিতে চায়। কিন্তু করবী আবার বলল,

—অঞ্জনাদির বাবার সেই কোষগ্রন্থ বুঝি ?— হাসলো করবী।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি কেন ঐ কোষগ্রন্থের জাঁতিকলে এতকাল বদ্ধ আছেন, বলুন তো ?

—জাঁতিকলে আট্‌কালে ছাড়ানো মুস্কিল··· হাসলো আলোকও।

—আপনার পক্ষেও ?

—হ্যাঁ। আমিও মানুষ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা তো খুব কম !

—মোটেই না। আপনার অনেক খবর জানি আমি। আপনার কাজ শেষ করুন, আমিও প্রুফটা দেখে নিই। কালই আমাদের কাগজ বের হবে, তাই একটু তাড়া আছে। ছাপা হলে আমার প্রবন্ধটা শোনাবো আপনাকে—

করবী আবার তার টেবিলে বসলো গিয়ে। আলোক তার কপি ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিল। ম্যানেজার ওকে প্রশ্ন করলেন,

—আপনি কি এখন এই কোষগ্রন্থই সঙ্কলন করছেন ?

—হ্যাঁ। যিনি সঙ্কলন করছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করি। কাজটা ভাল কাজ, তাই আমার ভাল লেগেছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ভাল কাজ— বললেন ম্যানেজার।

করবী প্রুফ-দেখা শেষ করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে, বলল আলোককে,

—চলুন, কোথায় যাবেন এখন ?

—বাড়ী ফিরবো— বলে আলোক উঠলো। করবীও আসছে সঙ্গে।

—সেদিন গানের আসরে হয়তো আপনার বিরক্তির কারণ হয়েছিলাম— বলল করবী।

—না—কেন ? বিরক্তির কোনোকিছু তো হয়নি।

—আমার হিন্দী গান—

—হোলই বা। তবে আপনি তো হিন্দুস্থানী নন। আপনার মুখে হিন্দী উচ্চারণ বিকৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাতে কি ? বিরক্ত হবার তো কিছু নেই—

—আপনি বাংলা গান বেশী ভালবাসেন—

—হ্যাঁ, আমি কায়মনোপ্রাণে বাঙালী। নিজেকে সকলেই কিছু বেশী ভালবাসে। আচ্ছা, নমস্কার—

আলোক ট্রামে উঠলো।

বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয় সরকারী সাহায্যে যতটা না হোক, সাধারণের সাহায্যে খুবই পরিপুষ্ট হচ্ছে। দেশের ধনী ব্যক্তি, বিশেষ করে মহিলাগণ একে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করছেন। এর আভ্যন্তরীণ কারণ অনুসন্ধান না করেও বোঝা যায় যে, এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শুধু অনাথ শিশুদের জন্যই এই প্রতিষ্ঠান ; সাধারণভাবে দেশের সকল ছেলেমেয়ে এতে স্থান পায় না—পেতেও চায় না। এদিক দিয়ে ব্যাপারটা যেন জাতিচ্যুত অবস্থায় রয়েছে। অথচ উপায় নাই। কারণ ঐরকম শিশুদের জন্যই ঐ বিদ্যালয় গড়া হয়েছে।

এই শিশুরা বিশ্বের শিশু। জাতি-কুল-পরিচয়হীন সর্ব্বদেশের শিশুদের জন্যই এই বিদ্যালয় ; সুতরাং সকল দেশের নরনারীর সহানুভূতি

পাবার যোগ্যতা এর আছে—এইজন্য অবন্তী সারা পৃথিবীর মানবহিত-ব্রতীদের কাছে একে সাহায্য করবার জন্য আবেদন পাঠায়। সাহায্যও আসে প্রচুর। দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানটি প্রকাণ্ডকায় হয়ে উঠলো। এতে এখন তিনশো শিশুর স্থান হতে পারে। সুতরাং সীমা যে ছেলেটির কথা বলেছে, তাকে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। উৎপলা ছেলেটিকে নিয়ে সীমাকে তাব সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। সীমা এল।

—এসো। ছেলেটিকে পেলে কোথায় তুমি ?— প্রশ্ন করলো উৎপলা।

—এক পশ্চিমা বৃদ্ধা ওকে পালন কবতো। সে মারা যাবার আগে নওকিশোব নামে একজন পশ্চিমাকে আমার ঠিকানায় ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে বলেছিল—

—তোমাব ঠিকানা সেই বৃদ্ধা তাহলে জানতো ?

—হ্যাঁ— বলে সীমা একটু কুণ্ঠার হাসি হাসলো। উৎপলা আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করলো না; ছেলেটিকে ভাল করে দেখতে লাগলো। সুন্দর শিশু, সবল সুস্থ। ঘরের এ-কোণা থেকে ও-কোণায় খেলা করে বেড়াচ্ছে। কে জানে, কী ওর পরিচয়! কিন্তু পরিচয়ের কি আবশ্যক ? ও-যে অখণ্ড মানব-স্রোতের অংশ, এতে তো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই; ওর সামাজিক পরিচয় নাই-বা থাকলো। বনের বাঘ-সিংহের তো কোনো সামাজিক পরিচয় থাকে না—ব্যাঘ্রজননী কি নির্দ্দেশ করে দিতে পারে, কোন্ বাঘটি তার সন্তানের পিতা ? পারাবত-জননী কি খবর রাখে, তার কোন্ সন্তানটি কোন্ পিতার ঔরসজাত ?

কিন্তু মানুষ পারাবত বা ব্যাঘ্র নয়—সে মানুষ। মান এবং হুঁস তার আছে। তাই সে সমাজ সৃষ্টি করেছে। সে-সমাজে পিতৃপরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবুও বর্ত্তমান জগতে পরিচয়হীন শিশুর সংখ্যা কম নয়; তাদের পরিচয় হবে 'বিশ্ব-শিশু' বলে। কে জানে তাদের মধ্যে

'মহর্ষি সত্যকাম' জন্মাবেন কিনা! মানুষ হবার শিক্ষা পেলে ওরা মানবজগতের সম্পদ বাড়াবে। উৎপলা বেশ খানিকক্ষণ ভাবলো। তারপর বলল,

—কিছু টাকাও দেবে শুনলাম—

—হ্যাঁ, আপাততঃ শ'-পাঁচেক দিচ্ছি আমি—। সীমা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল।

—না—এখানে না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি ওখানে গিয়ে ছেলেটিকে ভর্ত্তি করে টাকা দিয়ে এসো। খাতায় শিশু-দাতার সহি থাকা দরকার। ভবিষ্যতে কেউ যদি কোনোদিন এই শিশুর মা-বাবা বলে দাবী করে তো তোমার ডাক পড়বে। আজই তুমি যেতে পার।

সীমা ওর কাছ থেকে যাবার এবং ফিরবার ট্রেনের খবর জেনে নিল। চিঠিও একখানা লিখে দিল উৎপলা।

উৎপলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীমা সটান এসে উঠলো হাওড়ার গাড়ীতে। ছেলেটা হাফ-প্যাণ্ট আর লাল জামা পরেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ওর নধর-সুন্দর রূপ দেখে গাড়ীর একটি মহিলা বললেন,

—চমৎকার চেহারা হবে আপনার খোকার। কী সুন্দর গঠন!

সীমা তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলো। কথার স্বীকৃতি ও দিতে চায় না। একটা কমলালেবু বের করে খোকার হাতে দিলেন সেই ভদ্রমহিলা; বললেন,

—খাও— ওর চিবুকে একটা চুমা খেলেন তিনি। শুধুলেন,—আর হয়নি?

—না— এবার জবাব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সীমা ওঁকে জানাবে যে, ছেলেটা ওর নয়; কি ভাবে জানাবে ভাবছে—ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করলেন,

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

—অজয়— সীমা জবাব দিল।

—অজয় ? অজয় তো নদী। কোনো ষ্টেশনের নাম তো 'অজয়' নেই।

—ঐ অজয়ের কিনারেই যাব আমি— বলল সীমা— ওখানে আমার এক আত্মীয় আছেন—জায়গাটার নাম জানি না। প্রথম যাচ্ছি।

কত মিথ্যাই না বলতে হয়! কিন্তু এরকম মিথ্যা বর্ত্তমান যুগের যুগলক্ষণ। এ না-হোলে মানুষের চলবার উপায় নেই। সীমার মনে এর জন্য কিছু গ্লানি আসা সম্ভব নয়—এলোও না। বলল,

—আপনি কোথায় যাবেন ?

—চেঞ্জে। মাস-দুই থাকবো।

—ছেলে-মেয়ে ?

—নাই, ভাই !— স্বরে অকথিত কারুণ্য তাঁর— হয়নি, যায়ও নি। একেবারে ঝাড়া-হাত-পা রয়ে গেলাম !

কথাগুলো বলার সঙ্গে চোখের কোণা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো তাঁর। কী মর্ম্মন্তুদ দুঃখ যে তিনি পাচ্ছেন, তা ঐ 'ঝাড়া-হাত-পা' কথাটাতেই প্রকাশ। কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন যেন নিজের মনোবেদনাটা সামলাবার জন্যই। সীমা যথেষ্ট শিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী। সন্তানহীনা এই নারীর অগাধ বেদনার কথা অনুভব করলো সে। যে সন্তানকে সে বিসর্জ্জন দিতে চলেছে, সেই সন্তানের জন্য এই নারীর অন্তর্বেদনা দেখে ওরও যেন অন্তরের কোথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। কয়েক মিনিট চুপ করে রইল সীমা, তার পর বললো,

—দত্তক নেবার ইচ্ছে আছে আপনার ?

—না ভাই, নিজের যখন হোল না, তখন ওসব কেন আর! তা ছাড়া আমার ইচ্ছে থাকলেও আমার স্বামীর ওতে মত নেই।

তিনি বলেন,—নিজের রক্তে চোর-ছ্যাঁচোড় হলেও সহ্য হয়; পরের আপদ কাঁটার মত বুকে ফুটবে দিনরাত! ওতে দরকার নেই।

—আপনার যে-রকম সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখছি, তাতে দত্তক নিলে ভাল হোত। অবশ্যি এখনো আপনার ছেলে হোতে পারে।

—না, সে-সব আশা নেই। আমরা ওর জন্য অনেক কাণ্ড, যোগযাগ করেছি। দত্তক সম্বন্ধে তো আমার স্বামীর মত বললাম। কিন্তু কেন? আপনার সন্ধানে ভাল ছেলে কেউ আছে নাকি?

—হ্যাঁ—তা যোগাড় করে দিতে পারি আমি।— বলল সীমা।

ভদ্রমহিলা ছেলেটার সুন্দর মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে শেষে তাকে কোলে নিয়েই ওপাশের বেঞ্চে গেলেন উঠে।

এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ক্রমাগত গোল্ডফ্লেক সিগারেট টানছিলেন। স্ত্রীকে কাছে আসতে দেখে ধোঁয়ার ভেতর দিয়েই তাকালেন। বললেন,

—কি?

—শোনো— বলে মহিলাটি বসে পড়লেন ওঁর পাশে। তার পর দুজনে কিছুক্ষণ কথা হোল অতি আস্তে। ছেলেটাকেও দেখলেন ভদ্রলোক—কোলে নিলেন; বেশ হাসিমুখ তাঁর। বললেন,

—এটাকে যদি পাও তো, দেখ—

খোকাকে ওঁর কোলে রেখেই মহিলাটি ফিরে এলেন সীমার কাছে। আমতা-আমতা করে বললেন,

—তোমার খোকাকে বড্ড ভাল লাগছে, ভাই। ওইরকম একটি যদি পাই—

—ওকেই নিতে চান আপনি?— সীমা সকৌতুকে প্রশ্ন করলো।

—তা কি করে হবে? তুমি কি এ ছেলে দেবে আমায়?

—দেব। যদি ওকে আপনাদের পছন্দ হয় তো, নিন ওকে। যত্ন করে মানুষ করবেন। ও ভাল-লোকের ছেলে; মা-বাবা নেই, আমি ওকে শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—ও তাহলে তোমার ছেলে নয়?

—না। আমি কুমারী। ও যার ছেলে তাকে আমি জানতাম। ভাল বংশ। ওর বাবা একজন দেশবিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ওসব কথা থাক্। যদি আপনি ওকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন তো, নিন ওকে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো ওর 'মাসিমা' হয়ে। আপনার স্বামীকে বলুন।

উৎপলার লেখা চিঠিখানা হ্যাণ্ডব্যাগে রয়েছে। মুখ মুছবার জন্য রুমাল বের করতে গিয়ে একবার দেখলো সীমা। ভদ্রমহিলাটি ইতিমধ্যে স্বামীর কাছে গিয়ে বসেছেন। হয়তো সব বৃত্তান্ত বলছেন স্বামীকে। স্বামী কিন্তু অত সহজে রাজী হলেন না। তিনি নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করছেন। বলছেন যে, এভাবে গোপনে ছেলে নিলে শেষে হয়তো ছেলেচুরির দায়ে পড়তে হবে। হয়তো যাঁর ছেলে তিনি জানেনই না যে, সীমা তাকে বিক্রী করে দিল—ইত্যাদি নানা সন্দেহে দোদুল্যমান হয়ে ভদ্রলোকটি কী করবেন, ঠিক করতে পারছেন না। অবশেষে স্ত্রী ফিরে এসে সীমাকে স্বামীর সন্দেহের কথা বললেন। শুনে সীমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ; তারপর বলল,

—আপনাদের সন্দেহ হয় তো, থাক্,—তবে আমি আপনার দুঃখ দেখে প্রস্তাবটা করেছিলাম। ছেলেটা যে আমার নয়, এবং ওর কেউ নেই—তার প্রমাণ আমি এখুনি দিতে পারি।

—কি প্রমাণ?— মহিলা প্রশ্ন করলেন।

—আমার কাছে বাংলার দেশবিখ্যাত সমাজকর্মী উৎপলা দেবীর চিঠি আছে। ঐ ছেলেটিকে তিনি শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে

দেবার জন্য ওখানকার সেক্রেটারী অবন্তী দেবীকে অনুরোধ-পত্র দিয়েছেন ; এই দেখুন— বলে সীমা চিঠিখানা বের করে দিল।

নাম-ছাপা চিঠির কাগজ। উৎপলার নামও জানা মহিলাটির। চিঠিটা পড়ে স্বামীকে দেখালেন তিনি। এখন স্বামীর আর অমত্ নেই। তিনি রাজী হলেন।

গাড়ী বর্দ্ধমান পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সীমার সঙ্গে ওঁদের সব ঠিক হয়ে গেল কথা। সীমা উৎপলার চিঠিখানা ওঁদের দিল এবং তার পিঠে সহিও করে দিল। নিজে একখানা কাগজে ছেলেটিকে ওদের দেওয়ার কথাও লিখে দিল। অর্থাৎ অতি গোপনে ছেলেটি বিক্রী হয়ে গেল বিনামূল্যে। সীমা শুধু ওঁদের পশ্চিমের ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বর্দ্ধমানে নেমে পড়ল।

গাড়ী দাঁড়িয়ে। ছেলেটা জানালা দিয়ে হাত বাড়াচ্ছে সীমার দিকে। সীমা বলল,

—ঐ তোমার মা—যাও, ওঁর কোলে যাও···

—না··· ছেলেটা কেঁদে উঠলো অকস্মাৎ।

ওকে ভোলাবার জন্য, হয়তো-বা আরো বিশেষ কোন কারণে সীমা একঠোঙা সীতাভোগ-মিহিদানা কিনে দিতে যাচ্ছে খোকার হাতে— ভদ্রমহিলা যেন বিব্রত হয়ে বললেন,

—ওগুলো দিও না, ভাই। শুনছি বর্দ্ধমানে বড্ড বসন্ত লেগেছে··· না না—দিও না—

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সীমা প্ল্যাটফর্ম্মে। নিজেকে সামলে বলল,

—না দিদি, ঐ-তো কত লোক খাচ্চে, দেখুন···

—তা থাক। ওসব বাজারের মিষ্টি আমি ওকে খেতে দেব না। এস খোকন, কমলা খাও—

বলে ছেলেটাকে টেনে নিলেন জানালা থেকে। গাড়ী ছেড়ে দিল। সীতাভোগের ঠোঙাটা ফেলে দিলেই সীমার 'ঝাড়া-হাত-পা'—তার পর

পরবর্ত্তী ট্রেনে কলকাতা গিয়ে নিশ্চিন্তে ওর কুমারী-জীবন যাপন করতে পারবে। লোক্যাল ট্রেনও ঐ ওপাশের প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে। একখানা টিকিট কিনতে যা দেরী! টাকাগুলোও খরচ হোল না সীমার।

কিন্তু হাতের ঠোঙাটা! ওটা সে ফেলবে কোথায়? কি করে ফেলবে? ঝাড়া-হাত-পা হতে গিয়ে একঠোঙা খাবারেই কি আট্‌কে গেল সীমা!

গাড়ী-চলে-যাওয়া খালি প্ল্যাটফর্ম্মের জনবিরল পাথরে দাঁড়িয়ে সীমা যেন পাথরের মূর্ত্তির মত স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। ছেলেটার অসহায়-করুণ মুখখানা ওর বুকে কেটে-কেটে বসছে যেন। কোথায় ঝাড়া-হাত-পা সীমার! শালপাতার ঠোঙায় যে ওর চিরবন্দিত্ব ঘটলো! বিক্রীত বস্তুর উপর আর কোনো স্বত্ব নেই, তাই সীমা ছেলেটাকে মিষ্টিটা দিতে পেল না—বিদায়ে শেষ মিষ্টান্ন!

অকস্মাৎ রেললাইনের উপর ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সীমা—কয়েকটা চিল তৎক্ষণাৎ পড়লো খাবারের উপরে। কিন্তু সীমা দেখতে পাচ্ছে না—ওর চোখের জল হু হু করে নামছে এখন। বহুদূরে-চলে-যাওয়া গাড়ীটাও দেখতে পাবে না আর—সীমা এখন ঝাড়া-হাত-পা!! হ্যাঁ, কুমারী সীমার জীবনে আর কোনো গ্লানি নেই!···

ওপাশের লোক্যালটা ছেড়ে চলে গেল—সীমা তখনো দাঁড়িয়ে!

অনাবৃষ্টির উৎপাত চলেছে বাংলা-বিহারে। খাল-বিল সুধু নয়, নদী-নালা কূপ-পুষ্করিণী সব শুষ্ক। জলের অভাবে মানুষ ছটফট করছে; তার সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে মহামারী। বাংলায় এই অবস্থা যেন আরো শোচনীয়ভাবে প্রকট। হিমালয়ের যোগাশ্রমে থেকে খবর পেল সিধু। ↲

প্রায় চার-পাঁচ মাস হোল সে অবন্তীর আশ্রম ঘুরে এসেছে। অবন্তী ভালই আছে, দেখে এসেছে সিদ্ধেশ্বর। ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েই সে তাব বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে, এই কথাই অবন্তী জানিয়েছে সিদ্ধেশ্বরকে। কিন্তু ওখানে যে বালকটিকে সিধু দেখে এসেছে, তার কথা ক্রমাগত মনে পডছে। সর্ব্বস্ব-রিক্ত সন্ন্যাসী সে, তবু ঐ বালকের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন অনুভব করে সিধু। সেই ছেলেটিকে একবার দেখতে গেলে হয় না! সিধুব চিন্তাটা ক্রমশঃ বাডতে বাডতে এমন অবস্থায় এল যে, বাংলায় না গিয়ে যেন উপায় নেই।

গুরু কর্ণবিজয় আশ্রমের সব ভার সিধুব উপর ছেডে দিয়ে দূব হিমালয়ে পরিব্রজনে বেব হয়েছেন। কবে ফিরবেন, অথবা একেবারেই ফিরবেন কিনা, জানা নেই। এ আশ্রমে আর যে দু'তিনজন সাধক আছেন, তাঁদের মতি-গতি ভাল দেখছে না সিধু। আশ্রম বলতে ছোট কয়েকটা কুঠিয়া—আর ভিক্ষান্ন; এর জন্য মোহ কিছুই নেই; সিধুর এখানে সময় কাটাতে ভাল লাগছে না।

অপর একজন গুরুভ্রাতার উপর আশ্রমের ভাব দিয়ে সিধু বেরিয়ে পডলো—কলকাতা যাবার ট্রেন ধরলো এসে। মেলগাড়ী দ্রুত চলেছে। ভোব হোল একটা বড ষ্টেশনে। সিধু জানালা দিয়ে একখানা বাংলা খববেব কাগজ কিনে পডতে লাগল।

পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা…কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি ··অন্নবস্ত্র-আবাসের প্রাচুর্য্য, তার সঙ্গে বেকার-সমস্যা, ক্ষুধাব অন্ন যোগাতে না পারায় পত্নী-পুত্রকে হত্যা করে নিজের আত্মহত্যা · অর্থাভাবে কন্যা-বিক্রয়… চুরি-ডাকাতির অসংখ্য ইতিহাস…মানুষের ভয়াবহ পাশবিকত্বের প্রাচুর্য্য; ঠিক তাবপরই জলনিমজ্জিতকে রক্ষা করবার জন্য জীবন দান… অগ্নি-নির্ব্বাণের জন্য আত্মবলি—বিচিত্র-বিস্ময়কর। বহুদিন খবরের

কাগজের খবর রাখেনি সিধু। ওর উপর সিধুর আগ্রহ কম। কিন্তু আজ একদিনের কাগজেই এতো বেশী বৈচিত্র্যময় সংবাদ ওকে যেন বিস্ময়মুগ্ধ করে দিল। ভাবতে লাগলো—মানুষের জগতে অমানুষ এবং অতি-মানুষের লীলা যেন গ্রথিত হয়ে রয়েছে এই কাজগখানার প্রতি কলমে। জীবন কী বিচিত্র! ততোধিক বিচিত্র মানুষের জীবন-লীলা,—জীবন-সম্ভোগ।

কিন্তু ঐ কাগজেই আর একটা খবর পাঠ করলো সিধু। দেশের এক সর্ব্বজন-পরিচিত পরম শ্রদ্ধাভাজন দেশনেতা সাধু সম্বন্ধে সকলকে, বিশেষ করে, নারীদিগকে সাবধান করেছেন এক মহতী জনসভায়। তিনি বলেছেন—ভারতে কমপক্ষে আশী লক্ষ সাধু আছে। তারা অপরের আয়ের উপর বাস করে—ভাল খায়, ভাল থাকে, অথচ কোনো কাজ করে না। মানুষের ধর্ম্মনিষ্ঠার দুর্ব্বলতাই তাদের প্রতিপালন করছে।

আশী লক্ষ! সিধু সংখ্যাটা নিজের মনে আবৃত্তি করলো। হাঁ, সাধুবেশী আশীলক্ষ লোক থাকা অসম্ভব নয় এদেশে।

কিন্তু সাধু কোথায়! সাধু কয়জন? অসাধুতা ঢাকবার ছদ্মবেশই তো বেশী দেখা যায়। সিধু এই বার-চোদ্দ বছর ধরে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে ওরও বিশ্বাস, সাধুবেশী অসাধুর সংখ্যাই অধিক। দেশনেতা সকলকে সাবধান করেছেন সাধু সম্বন্ধে—ঠিকই করেছেন।

সিধু কাগজখানা উল্টে বিচারালয়ের ব্যাপারগুলো পাঠ করতে আরম্ভ করলো—সাধুর আশ্রম নিয়ে মামলা···সাধুর ছদ্মবেশে লোভী ব্যক্তির নিষিদ্ধ বস্তুর কারবার···সাধুবেশী প্রতারক—উঃ! এই সাধুত্ব!

নিজের গৈরিক বাস আর কাঠের কমণ্ডলুটার পানে তাকালো সিধু। ঝোলায় শালগ্রাম, গলায় মালার গোছা, কপালে তিলকফোঁটা। সিধুর মনে হোল, গাড়ীশুদ্ধ লোক যেন তার পানে সন্দেহের দৃষ্টিতে

তাকাচ্ছে। তার সাধুবেশ যেন অসাধুত্বের দ্যোতনা করছে ওদের সকলের অন্তরে। অকস্মাৎ সিধু কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

কিন্তু ওরা কেন তাকে সন্দেহ করবে? সিধু তো সত্যি কোনো অসাধুর কাজ করেনি। টিকিট কিনেই তো সে গাড়ীতে উঠেছে এবং এপর্যান্ত কারো সঙ্গে কথাই বলেনি। তবু সিধুর মনে হচ্ছে, ওরা যেন সবাই সন্দেহ করছে সিধুকে।

—আশ্‌রম্‌ কাঁহা, সাধুজী— জনৈক যাত্রী প্রশ্ন করলো চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে।

—হরদ্বোয়ার··· সিধু জবাব দিয়েই মুখ ডোবালো খবরের কাগজে।

—আপ্‌ বাঙালী হ্যায়?—বাংলা কাগজ পড়ছেন যে?

—হ্যাঁ— অন্য এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলল সিধু।

—কাঁহা যাতা?—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?— আবার প্রশ্ন হোল।

—কলকাত্তা।

—শিষ্য আছে ওখানে?

—না, আমি শিষ্য করবার যোগ্যতা পাইনি এখনো। কলকাতায় দরকার আছে কিছু।— জবাব দিয়েই সিধু উঠে বাথরুমে ঢুকলো গিয়ে।

ওর ঝোলা-কম্বলের পানে সকলেই তাকাচ্ছে। ওর চেহারাখানা এখন সত্যি সাধুর মত। চুল-দাড়ি, গায়ের বর্ণ এবং দেহের জ্যোতি দেখে ওকে মিথ্যে সাধু মনে কববার কারণ নেই—গাড়ীর লোকগুলো যেন ভাবছে। সিধু বেরিয়ে এল পাঁচমিনিট পরে। কম্বলের আসনখানা কোণার দিকে পাতা। তার ওপর আসন করে বসে ও এবার চোখ বুজ্‌বে। কিন্তু গাড়ীর লোকেরা অত সহজে ওকে নিষ্কৃতি দেবে না। একজন হাত বাড়িয়ে বলল,

—দেখুন তো, প্রভু, আর কতদিন ভুগতে হবে?

—হামি ওসব জানে না— সিধু বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে জবাব দিল।

—ঈশ্বর কি সত্যি আছেন? তাঁকে পাওয়া যায়?— প্রশ্ন করলো অন্যজন।

—যিনি পেয়েছেন, তিনি বলতে পারেন, বাবা! আমি এখনো পাইনি।

—কি আনন্দে আপনি ঘুরছেন তাহলে? পবেব মাথায় হাত বুলিয়ে রাবড়ী খাবার জন্য, কেমন?— কথাটা বললো এক তরুণ বাঙালী। বাঙ্কের উপবে সারারাত শুয়ে কাটিয়েছে, এখন ঘুম ভাঙাব পর ও শুয়ে-শুয়েই প্রশ্নটা কবলো সিধুকে। সিধু ওব পানে চেয়ে বলল ধীরে,

—পরের মাথায় হাত বুলোবার সুযোগ আপনাবা দেন কেন, বাবা? এই তো আপনাদের দেশনেতা উপদেশ দিয়েছেন, সাধু-সম্বন্ধে সাবধান হবেন—

—আমরা সাবধান আছি। গেরুয়া দেখলেই বুঝি, সে একটি চোর।

—অতটা ভাল নয়, বাবা! আপনি জানেন না, এমন জিনিষও থাকতে পারে।

—তাই নাকি!— বিদ্রূপ করে উঠে বসলো ছোকরা; বলল,

—তাহলে আপনি সত্যি সাধু! বেশ, বলুন তো মানুষ মরলে কোথায় যায়?

—মরেই সেটা জানতে হবে, বাবাজী—কারো মুখের কথায় বিশ্বাস হবে না।

গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই বাঙালী। সিধুর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলো। কিন্তু বাঙ্কের ছোকরা নেমে এসে সিধুর মুখোমুখী বসে বলল,

—আপনাদের যোগশাস্ত্র কি বলে?

—শাস্ত্র বহু এবং বিচিত্র, বাবাজী! সে-সব আপনিও পড়ে নিতে পারেন। আমার ও-বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। শাস্ত্র আর শস্ত্র আমি এড়িয়ে চলি।

—তাহলে আপনার অবলম্বন কি শুধু বস্ত্র, এই গেরুয়া বস্ত্র?—বিদ্রূপ করে হাসলো সে।

—হাঁ বাবা, আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে এখনো পুরোদস্তুর গেরুয়া নিতে পারিনি। ত্যাগ-বৈরাগ্য এখনো অভ্যাস হয়নি। এখনো লোকালয়ে আসতে হয়, আপনাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়।

—প্রণামীও নিতে হয় আশ্রম চালাবার জন্য— কঠোর বিদ্রূপ করলো ছোকরা।

—হ্যাঁ, জীবন রক্ষার জন্য ভিক্ষা করতে হয় বৈকি। তবে আমি মানুষের কাছেই ভিক্ষা চাই···

—শেয়াল-কুকুরের কাছে ভিক্ষা চাওয়া যায় নাকি?

—হ্যাঁ, চাওয়া যায়—পাওয়া যায়। যাঁরা খবরের কাগজে আগে দানের খবর পাঠিয়ে দান করেন, যাঁরা দানটাকে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট মনে করেন—যাঁরা দান করে ভাবেন, তিনি না দিলে ভিখারীর আর গতি ছিল না, ভেবে দেখবেন—'তাঁরা' কি!

যুবকটির বিদ্রূপবাক্যে অনেকেই তার উপর বিরক্ত হচ্ছিলেন। অনর্থক একজন সাধুর সঙ্গে এরকম কলহের কি দরকার! বিশেষতঃ সিধুর মিষ্ট বাক্য আর বলার সুন্দর ভঙ্গী ভাল লাগছিল অনেকের। কিন্তু যুবকটি বলল,

—আপনি তাহলে ওরকম কারো কাছে দান গ্রহণ করেন না?

—না। আমার প্রয়োজন অত্যন্ত সামান্য, আকাশবৃত্তিতেই তা চলে যায়। আর, কোনো খবরের কাগজে নাম ছাপার মত সাধুও নই আমি—

—আপনি তাহলে নিজেকে দীনাতিদীন মনে করেন?

—না, দীনতার ভান আমি করিনে। সোনার থালায় অন্ন না হলে রুচি হয় না, অথচ শিষ্যদের উপদেশ দেন 'তৃণাদপি সুনীচ' হতে,

এরকম দীন আমি নই। বিশ্বরাজের রাজত্বে তাঁর নাম নিয়ে পড়ে আছি—এপর্য্যন্ত কোনো অভাব আমার হয়নি, এবং আশা করি হবে না। কারণ জীবনধারণের জন্য আমার স্বল্পই প্রয়োজন; আর, সেটুকু তিনিই সংগ্রহ করে দেন···

—সাধারণ মানুষের দান-প্রবৃত্তিকে ভাঙিয়ে তো ?

—দান-প্রবৃত্তি যাঁর আছে, তিনি দান করে আনন্দ পান বলে করেন। ভাঙিয়ে খাবার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু, আপনার সঙ্গে অনর্থক আর কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে নেই। অনুগ্রহ করে মাফ করবেন।

সিধু পদ্মাসন করে বসে শ্বাস টানলো—হয়তো প্রাণায়াম করবে। সবাই দেখতে লাগলো ওকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীর বেঞ্চিতে সিধু স্থির হয়ে গেল। যেন জড় মূর্ত্তি। ওর শ্মশ্রু-কেশমণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল যেন জ্যোতির্ম্ময় মনে হচ্ছে। সবাই বলল,

—সত্যি কিছু আছে এঁর মধ্যে!

দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা সিধু নিশ্চল, যেন পাথরের মূর্ত্তি। সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা প্রসন্ন জ্যোতি; গায়ের লোমগুলি পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে রয়েছে! সমাধিস্থ সিধু। গাড়ী চলছে, থামছে; আবার চলছে। গরমের দিনের বেলা অনেক হোল। প্রায় সকলেই কলকাতার যাত্রী—সবাই যে-যার খাবার ব্যবস্থা করছে। সিধু ঠিক একভাবে বসে। সেই যুবকটি এতক্ষণ পরে বলল,

—মনে হচ্ছে, ইনি সত্যি যোগী। আপনারা অনুমতি করেন তো পরীক্ষা করি।

—কি পরীক্ষা?— প্রশ্ন করলো কয়েকজন।

—সিগারেটের আগুন ফেলে দেব ওর গায়ে—

—না না, ওরকম করবেন না— বলতে বলতে কিন্তু সেই যুবকটি হাতের জ্বলন্ত সিগারেট সিধুর জানুতে চেপে ধরলো। সিধু

নির্ব্বিকার। প্রায় আধমিনিট সিগারেটটি ধরে থাকার পর তুলে নিল যুবক। পরবর্ত্তী একমিনিটে মস্ত একটা ফোস্কা হয়ে গেল ওখানে। সিধু তখনো একভাবে বসে। সবাই যুবককে তিরস্কার করছে, কিন্তু যুবকটি কারুকে কিছু বললো না, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

আরো প্রায় একঘণ্টা পরে সিধুর সমাধি ভাঙলো। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইল সিধু কিছুক্ষণ, তারপর জানুর উপর ফোস্কাটা দেখে হাসলো একটু আপন-মনে। একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়ালো ; সিধু নেমে জলকলে গিয়ে জল নিয়ে এল কাঠের কমণ্ডলুতে। বসল আসনে।

—এই ছোকরা আপনার গায়ে আগুন চেপে ধরেছে— বলল এক ক্রুদ্ধ যাত্রী।

—নারায়ণ ওঁকে আশীর্ব্বাদ করুন— বলে সিধু হাসলো আবার।

—আমি ইচ্ছে করে আগুন চেপে ধরেছি আপনার গায়ে— যুবকটি বলল।

—বেশ করেছেন, বাবা! আমার শরীর আপনাকে কিছু আনন্দ দিতে পেরেছে, নারায়ণ আমাকে এই সৌভাগ্য আজ দিলেন!

—কিন্তু এ আনন্দ পৈশাচিক, সাধুজী!— যুবকের কণ্ঠে অনুতাপের অশ্রু-মালিন্য।

—হোলই বা। নারায়ণ ওকে একদিন দৈবী আনন্দে পরিণত করবেন!

গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই সকলেই শুনতে পেল এই কথোপকথন। বিস্মিত যুবকটি বিহ্বল হয়ে বলল,

—আমাকে অভিশাপ দেবেন না আপনি ?

—শাপ বা বর দেবার আমি তো কর্তা নই, বাবা! যিনি কর্তা তাঁর কাছে প্রার্থনা করি—আমার নশ্বর শরীরের সামান্য অংশ পুড়িয়ে আপনার বিশ্বাস আসুক তাঁর অস্তিত্বে—তাঁর অপার করুণায়! ··

সিধু ঝোলা থেকে একমুঠি ছোলা বের করে রাখলো একটা তামার বাটিতে। কমণ্ডলুর জল দিয়ে ধুয়ে নিবেদন করছে ভগবানকে।

—আমি কিছু খাবার কিনে দিলে আপনি খাবেন, সাধুজি? কলা, আম বা অন্য ফল?— যুবকটি প্রশ্ন করলো।

—না বাবা! আমার ওসব কিছু দরকার নেই। এই চানা-ই আমি প্রসাদ পাব। আপনারা আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করুন—

—আমার মত পাষণ্ডের কাছে আপনি কিছু নেবেন না, না সাধুজী?

—ওকি কথা, বাবা! আপনি পাষণ্ড কেন হবেন? আর, আমার ও-সব বিচারের তো অধিকার নেই। তাঁর রাজ্যে ষণ্ড আছে, পাষণ্ড আছে—চোর আছে, সাধুও আছে—রাজা আছে, ভিখারী আছে। আমার সে বিচারে কি কাজ? তাঁর প্রয়োজনে তিনি ও-সব করেছেন। আচ্ছা বাবা, এবার আমি পূজা করি—

সিধু পূজা করতে লাগলো আপন-মনে তার ঝোলার শালগ্রামের। গাড়ী আবার চলছে।···নিবেদিত ছোলা চিবিয়ে জল খেল সিধু। তার পর বসে আছে। গাড়ীর সবাই দেখছে ওকে। কিন্তু কেউ এখন কথা বলছে না। বাংলার সীমায় এল ট্রেন। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই একটি স্নিগ্ধবর্ণা পূর্ণবয়স্কা যুবতী গাড়ীতে উঠেই ওকে দেখে ছুটে এল,

—সিধুদা— প্রণাম করলো মেয়েটি।

—হ্যাঁ। তুমি কোত্থেকে নির্মলা?

—এই, রামপুরিয়া থেকে। ওখানেই ছিলাম···কলকাতা যাচ্ছি।

কালবৈশাখীর রুদ্রলীলা যেন ঋতু-পরিবর্ত্তন করছে; বৈশাখ শেষ হোল, জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধেক—একফোঁটা বৃষ্টি নেই। অসহ্য গরমে মানুষ অতিষ্ঠ। টেম্পারেচার পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করছে তাপমাত্রার। অন্ন-বস্ত্র-আবাসের সঙ্গে অসহনীয় জলকষ্টে জীবজগৎ উৎপীড়িত। মহারুদ্রের বিশ্বধ্বংসী শূল উদ্যত হয়েছে যেন!

হ্যাঁ, অন্ন-বস্ত্রের অজানা আতঙ্কে বিশ্ববাসী ত্রাহি-ত্রাহি রব করছে—এদিকে শান্তির বাণী নিয়ে ভারতের জননেতা বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন! কিন্তু অণুশক্তির ধ্বংসমুখী শক্তি-পরীক্ষার বিরাম নেই। কে জানে, জগতের কারণ-সমুদ্রে কী বিপ্লব সৃজন করছে এই পরীক্ষা-প্রয়াস, এই অমানবোচিত শক্তি-লিপ্সা!— আলোক প্রুফ-দেখা শেষ করে ভাবছিল কথাগুলো।

বেলা দুপুরের দাবদাহী রৌদ্রের পানে তাকানো যায় না—ফ্যানের হাওয়া উত্তাপে অস্বস্তিকর। খসখসের জলভেজা অঙ্গ উষ্ণ হতে হতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, বরফের ঠাণ্ডা বিরক্তিকর বোধ হয়—এ কি অবস্থা! ষাটবছরের বৃদ্ধগণ বলছেন—এমন গরম কখনো দেখেন নি। এ যেন পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বাভাস, অথবা অসাধারণ কিছু একটা বিবর্ত্তনের আগমনী সংকেত! কী এটা, কেউ বুঝতে পারছে না।

মানুষ চলেছে ধ্বংসের পথে, নাকি নবসৃষ্টির প্রেরণায়? কে জানে, একদিন অতি অকস্মাৎ এই দৃশ্যমান জীবজগৎ নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, অথবা এই সৃষ্টিতেই নবজীবন-ভ্রূণ নতুন কোনো রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে কিনা! পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এমন ধ্বংস আর সৃষ্টি অনেকবার হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু এ-সব ভাববার কি দরকার? যা হবার, হবে।

আলোক প্রুফগুলো গুটিয়ে ম্যানেজারের হাতে দিল। এবার ফিরবে। কিন্তু বাইরের নিদারুণ রৌদ্র ওকে নিরস্ত করছে।

—এখন যাবেন না, বাইরে বেরুনো যাচ্ছে না— বললেন ম্যানেজার।

—বহু লোকই তো বেরিয়েছে। দেখি, কেমন গরম— বলে আলোকনাথ বেরিয়ে পড়ল পথে। বিরল-ট্রাম বড় রাস্তা, বাসও দীর্ঘক্ষণ পরে পরে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে এসময় কেউ ঘরের বার হয় না। কিন্তু এ সহরে নিতান্ত প্রয়োজনওয়ালা মানুষ অত্যধিক। অন্নচিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটছে এরা দিগ্‌বিদিকে। তাই এই অগ্নিময় পথেও মানুষের ভিড় চলেছে। আলোক বাইরে বেরিয়ে দেখলো— পথে অপেক্ষাকৃত কম লোক চললেও, যথেষ্ট মানুষ রয়েছে—রয়েছে ফেরিওয়ালা, ফল-সরবৎ বিক্রেতা, আর রয়েছে ভিখারী-ভিখারিণী, আশ্রয়হীন শিশু, অসহায় বিকলাঙ্গ মানুষ!

মানব-জীবনের এক করুণতম রূপ যেন প্রকটিত হয়ে উঠেছে এই রৌদ্রতপ্ত রাস্তার দু'পাশে। দোকানের টাঙানো মাংসের চিমসে গন্ধের সঙ্গে ডাষ্টবীনের দুর্গন্ধ মিলে মানবলোককে নরকলোকে পরিণত করেছে! এ দৃশ্য দেখবার মত; দেখলে জীবনদর্শন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মোড়ের মাথায় ছায়াশীতল একটা বড় গাছের তলায় ছেঁড়া চ্যাটাই বিছিয়ে তাস খেলছে জন চার পাঁচ ছোকরা। ওরই কাছে রাস্তার উপর পুরোনো-নতুন বই বিক্রীর আশায় বসে আছে একজন—দু'আনা-চার আনার বই 'লক্ষ্মীর পাঁচালী', 'শতনাম' ইত্যাদির সঙ্গে 'কামসূত্র'ও আছে তার মধ্যে। দুটো সরবতের দোকান পাশাপাশি—বরফজল-মেশানো ঘোল, পানখিলি—আবার গরম চা-ও রয়েছে একটা পিতলের কলসীতে। বিক্রীও হচ্ছে সব রকম।

বিচিত্র এই জায়গাটি—এই বৃক্ষতল। লোম-ওঠা কুকুর, ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া, মালিকহীন গরু জল খাচ্ছে একটা সরকারী জলাধারে।

ওদিকে এঁটো ঠোঙা কুড়িয়ে চাটছে দুটো উলঙ্গ বালক। জীবনের রুদ্র যেন এখানে মূর্ত্তিমান—এখানে সৃষ্টির সৌম্য শান্ত সুবাস নেই, আছে বীভৎস পূতিগন্ধ! কিন্তু এও জীবন। একে অস্বীকার করা চলে না।

ট্রাম আসবার অপেক্ষায় আলোক দাঁড়ালো ওখানে। অকস্মাৎ তাস-খেলার দলের একটা লোক তাসগুলো ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ওকে প্রণাম করলো—

—গোড় লাগি দাদাবাবু! ভালো আসেন?

—হ্যাঁ, কিশোর। কোথায় আছ তুমি?— আলোক প্রশ্ন করলো।

—হামি তো থাকে, যাঁহা রাত হোয়, হুঁয়াই—চোর-গুণ্ডা-বদমাস্‌কো সাথ, আউর সাধু-সন্ত-ভগবানজীকো পাশ! আপ্‌ কাঁহা হ্যায়, দাদাবাবু?

—শ্যামবাজারে। তুমি এখন কি করছো কিশোর?

—ওহি সিনেমা-পোষ্টার লাগাতে হেঁ।— কিশোর দেখালো দেওয়ালের পোষ্টারটা।

"ক্ষণ-স্বাক্ষর—আগামী শুক্রবার শুভমুক্তি"—পড়লো আলোক। বলল,

—ওতে বেশ রোজগার হয় তোমার?

—হ্যাঁ, চলা যাতা হ্যায়, দাদাবাবু; উ কাম হরবখৎ মিল্‌তা—আউর কাম বনা দিয়া তো ছুট্টি! পয়সা ভি হ্যায়, আরাম ভি হ্যায়—

—তাহলে ভালই আছ। বেশ— বলে আলোক ট্রামে উঠবার জন্য অগ্রসার হচ্ছে।

—একঠো বাৎ হ্যায়, দাদাবাবু!— আলোককে আট্‌কালো কিশোর।

—বল— দাঁড়িয়ে গেল আলোক। ট্রামটা সবেগে চলে গেল।

—সেই অপুর্ণা-দিদি ছিল না?— হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে কিশোর বলে চললো— একরোজ অপুর্ণা-দিদিকো সাথ হামার দেখা হইছিল।

হামি তাকে এক ড্রাইভারের ঘরমে চাকরী করতে দিয়েছিল। উ অপুর্ণা-দিদি সেই বাবুকো সাথ পশ্‌চিম চলিয়ে গেল। বেশ রাণীকো মাফিক সাজ করে দেশ ছোড়কে ভাগ্‌লো অপুর্ণা-দিদি—

—তা ভালই তো— আলোক হাসলো কথাটা শুনে।

—হুঁ, ভাল—লেকিন বাত হচ্ছে, উসকো সেই লেড়কাঠো কাঁহা আছে, দাদাবাবু?

—তাকে নিয়ে কি করবে তুমি?

—হারামজাদী লেডকাঠো ছোড দিয়ে গেল, বাবুজী!

—যাক্‌গে, ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? নিজের কাজ কব।

আলোক চলে যাচ্ছে; কিন্তু ট্রাম আসবার দেরী আছে। কিশোর বলল,

—ঠিক—ঠিক, দাদাবাবু, দুনিযা খোদাকো খেল! —আপ্‌কো ঠিকানা দিয়ে যান, দাদাবাবু।

আলোক ঠিকানা দিল ওকে।

ট্রামে উঠে কিন্তু আলোক ভাবতে লাগলো অপর্ণার কথা। অপর্ণার ছেলে নয় জীবন, এ সত্য আলোক ভালই জানে। কিন্তু অপর্ণা শেষে দেশ ছেড়ে চলে গেল! যাক্‌, ভাল থাকলেই ভাল। কিন্তু অপর্ণার জীবনের শেষ পরিণতি জানবার জন্য ওর চিরপিপাসু অন্তর উন্মুখ হয়ে উঠলো। কী অদ্ভুত এই অপর্ণার জীবনেতিহাস! কত বিচিত্র ঘটনার আবর্ত্তে সে চলেছে তার জীবন-তরণী বেয়ে! ও-ই একাই একটা মহাকাব্য হয়তো, হয়তো তারও বড়। ও নিজেই একটা জীবন-দর্শন! যদি আবার কখনো দেখা হয় অপর্ণার সঙ্গে, তো আলোক ভালো করে জেনে নেবে তার কথা—তার মর্ম্মের ইতিহাস।

কিন্তু কি হবে জেনে? প্রতিটি জীবনেই রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা। এমন বৈচিত্র্য না থাক্‌, বিস্ময় তাতে কিছু কম নেই। জীবনের

রুদ্র কালের স্রোতে এক মহান পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছেন—তিনি মহারুদ্র। তাঁর আদিতে শিব, অন্তে শব। তিনি শিবরূপে মঙ্গলময় আনন্দ, আবার শবরূপে নির্ব্বিকার ব্রহ্ম। জীবনে এই সত্য-উপলব্ধিই সাধনার শেষ কথা।

ট্রাম শ্যামবাজারের মোড়ে আসতেই নেমে পড়লো আলোক। আজ ওর একটা নিমন্ত্রণ আছে চা-পার্টিতে। নিমন্ত্রণ দীর্ঘদিন ও গ্রহণ করেনি, কিন্তু এটা অগ্রাহ্য করা গেল না। সেই-যে প্রেসে দেখা হয়েছিল করবী দেবীর সঙ্গে, তারপর থেকে নানা ছলছুতায় করবী ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে, আলোচনা ক'রে বন্ধুত্ব জমিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েছে এ বিষয়ে, অন্ততঃ করবী তাই মনে করে। একদিন 'যুগনারী' সম্পাদিকা দীপ্তি দেবীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছে আলোকের। একটা ছোট্ট প্রবন্ধও আলোক লিখেছিল 'যুগনারী'তে। এইসব নানা সূত্র ধরে আজ 'যুগনারী'র পঞ্চবার্ষিক জন্মদিনে, চায়ের আসরে আলোকের নিমন্ত্রণ। 'যুগনারী' অবশ্য বৈশাখে জন্মেছিল। কিন্তু জন্মোৎসবটা একটু দেরী করে হচ্ছে, কারণ দীপ্তি দেবী সহরের বাইরে গিয়েছিলেন।

আলোক ওখানে যাবে, নাকি ফোন করে যাবার অক্ষমতা জানাবে, ভাবছিল। অঞ্জনা এসে ধুতি-পাঞ্জাবী দিয়ে বলল,

—যেতে হবে, নইলে আমি যাব কার সঙ্গে?

—তুই আমায় এ-সবের মধ্যে কেন টানছিস, অঞ্জু! তোর দাদা বিয়ে করবে না। বৃথা চেষ্টা করিস নে— বলল আলোক।

—বিয়ে না করলে কি চা খেতে যেতে নেই?

—চা-খাওয়াবার অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছাটা তোর অজানা নয়, এমন কি ওতে তোরও চক্রান্ত মেশানো আছে, সন্দেহ করি।

—বেশ, আছে আমারো চক্রান্ত মেশানো। কোনো বোন তার দাদাকে সন্ন্যাসী হতে দিতে চায় না। চলো, কাপড় পর শিগগির—

—সন্ন্যাসী আমি কখনো হব না, অঞ্জু! তবে বিয়েও আমি করবো না। আমি বেরিয়ে পড়বো দেশে দেশে—দেখে বেড়াবো জীবনের শিব, জীবনের শব—জীবনাতীতের সম্ভাবনা!

—বেশ, তা-ই করবে। আপাততঃ ওঠো।

আলোক আর কথা বাড়ালো না; উঠে বেশ বদল করলো। তারপর ট্যাক্সি করে দীপ্তি দেবীর বাড়ী গেল অঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে।

'লনে' আসন পাতা হয়েছে। করবী, সীমা, দীপ্তি দেবী এবং আরো তিন-চারটি তরুণী বসে। পুরুষ কেউ নেই আলোক ছাড়া।

সকলেই বসেছে, হঠাৎ গেটে গাড়ী দাঁড়ালো; নামলো উৎপলা, বিকাশ, মিঃ সাহা আর বরুণ নামক জনৈক যুবক—সুন্দর চেহারা, সোনার বোতামের উপর হীরাগুলো ঝকমক করছে। উৎপলা আকস্মিক-ভাবে আলোককে দেখে শুধু তাকিয়ে রইল। বিকাশ প্রসন্ন হেসে বলল,

—আলোক, তুই এখানে! এতোকাল পরে?

—কাল অখণ্ড, বিকাশ! ওর পরিমাপ নেই। মরজগতে দেখা না হলে, অমর জগতেও দেখা হতে পারে— হাসলো আলোক কথাটা বলে।

—অবশ্য। তবে সৌভাগ্য যে আমরা সবাই মরজগতেই আছি—কেমন?

—ঠিক বলা যায় না। কে জানে, অ্যাটোম বোম্‌এ আমাদের স্থূল দেহের ধ্বংস হওয়ার পর সূক্ষ্মদেহে এই চায়ের আসর বসিয়েছি কিনা!

সবাই হেসে উঠলো কথাটা শুনে। কিন্তু আলোক না হেসে বলল,

—পৃথিবীর সব মানুষগুলো একসঙ্গে একসেকেণ্ডে যদি স্থূলদেহ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের ক্রিয়াশীলতা হয়তো সূক্ষ্মদেহেও ঠিক

তেমনি থাকবে। এই আমরা সব—এই চায়ের আসর, এই কথাবার্তা, প্রেম-মান-অভিমান—

—এর কোনো প্রমাণ আছে, আলোক?

—প্রমাণ সিনেমার ছবি। অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাজসজ্জা সব ধ্বংস পেলেও ফিতেটা আলোতে ফেললেই সব জীবন্ত দেখা যায়।

—যা বলেছেন— মিঃ সাহা কথা বললেন এবার— আমার প্রথম ছবির অনেকেই দেহ রাখলেন, কিন্তু তাঁরা আজো চিত্রগৃহে আনন্দ দিচ্ছেন মানুষকে। কিন্তু আমাদেরকে কেউ এমনি করে ফিল্মএ তুলে রাখছেন নাকি?—সবাই হাসছে কথা শুনে!

—রাখছেন হয়তো। মহাকালের ষ্টুডিওতে কে জানে কোন্ ডিরেক্টার কোন্ ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে ফটো তুলে রাখছেন আমাদের—হয়তো অমরজগতে সেটা আমরা নিজেরাই দেখে খুসী হব, কিম্বা অশ্রু বিসর্জ্জন করবো— আলোক বলল।

বরুণের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন দীপ্তি দেবী। ধনীর পুত্র। বিলাত ঘুরে এসেছেন সম্প্রতি। কিছু লেখার অভ্যাস আছে, —এই যুগনারীতে বেরিয়েছে দু'একটা। করবীর দিকে কিঞ্চিত আগ্রহ বেশী। করবী-ই নিমন্ত্রণ করিয়েছে ওকে এখানে।

আলোক নমস্কার জানিয়ে বলল,

—নতুন কি লিখছেন?

—মিঃ সাহার সিনেমার জন্য একটা গল্প লিখছি চিত্রলিপির রূপে। আপনাদের কোষগ্রন্থ শেষ হোল?

—হ্যাঁ, ছাপাও প্রায় হয়ে এল শেষ। এবার একবার ছুটি নিতে হবে।

—ছুটি? কোথায় যাবেন?

—নিজের ভেতর। অনেকদিন ওখান ছেড়ে বিদেশে এসে রয়েছি!

—মানে—আত্মানুসন্ধান? সেল্‌ফ্‌ রিয়েলিজেশুন।

—কতকটা...

—'সোঽহং' হয়ে উঠবেন নাকি?— করবী অকস্মাৎ বলে ফেললো।

—না, ওতে কোনো আরাম নেই। ও একটা ভুলের আত্মপ্রসাদ। আমি জীব আর জীবনের বহুত্বতে বৈচিত্র্য দেখে আনন্দ পাই। আর, আনন্দের জন্যই সাধনা।— আলোক এক-কথায় জবাব দিল।

কিন্তু এসব আধ্যাত্মিক কথা চলতে দিলেন না দীপ্তি দেবী। তিনি সরাসরি নারী-সমস্যা পাড়লেন এবং সেইটাই অতঃপর আলোচিত হতে লাগলো। করবী-বরুণ-বিকাশ বহু কথা বললেও, আলোক একেবারে চুপ করে রইল সর্ব্বক্ষণ। দীপ্তি দেবী শুধালেন,

—আপনি যে চুপ করে আছেন?

—কারণ, নারী-সম্বন্ধীয় সবকিছু আমার মা'র সঙ্গেই চুকেছে। আর কোনো রূপেই ওঁদের ঘাড়ে করতে চাইনে।— হাসলো আলোক।

চায়ের আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোক ট্যাক্সি ডেকে অঞ্জনাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। করবী যাবে বরুণের বিরাট মোটরে। বরুণ অপেক্ষা করছে, কিন্তু করবীর যেন হুঁস নেই। সে বেশ বুঝতে পারল, আলোকের অন্তরে সে একটু আঁচডও কাটতে সক্ষম হয়নি। এতক্ষণ ধরে নিজেকে নানাভাবে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে—আলোক নির্ব্বিকার ছিল। বরুণকে আজ এখানে ডেকে আনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল তার—আলোককে দেখানো যে, রূপে-গুণে-জ্ঞানে বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই করবীকে লাভ করতে চায়। করবী

বুঝলো, সে উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। কোন্ দিক দিয়ে গেলে আলোককে কিঞ্চিৎমাত্রও প্রভাবিত করা যায়, এ যেন ঠিক বুঝতে পারছে না করবী। অথচ কি এমন দরকার! বরুণ রূপে-গুণে এবং ধন-মর্য্যাদায় আলোকের তুলনায় ইন্দ্রস্বরূপ, তবু করবীর নারীমন কেন-কে-জানে আলোকের পানেই ছুটতে চাইছে—বিয়ে করবার জন্য নয় নিশ্চয়, বিমুগ্ধ করবার জন্যই। কিন্তু আলোক এপর্য্যন্ত সবকিছু এড়িয়ে গেল। প্রবন্ধ দু'একটা সে লিখেছে 'যুগনারী'তে, কিন্তু কোনোটাই সমস্যা নিয়ে নয়। সেগুলো প্রাচীন ভারতনারীর কাহিনী, কিম্বা সংস্কারকে ধরে রাখবার ক্ষমতায় চিরযুগের নারীর শক্তি—এইসব অসমস্যাময় ইতিহাস মাত্র। ওতে আলোককে বুঝবার কোনো সাহায্য হয় না। কে জানে, আলোক কখনো কোনো নারীকে ভালবেসেছিল কিনা। এই বিচিত্র-চরিত্র পুরুষটিকে যেন বুঝতে চাইছে করবীর গোপন অন্তর। কিন্তু কোনো দিক দিয়েই সে সুবিধা করতে পারছে না।

—চলুন তাহলে— বরুণ আহ্বান করলো।

—হ্যাঁ, আমি একটু মার্কেটে যাব। আপনার অসুবিধা হবে না?

—না। কিছুমাত্র না— বরুণ সাগ্রহে বলল।

করবী গিয়ে গাড়ীতে উঠলো বরুণের। উৎপলা এবং মিঃ সাহাও চলে গেছেন। দীপ্তি দেবী এবং সীমা তখনো লনে বসে। সীমা সকলের চলে যাওয়ার পর বলল,

—আপ্-এ খুব গরম পড়েছে, না দীপ্তিদি?

—হ্যাঁ—কেন?

—খোকাটা ওদিকে আছে। একবার দেখে আসতে ইচ্ছে করে।

—তা যাও। গরম পড়েছে তো কী হবে। ওখানেও মানুষ রয়েছে।

—আমার যাওয়ার জন্য নয়। ওর কোনো অসুখ-বিসুখ না হয়!

—যাঁরা ওকে নিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় সে বিষয়ে ভাবছেন।

—পরের ছেলেকে ঠিক নিজের মত করে কি নেওয়া যায়, দীপ্তিদি?

—তা কি করে জানবো, ভাই?— দীপ্তিদি হেসে বললেন— নিজেরও হয়নি, পরেরও নিইনি—তবে কেউ নিলে তাকে ভালবাসে, মনে হয়।

—হয়তো বাসে। কিন্তু নিজের ছেলেকে যারা নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করে, তাদের দুঃখের তুলনা নেই, দীপ্তিদি!

—নির্ম্মম হলে আবার দুঃখ কি?— হাসলেন দীপ্তি দেবী— নির্ম্মম হতে না পারাই দুঃখ। ত্যাগ করার পর আর তার কথা মনে করা কেন? দত্ত ধনে যেমন কোনো স্বত্ব নেই, ত্যক্ত সন্তানেও তেমনি স্বামিত্ব রাখা উচিত নয়। মমত্ববোধই দুঃখের সৃষ্টি করে, সীমা!

—ওটা দার্শনিক তত্ত্ব, দীপ্তিদি। মমতা-মাতৃত্ব দর্শনের তত্ত্বে আবদ্ধ নেই।

—না,—থাকলে ঐসব মা'দের দুঃখের লাঘব হোত।

—দর্শনের তত্ত্ব মানুষের সৃষ্টি। মাতৃত্ব ঈশ্বরের দান, তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব দীপ্তিদি!

সীমার কথায় দীপ্তি দেবী আর কিছু বললেন না। সীমাই আবার বলল,

—ছেলেটাকে ওভাবে ছেড়ে দিয়ে আমি কি ভুল করেছি, দীপ্তিদি?

—না, ওকে যদি ওঁরা মানুষ করেন তো ভুল কেন হবে? ছেলেটি পিতৃপরিচয় পাবে—সমাজের একজন হতে পারবে। তার সত্যি-মা যখন জানবে সে-কথা, তখন আনন্দ তার কম হবে না— মৃদু হাসিমুখেই দীপ্তি দেবী বললেন।

—কিন্তু সে ছেলেতে তার মার আর কোনো স্বত্ব নেই। সে ছেলে কোনোদিন জানবে না, কোন্ অভাগী জননী তার জন্য হাহাকার করছে অবিরাম…

বলতে বলতে সীমার চোখদুটো ভিজে এল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বরণ করতে সে উঠে গেল বাগানের ম্যাগনোলিয়া গাছটার কাছে। মিনিটখানেক পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেকে বলল,

—একটা ফুল ফুটেছে, দীপ্তিদি—

—নাও, তুলে নাও ওটা—

—না দীপ্তিদি, থাক্। গাছকে ফুল-ছাড়া করা, ছেলেকে মা-ছাড়া করার মতই…

—তুমি দিনকয়েক বাইরে ঘুরে এসো, সীমা—নইলে অসুস্থ হয়ে পড়বে— দীপ্তি দেবী বললেন। সীমাও ধীরে ধীরে এসে বলল,

—আজই যাই—যাই রাত্রের ট্রেনে; সকালে পৌছাব। ওখানে ওকে একবার দেখে, চলে যাব দূর কোনো দেশে—সিমলা, না-হয় নৈনিতাল—

—হ্যাঁ, তাই যাও। তবে ছেলে দেখতে নাই-বা যেতে!

—যাব, দীপ্তিদি…যাই একবার। মিনিট-কয়েক থেকেই চলে যাব অন্যত্র… সীমার চোখে সীমাহীন বেদনা। দীপ্তি দেবী বুঝলেন; বলবার কিছু নেই, তবু বললেন,

—মায়ায় জড়িও না, সীমা। ওতে দুঃখ বাড়বে। উপায় যখন নেই তখন সয়ে যেতে হবে। ওখানে তোমার না যাওয়াই ভাল।

—আমার মিষ্টির ঠোঙাটা ওকে ওরা ছুঁতে দেয়নি দীপ্তিদি!…

বলতে বলতে সীমা অসহ্য বেদনায় অধীর হয়ে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। দীপ্তি দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

—যাও, ওকে দেখ গিয়ে—

নিজেকে সামলে নিল সীমা। উঠে দাঁড়ালো। তার পর বলল,

—জীবনের অন্ধকার দিকটা ঢেকে আলোতে দাঁড়ানো সবার পক্ষে সহজ হয় না, দীপ্তিদি!

—না, তা হয় না; আবার অনেকের পক্ষে হয়ও। তোমার মত কোমল-মনা মেয়ের অন্তরে এটা খুবই বড় আঘাত। ছেলেটাকে তুমি নিজের কাছে রাখলেই পারতে—

—তা সম্ভব ছিল না, দীপ্তিদি—তবে বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে না দিয়ে, ওদের কাছে দেওয়া আমার ভুল হয়েছে। যদি উপায় কিছু করতে পারি তো ওকে নিয়ে আসবো।

সীমা চলে গেল।

সহরপ্রান্তের একতালা বাড়ীটার দরজা-জানালা সব বন্ধ। হয়তো পক্ষকাল পূর্ব্বে এ-বাড়ী জনহীন হয়েছে। ফলের বাক্স আর কাপডেব স্যুটকেস নিয়ে সীমা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ব্যড়ীর পানে। ওব সাইকেল-রিক্সওয়ালা কাঁধের গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে শুধোলো,

—ক্যা করেগা, মাইজী? ই মকান তো বহুৎ রোজ খালি হো গিয়া।

—হুঁ—সীমা নিশ্চুপ বসে ভাবতে লাগলো। তারপর পাশের বাড়ীতে শুধোলো,

—এঁরা কোথায় গেলেন—এই যাঁরা এখানে ছিলেন?

—তা জানি না। এখানে বিশ্রী গরম আর জলের অভাব হওয়ায় ওঁরা চলে গেছেন দিন পনেরো হোল। পয়সাওয়ালা লোক! কষ্ট করবেন কেন?

—কে কে ছিলেন ওঁরা?—সীমা আবার প্রশ্ন করলো।

—ওঁরা স্বামী-স্ত্রী, আর একটি ছোট বাচ্চা। তাছাড়া চাকর-ঠাকুর ছিল।

—ছেলেটির কি নাম ?

—নাম ? ভাল নাম তো জানি না। ওকে 'কড়ি' বলে ডাকতেন, শুনেছি।

—'কড়ি' !—সীমার কণ্ঠে বিস্ময়। কড়ি দিয়েই কিনেছে যেন ছেলেটাকে! কিন্তু কড়িও নেয়নি সীমা। তবু সীমা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। কোনো হোটেলে গিয়ে দিনটা কাটাবে ভেবে রিক্সওয়ালাকে হুকুম করলো যেতে। রিক্সা চলছে, অকস্মাৎ সীমার মনে পড়লো, এখানে একটা ভারতব্যাপী-নাম-করা সাধনাশ্রমে নির্ম্মলা থাকে। নির্ম্মলা ওর শৈশব-বান্ধবী। সীমা আশ্রমে যেতে বলল রিক্সওয়ালাকে। দীর্ঘ পথ—চড়া রোদ। রাত জাগার জন্য সীমার চোখ লাল হয়ে আছে। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে তার রোদে। রিক্সা গিয়ে পৌছাল আশ্রমের বড় গেটে। সীমা নেমে নির্ম্মলার সাক্ষাৎ চাইল।

—তিনি তো নেই এখানে। পরশু চলে গেছেন কলকাতা।

সীমা হতাশ হয়ে ওখানেই মহুয়াগাছের তলায় বসে পড়ল। ওর যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হচ্ছে না! কী কুক্ষণে সে বের হয়েছে! কী সে করবে এখন ?

আশ্রম থেকে দুটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ওকে দেখে বলল,

—নির্ম্মলাদি নেই, তাতে কি হয়েছে ? আসুন আপনি। আমরা তো আছি—

—অ্যাঁ, আপনারা আজকের দিনটা থাকতে দেবেন আমায় ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। দু'চার দিন থাকুন না! আসুন—

সীমার সুটকেস আর ফলের চুবড়ী ওরাই বয়ে নিয়ে গেল। সীমাও গেল আশ্রমের ভিতর। ওখানকার মোহান্ত-মহাশয়ের সঙ্গে

তখন অবশ্য দেখা হোল না সীমার, কিন্তু সে এখানের সকলের ব্যবহারে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করলো। স্নানাদি সেরে কিছু প্রসাদ পেয়ে সীমা বিশ্রাম করতে করতে ভাবতে লাগলো—এ জীবন সত্যি আরামের! এখানে যেন একটা নিবিড় নিশ্চিন্ততা জমাট হয়ে রয়েছে। পারে তো, দু'চার দিন থেকে যাবে সীমা এখানে।

বিকালে আশ্রম-কন্যারা সীমাকে সমস্ত আশ্রমটা দেখালো। বেশ বড় আকার। থাকেনও অনেক লোক। যোগী, ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী। নির্ম্মলা এখানে ছিল কয়েক বছর। সম্প্রতি সে কলকাতা গেছে—কবে ফিববে, জানায় নি। হয়তো এখানে আর ফিরবে না!

নির্ম্মলা ফিরবেনা শুনে সীমার মনটা দমে গেল। ফিরবেনা কেন নির্ম্মলা? প্রশ্নটা ওর অন্তরকে বিচলিত করে তুললো বেশীরকম। তাহলে নির্ম্মলা কি এখানে এমন কিছু পেয়েছে বা দেখেছে, যাতে তার থাকা সম্ভব হোল না? সীমা ভাবতে লাগলো।

সন্ধ্যায় এখানকার মোহান্তের সঙ্গে দেখা হোল সীমাব। পঞ্চাশের নীচেই বয়স। সৌম্য-সুন্দর বরবপু যোগীজনোচিত বেশে সুসজ্জিত। অঙ্গে চন্দনগন্ধ। কথা কমই বলেন তিনি। যা বলেন, তা আধ্যাত্মিক রাজ্যের চিরদুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকথা। বাইরে থেকে বেশ একটা শান্ত পরিমণ্ডল দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতটা শান্তি যেন কেমন অসহ্য হচ্ছে সীমার! সীমা একশো এক টাকা দিয়ে প্রণাম করলো মোহান্তকে। অস্পষ্ট একটা আশীর্ব্বাণী উচ্চারিত হোল তাঁর মুখ থেকে। সীমা বলল,

—আমি এখানে আশ্রয় পেতে পারি প্রভু?

—হাঁ, কাহে নাহি? তুমি তো ব্রহ্মচারিণী আছ, কুমারী?

—হ্যাঁ— সীমা মাথা নীচু করে বলল,— নাহলে কি থাকা যায় না?

—যায়। কিন্তু যে যেমন অবস্থায় আসে, তাকে সেইরকম ভাবেই সাধনা করতে হবে তো? কুমারীরা ব্রহ্মচারিণী থেকে ধর্ম্মসাধন করবেন।

—যদি কোনো পতিতা-পথভ্রষ্টা আসেন ?— সীমা প্রশ্ন করে বসল।

—পতিতা ?—না, এখানে কোনো পতিতাকে স্থান দেওয়া হয় না।

—তাহলে ভগবানের 'পতিতপাবন' নাম কেন ?— সীমা কঠিন কণ্ঠে বলল।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে আমি। এখানকার নিয়ম এই।

সীমা আর কিছু বললো না। চুপ করে খানিক বসে রইল, তারপর উঠে গেল তার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে। ও যাবার সময় মোহান্ত বললেন,

—দীক্ষা দেওয়ার পর তোমাকে আশ্রমের আইনকানুন জানানো হবে।

—সীমা নিজের ঘরে এসে আকাশ-পাতাল ভাবলো। ভাবলো, সাধু-সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার কথা কাগজে পড়েছে; পড়েছে সম্প্রতি কয়েকটি আশ্রম-সংক্রান্ত মামলার কথা—আর দেখেছে সে নিজেই—প্রায়ই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ গৃহত্যাগ ক'রে আশ্রমকেই সংসার বানিয়ে নেন। টাকা-পয়সা তো আসেই, নারীও কম আসে না! হয়তো সে-টাকা ওঁরা সৎকাজেই ব্যয় করেন। কিন্তু সৎকাজ করবার জন্য সংসারেও তো বহু সদ্‌ব্যক্তি আছেন, দেশের সরকার আছে আর আছে বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। আধ্যাত্মিকতার পথে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টায় যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের ওসব সৎ-অসৎ কর্ম্ম থেকে সরে থাকাই তো উচিত। সীমার যেন মনে হোল, এখানে ধর্ম্ম না হয়ে ধর্ম্মের বিলাস চলছে। চলছে সস্তা শাস্ত্রবিধির বাহ্যিক চাকচিক্য। দানের মাধ্যমে, সেবার আবরণে এখানে যেন আত্মপূজার আয়োজনই সুপ্রচুর।

কিন্তু সীমা কি এদের প্রতি অবিচার করছে না? অপরাধী হচ্ছে না এরকম কথা ভেবে! এদের সম্বন্ধে কিছুই তো জানেনা সীমা এখনো। কিন্তু সীমা সন্ধ্যাবেলা দেখেছে, যে-দুটি মেয়ের সঙ্গে একঘরে

ওকে থাকতে দেওয়া হয়েছে—তাদের তেল-চিরুণীর মধ্যে সুগন্ধি স্নো-সাবান, তাদের বালিশের নীচে অসাধুপাঠ্য উপন্যাস। সীমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের কাছে এই-ই যথেষ্ট ওদের বুঝবার পক্ষে। কিন্তু তবু সীমা কিছু ভাবলো না; রাত্রে খাওয়াব পর শুয়েছে। মনের অশান্তিতে ঘুম আসেনি। দেখল, একটি মেয়ে উঠে কাপড় বদল করে বেরিয়ে গেল। সীমা যে ঘুমায়নি, তা সে টের পেল না। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখলো, দ্বিতীয় মেয়েটিও কাপড় বদলাচ্ছে। সীমা হঠাৎ একটু শব্দ করে ফেলতেই মেয়েটি বলল,—ঘুমান, সীমাদি। মাঝরাতে আমাদের প্রাণায়াম করতে হয়, তাই যাচ্ছি একটু বাইরে।...

সীমা নিঃসাড় পড়ে রইল, কিন্তু তখনো ঘরের মধ্যের প্রসাধন-গন্ধ ওর নাকে সঞ্চারিত হচ্ছে। সীমার মনে হতে লাগলো, শ্বাসের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা সাপ যেন ঢুকছে ওর বুকের ভিতর!

সিদ্ধেশ্বরের কাছেই বসল নির্ম্মলা। গাড়ীর সমস্ত লোক ওদের দেখছে। এতক্ষণ সিদ্ধেশ্বর সম্বন্ধে সঠিক কারো কিছু জানা হয়নি; এবার ওর পরিচিতা মেয়েটিকে প্রশ্ন করা যেতে পারবে ভেবে গাড়ীর অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। নির্ম্মলা কিন্তু অতি নিম্নকণ্ঠে কথা বলছে সিধুর সঙ্গে। গাড়ী না চললে ওর হয়তো কিছু কথা শোনা যেতো। সবাই দেখলো, নির্ম্মলা শ্রীমন্দিরের প্রসাদী পেঁড়া বের করে সিধুকে প্রসাদ দিল। মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিল সিধু কণিকামাত্র। চলন্ত গাড়ীতে কথা কিছু জোরে না-বললে শোনা যায় না, কিন্তু নির্ম্মলার কথা কেউ-ই শুনতে পাচ্ছেনা আরোহীগণ। জংশন ছেড়েছে গাড়ী

অনেকক্ষণ। অন্য কোনো বড় ষ্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষাকালে ওরা নির্ম্মলাকে হয়তো প্রশ্ন করবেন সিধুর সম্বন্ধে। কিন্তু নির্ম্মলার কথাই শেষ হচ্ছে না! অবশেষে আসানসোল এল গাড়ী। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরতাপে মানুষের মন ভগবানকে দেখলেও বিদ্রূপ করবে—এমনি অবস্থা! সবাই চুপ করে রইল।

বর্দ্ধমানে বেলা অনেকখানি পড়ে এসেছে। সবাই চা-জল খেতে চান—কেউ নামলেন, কেউ-বা কামরা থেকেই চায়ের ভাঁড় অথবা কেল্‌নারের খাদ্য কিনলেন। সিধু এবং নির্ম্মলা নির্ব্বাক। ওদের সব কথাই ফুরিয়ে গেছে নাকি! সেই মুখর্ যুবকটি এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে ছিল কোনোরকমে; এবার বলল,

—আমাকে কিছু উপদেশ দেবেন, সাধুজী?

—উপদেশ? কি উপদেশ দেব, বাবা? উপদেশ দেবার তো আমার ক্ষমতা নেই।

—ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু। ভগবানকে লাভ করবার উপায় যদি আমাদেরও থাকে ··

—উপায় সকলেরই আছে, বাবা! কিন্তু আমি তার কি বলবো! আপনি যদি তাঁকে লাভ করতে চান তো তিনিই সে-উপদেশ দেবেন। মানুষের উপদেশে কিছু কাজ হয় না। আপনার অন্তরে যিনি আছেন তিনিই আপনাকে পরিচালনা করেন, এবং সেই 'তিনি' আপনারই স্বরূপ এবং তাঁরও নিজরূপ। তাঁকে ধরুন—অপরের উপদেশে কি হবে!

—শাস্ত্রে সাধু-মোহান্তের কথা তো শুনতে বলা হয়, সাধুজী!

—আপনার ইচ্ছে হয় তো শুনবেন, বাবা, আমি ওসব বলবার মত কিছু নই।

সিধু একেবারে কেটে বাদ দিল কথা-বলা। জানালার দিকে মুখ বাড়ালো। সূর্য্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে, তাই পিছনের দিকটায় ছায়া

ঘনিয়ে আসছে, যদিও উত্তাপের প্রচণ্ডতা এখনো কমেনি। এত গরম বহু বৎসর হয়নি এদেশে। এ যেন অস্বাভাবিক একটা তাপতরঙ্গ। রুদ্রদেবতার ধ্বংসকরী মহাশূল যেন দগ্ধ করে দেবে বিশ্বচরাচরকে। মানুষের প্রস্তুত অণুশক্তির প্রয়োগ-পরীক্ষার এটা পরিণাম কিনা, ভাবছেন অনেকে।

উৎপলার বাড়ীতেই এসে উঠবে সিধু, ঠিক ছিল। কিন্তু ওকে নির্ম্মলা টালীগঞ্জে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। নির্ম্মলার বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে থাকলেও, একখানা কুঠরী সে নিজের জন্য রেখেছে। ওখানেই উঠবে গিয়ে। কিন্তু সিধু নির্ম্মলাদের আশ্রমটি সম্বন্ধে যে-সব কথা শুনলো তাতে নির্ম্মলার সান্নিধ্য ওর আর ভাল লাগছে না। অথচ নির্ম্মলা তার গুরুভগ্নী এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত। বহু ব্যাপারেই সে জড়িত ছিল গুরু কর্ণবিজয়ের অবলম্বিত সাধনপন্থায়। সেই নির্ম্মলার এই অবস্থা দেখে দুঃখই পেল সিধু। কিন্তু উৎপলাকেই বা কতটুকু জানে সিধু? নারীচরিত্র চির দুর্জ্ঞেয়। তবু সিধুর মন উঠছেনা নির্ম্মলার বাড়ীতে যাবার জন্য। অবশ্য নির্ম্মলা-যে তার অবস্থান-আশ্রম সম্বন্ধে খোলাখুলি খারাপ কিছু বলেছে, তা নয়। যতটুকু বলেছে, তাতেই সিধুর ধারণা হয়েছে—ওখানে ভাল থেকে মন্দই বেশী হয়। গাড়ী হাওড়ার কাছাকাছি হতেই সিধু যেন জোর করে নির্ম্মলাকে বলল,

—উৎপলা দেবীর বাড়ীতেই আমাকে যেতে দাও, নির্ম্মলা—ওখানেই তো আমার কাজ রয়েছে—

—তাহলে আমাকে কি তুমি ত্যাগ করছো, সিধুদা?— নির্ম্মলার কণ্ঠে কাকুতি।

—ত্যাগের কথা তো ওঠেনা, দিদি! তোমাকে নিরাপদ হতে বলছি।

—তুমি সঙ্গে গেলে আমার অসুবিধাটা কম হয়। ওখানে যারা আছে তারা অন্ততঃ ভাববে যে, আমি আমার গুরুভাইএর সঙ্গে তীর্থে গিয়েছিলাম।

—ঐ সঙ্গে আরো অনেক কিছু তারা ভাবতে পারে, নির্ম্মলা! তাদের ভাবা তুমি রুখতে পারবে না। আমি সঙ্গে গেলে সে-ভাবনা ওদের বাড়তেও পারে।

—আমি অবশ্যি তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে বের হইনি— নির্ম্মলা অসহায়ের অবলম্বন-স্বরূপ আর্ত্তচোখে তাকালো— তবে ঈশ্বর যখন দেখা করিয়ে দিলেন তোমার সঙ্গে, তখন মনে হচ্ছে, তুমি সঙ্গে গেলেই ভাল হয়।

—তুমি-যে ঐ আশ্রমে ছিলে তা তো জানে সকলেই—

—হাঁ, তা জানে। তাতে কোনো ক্ষতি হবে না, সিধুদা! ও আশ্রমের নাম এত বেশী আর ব্যাপক যে, বাইরে থেকে ওকে লোকে 'বৈকুণ্ঠ' মনে করে।

—অনেক আশ্রম সম্বন্ধেই একথা খাটে, নির্ম্মলা— সিধুর কণ্ঠে হতাশ্বাস যেন।

—ভাগ্যের উপর হাত নেই, সিধুদা! নইলে আমি ওখানে যাব কেন?

চোখের জল মুছবার জন্য আঁচলটা দিল নির্ম্মলা চোখে। গাড়ী প্লাটফর্ম্মে ঢুকছে। সিধু নিশ্চুপ বসে। নামবার আয়োজন করার ইচ্ছে হচ্ছেনা তার। মনে হচ্ছে, গাড়ীটা যদি এমনি চলতেই থাকতো তার জীবনভোর তো, বেশ হোত! নামলেই যেন একটা অঘটন ঘটে সিধুর জীবনে। ভগবান যেন সিধুকে এইসব অসহায়া নারীদের কাজে লাগাতেই সৃষ্টি করেছেন।

চিন্তাটা মনে উদয় হতেই সিধুর ঈশ্বর-বিশ্বাসী অন্তর এক অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ঈশ্বরের প্রয়োজনে সে লাগতে পারছে, এর থেকে জীবনের সার্থকতা আর কি হতে পারে? কাশীতে ঈশ্বর অবন্তীর জন্য সিধুকে ব্যবহার করেছেন, কলকাতায় করেছেন উৎপলার জন্য—আজ আবার ট্রেনের এই কামরায় জগৎকর্ত্তা সিধুকে ব্যবহার

করছেন নির্ম্মলার জন্য ! এই তো সিধুর সৌভাগ্য। সিধু বোঝা-মালা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল,

—চল, তোমার ওখানেই যাওয়া যাক্‌...

আনন্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল নির্ম্মলার চোখ থেকে। নিজের সামান্য জিনিষ ক'টা হাতে নিতে নিতে সে বলল এতক্ষণে,

—তিনি সত্যি আছেন, সিধুদা ..

—হ্যাঁ, তিনি আছেন। নইলে তাঁর নামে অশ্রুপাতে এত আনন্দ কেন ?

—অশ্রুই কি আনন্দের প্রকাশ, সিধুদা ? হাসি তাহলে কি ?

—হাসি জীবনেব ব্যঙ্গ-বিকৃতি।—চলো—

নির্ম্মলা নামাব পর সিধু তাব ঝোলা নিয়ে নেমে এল প্লাটফর্ম্মে। অতঃপর টালিগঞ্জ যেতে হবে, কিন্তু গাড়ীর সেই যুবকটি সামনে এসে বলল,

—আপনাদের ঠিকানাটা দিন—আমি দেখা করবো।

—দেখা করার সুবিধা হবে না, বাবা, আমি দু'একদিনের মধ্যে এখান-সেখান ঘুরে আমার কাজ সেরেই চলে যাব পশ্চিমে।

—আপনার কাছে আমি দীক্ষা নিতে চাই, সাধুজী !

—আমি দীক্ষা দিই না, বাবা—মাফ করবেন।— সিধু এগোলো।

পিছনের নির্ম্মলা পাশাপাশি এল ওর। কিন্তু যুবকটিও আসছে কাছেই। কোনো কথা তাই কইল না সিধু বা নির্ম্মলা। বাইবে বেরিয়ে নির্ম্মলা একখানা ট্যাক্সি ডেকে চড়ে বসল।

—টাকা আছে তো ভাড়ার ?— প্রশ্ন করলো সিধু।

—হ্যাঁ— হাসলো নির্ম্মলা। —উঠে বসো।

ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে ওদের নিয়ে, তখনও সেই যুবকটি দেখছে ট্যাক্সিখানাকে। ট্যাক্সির নম্বরও নিশ্চয় টুকে নিয়েছে সে। সিধু ঠিক করলো, খানিকদূর গিয়েই এ ট্যাক্সি ছেড়ে অন্য টাক্সি করে টালিগঞ্জ যাবে। কারণ ঐ যুবকটি গোয়েন্দা অথবা অন্য কেউ, ঠিক বুঝতে পারছে না সিধু। এসপ্লানেড পৌঁছেই সিধু ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। একখানা চলতি বাসে উঠে ওরা টালিগঞ্জে পৌঁছাল। বাসষ্ট্যাণ্ড থেকে কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। যেতে যেতে নির্ম্মলা প্রশ্ন করলো,

—'হাসি'কে জীবনের ব্যঙ্গ কেন বললে, সিধুদা ?

—কারণ, সত্যি হাসি দুর্লভ, নির্ম্মলা! মানুষের হাসি তার ভুলের প্রকাশ।

—যেমন ?

—যেমন ধর, কেউ আয়নায় নিজের রূপ দেখে হাসলো যৌবনকালে ; কিন্তু বার্দ্ধক্যের জীর্ণদেহ আয়নায় দেখে সে প্রথম হাসিটা ভুল বুঝে হাসবে, আবার দ্বিতীয় হাসির ভুল বুঝবে মৃত্যুর পর—যখন সে দেখবে তার বিদেহী সূক্ষ্ম দেহ। কিন্তু এই তিন দেহের কোনোটাই হয়তো তার দেহ নয়—

—আমি সাধারণ হাসির কথা বলছি, সিধুদা— নির্ম্মলা বলল,—আজ দেড় বছর আমি ওখানে ছিলাম, একদিনও সত্যি করে হাসিনি। অথচ আমাকে রোজই বহুবার হাসতে হোত ওদের কাছে—ওগুলো কি জীবনের ব্যঙ্গ ?

—ওটা তুমিই ভাল বুঝবে, নির্ম্মলা।—কতদূরে বাড়ী তোমার ?

—ঐ তো, মোড়ের ঐ দোতালাটা।

দুজনে এসে উঠলো বাড়ীর দরজায়। এ বাড়ীতে যাঁরা ভাড়াটিয়া থাকেন, তাঁরা চেনেন নির্ম্মলাকে। মাসে মাসে ভাড়ার টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠান। কাজেই নির্ম্মলার কোনো অসুবিধা হোল না। চাবি বের করে নিজের ঘরটা খুলে সে সিধুকে বসতে বলল। ছোট ঘর একতালায়। পাশে [illegible]। ঘরটা বাড়ীর পিছন দিকে। অর্থাৎ বাড়ীর মধ্যে খারাপ ঘরটাই নির্ম্মলা নিজের জন্য রেখেছে। একখানা তক্তাপোষ, একটা আলনা আর দুটো জলচৌকী মাত্র সম্পদ ঘরখানার। ধূলো জমে আছে। নির্ম্মলা একটা জলচৌকী বের করে সিধুকে বসতে দিয়ে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলো ঘরে। কিন্তু বাড়ীর একটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে ওর কাছ থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে বললেন,

-যাও, তুমি গা-হাত ধোও। ওঁকেও ধুতে বল। আমি ঘর সাফ [illegible]দিচ্ছি।

[illegible]ায়ান্ধকার কক্ষটির জানালা খুলে দিতেই কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়ল [illegible] সিধু কলতলায় গিয়ে স্নান সেরে এল, তার পর ঐ ঘরেরই একপাশে কম্বল বিছিয়ে পূজাতে বসল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—সুইচ টেনে দিল নির্ম্মলা।

পূজায় কিন্তু মনঃসংযোগ হচ্ছে না। নির্ম্মলা এখানে কী সম্পর্ক স্থাপন করলো সিধুর সঙ্গে, জানেনা সিধু। নির্ম্মলাকে শুধুতেও ভুলে গেছে। হয়তো নির্ম্মলা এখানে সিধুকে তার স্বামী বলেই পরিচয় দেবে—কিম্বা কী বলবে, কে জানে! যা বলে বলুক, নির্ম্মলাকে নিরাপদ করবার জন্যই এসেছে সিধু এখানে। কিন্তু অন্য একটা চিন্তা সিধুকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলছে। সম্মুখে তার পিতৃপুরুষের অর্চ্চিত শালগ্রামশিলা—যে শিলাখণ্ড আপনার অসীম শক্তিতে চরিত্রহীন, লম্পট, গঞ্জিকাসেবী সিদ্ধেশ্বরকে আজ 'সাধু সিদ্ধেশ্বরে' পরিণত করেছে, সেই শিলাখণ্ডে নারায়ণের ধ্যান করতে করতে সিধু ভাবছে,

আধ্যাত্মিকতার অধঃপতন অগাধ অসীম হয়ে উঠলো ভারতে আজ। ধর্ম্ম যে জাতিকে স্মরণাতীত কাল থেকে ধারণ-পোষণ-পালন করে আসছে—সেই ধর্ম্ম আজ শুধু গ্লানিযুক্ত নয়, অবলুপ্ত হতে চলেছে। যে তপোবন-জীবন ভারতীয় মহিমার চিরোজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য্য—সেই জীবনেই আজ নেমেছে অমাবস্যার অন্ধকার। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আর অনাচার অকথ্য হয়ে উঠছে দিকে দিকে। অথচ সিধু গুরুদেব কর্ণবিজয়ের মুখে বহুবার শুনেছে, ধর্ম্মই ভারতকে ধারণ করে আছে—চিরদিনই থাকবে। এ-ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম এবং মানবাতীত ভাগবতী ধর্ম্ম। কিন্তু আজ ধর্ম্মস্থানে তথা ধার্ম্মিক নামে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একি দেখছে সিধু! শুধু প্রচার আর প্রলোভনের মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করার আয়োজন—রিরংসা-বৃত্তির নগ্ন রূপ—কাম-ক্রোধ-লোভ চর্চ্চার চমকপ্রদ মায়াজাল! রাষ্ট্রনেতার মুখের 'সাধু থেকে সাবধান থাকা'র বাণীটি যেন একান্তভাবে সত্য হয়ে উঠলো সিধুর কাছে।

ধর্ম্মের গ্লানি দূর করবার জন্য যুগে যুগে ঈশ্বরের অবতরণের কথা কি বিশ্বাস করবেনা সিধু আজ? অথবা আশা করবে, তিনি নিশ্চয় অবতরণ করবেন! কিন্তু কখন করবেন আর অবতরণ! ভারতীয় ধর্ম্ম নির্ব্বাণ-লাভ করতে চলেছে! মানুষ পশুত্বের নিম্নতম গহ্বরে নেমে যাচ্ছে ক্রমশঃ—হিংস্র হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্ত্তে। যদিও ভারতরাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে আজ সারা পৃথিবীর কল্যাণ-যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত, তবু দেখা যাচ্ছে—ভাবতীয় মানবধর্ম্ম যেন ক্ষীণতর হচ্ছে প্রতিদিন। প্রমাণ, সংবাদপত্রের যে-কোনো দিনের আইন-আদালত সংবাদ। এই তো অবস্থা! অথচ সিধুর ধর্ম্মমত এই যে, সমগ্র ভারতে এক বিরাট অধ্যাত্ম-চেতনা জাগ্রত হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে দৈবীভাবে পূর্ণ করবে—মানুষ দেবভাবাপন্ন হবে। কিন্তু 'জীব শিব হবে' কথাটাতে কি আর বিশ্বাস করা যায়?

জীবনের রুদ্ররূপ দেখেছে সিধু, কালরূপী রুদ্রকেও দেখে আসছে এই ক'বছর—এখন কে জানে কবে ধ্বংসের মহারুদ্র জাগ্রত হয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দেবেন পৃথিবীতে। জীবশূন্য হয়ে যাবে জগৎ। জীবনের জটিলতা আবার আরণ্যক সারল্যে লালিত হবে কোটি কয়েক বছরের পশ্চাদপসরণে!

আত্মরক্ষার জন্য মানুষ সমাজনীতির প্রতিষ্ঠা করেছে আদিমযুগে, রাজনীতিও ওরই প্রেরণায়, অর্থনীতি তারপর ধীরে ধীরে প্রভাবিত করেছে মানবজগৎকে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি মানুষের চিরযুগের সম্পদ—বিধাতার করুণার দান। একে কেউ আবিষ্কার করেনি, কেউ প্রতিষ্ঠিত করেনি। মানবধর্ম্ম মানুষের স্বভাবজ। আজ সেই স্বভাববৃত্তিকে রাজনীতি-সমাজনীত-অর্থনীতির জটিলতায় আবর্ত্তিত হতে হচ্ছে অবিরাম। এর পরিণাম কি—কে বলবে?

দীর্ঘশ্বাস পড়ল সিধুর একটা। কিন্তু কী সে করতে পারে! কেই-বা কী করতে পারে? মহাকালের রুদ্ররূপ দেখবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বেদনামথিত হৃদয়ে সিধু পূজা শেষ করলো।

—একটু জল খান— বাড়ীর সেই বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন এতক্ষণে।

—আচ্ছা দিন— সিধু হালুয়ার পাত্রটা নিল; ওতে দু'টুকুরো আম আর একটা রসগোল্লা। নিবেদন করে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করলো সিধু। মহিলাটি বললেন,

—রাত্রে কি সেবা হয়, বাবা?

—কিছু নিয়ম নেই, মা! নিরামিষ খাই আমি। রুটি-ডাল, না-হয় চিঁড়ে-মুড়ি বা ছোলা-ভিজে—

—খানকতক লুচি করে দেব, বাবা?

—না মা, লুচি কেন? আর, খাঁটি ঘি তো পাওয়া যায় না! [redacted]াক্—

—না বাবা, ঘি খাঁটি বলতে পারবো না। তাহলে ডাল-রুটিই দেব?

—হ্যাঁ, মা!

মহিলাটি চলে গেলে সিধু ঘরখানা দেখলো। দেখলো, নির্ম্মলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার পাশে। সিধু ডাক দিল,

—নির্ম্মলা!

—যাই—

নির্ম্মলা আসতেই সিধু নীচু গলায় প্রশ্ন করলো,

—এদের কাছে তোমার-আমার কী সম্পর্ক— ?

—ওরা ভেবে নিয়েছেন, তুমি আমার গুরুদেব।

—তাতে সুবিধে হবে?

—খুব অসুবিধে হবে না।

—বেশ।

উৎপলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন অঞ্জনার। শুধু পরিচয় মাত্র, অন্য আলাপ বিশেষ কিছু হয়নি। যেটুকু জেনেছে অঞ্জনা উৎপলার সম্বন্ধে তা এই-যে—উৎপলা কুমারী—সে একটা মহিলাশ্রমের কর্ত্রী এবং আরো নানা সমাজসেবার কাজে আত্মসমর্পিতা। অর্থ এবং সম্মান তার প্রচুর। মন্দার-প্রডাক্‌সনের মালিক মিঃ সাহা তার বন্ধু এবং বিকাশবাবু বন্ধুর কিছু হয়তো বেশী—হয়তো কোনো আত্মীয়। কিন্তু উৎপলার সঙ্গে আলোকের সম্পর্ক কী, কিছুই জানতে পারেনি অঞ্জনা। অকস্মাৎ ঐ চায়ের আসরে আলোককে দেখে উৎপলার চোখেমুখে মুহূর্ত্তের জন্য যে মিলন-ব্যঞ্জনা সে লক্ষ্য করেছে, তারই

অনুভূতি ওর প্রখর নারীমনে একটা আশ্বাস জাগাচ্ছে এই কয়দিন। আজ হঠাৎ বলল,

—আচ্ছা দাদা, ঐ উৎপলা মেয়েটি তো তোমাকে ভালই চেনে, মনে হোল।

—মানুষকে চেনা কি অত সোজা রে, অঞ্জু? উৎপলা কতটুকু চেনে আমায়?

—আমি দর্শনশাস্ত্র পড়ছি না এখন— অঞ্জনা রেগে বলল,— আমি বলছি যে, ঐ উৎপলা তোমাকে শুধু চেনে নয়, রীতিমত ভালবাসে। অর্থাৎ···

—অর্থাৎ?— আলোক ঔৎসুক্য দেখালো যেন চোখে।

—অর্থাৎ তুমি রাজী হলে, ও তোমাকে বিয়ে করতে পাবে।— হাসল অঞ্জনা।

—ও বহুপূর্ব্বেই মহাকালকে বিয়ে করেছে, জানিস অঞ্জু! ওর জীবন কালস্রোতে-ভেসে-যাওয়া ফেনপুঞ্জ—বিরাট-বিশাল-শুভ্র-সুন্দর···

—শুধু ফেনপুঞ্জ! ওর তাহলে দাম কি? অঞ্জনা বিদ্রূপ করে উঠলো।

—তুই আজও মানুষ হলি নে, অঞ্জনা! তোকে এত লেখাপড়া শেখানো হোল, এত ভাল বরের হাতে দেওয়া হোল—দুটো বাচ্চার মা হলি, এখনো তুই অবোধ রইলি! বর্ত্তমান জগৎটা ফেনার জগৎ—ফাঁপার জগৎ।, 'ফেনা'ই চলছে আধুনিক জগতে, দেখতে পাচ্ছিস না? যত ফাঁপা হবি, ততই নাম-যশ-অর্থ। অর্থে ফেঁপে ওঠ্, যশে ফেঁপে ওঠ্—বিদ্যা না থাক্, বক্তৃতায় ফেঁপে ওঠ্—কাজ না কর্, কাগজে-কলমে ফেঁপে ওঠ্। ফাঁপা চাই—'পুঞ্জীভূত ফেনা' হওয়া চাই! বর্ত্তমান কালস্রোত এমন একটা জায়গায় এসেছে, যেখানে ভূরি-ভূরি ফেনা—

—অর্থাৎ কালসমুদ্রের মোহনায় এসেছে, কেমন ?— অঞ্জনা হেসে বলল,—তাহলে আর দেরী নেই, সবই সমুদ্রে মিশে যাবে—মানে, প্রলয় হবে, নয় কি ?

—এতক্ষণে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির কথা বললি। কিন্তু স্রোত সমুদ্রে মিললেও অনেক ফেনা মোহনার মুখে জমা হয়ে থাকে। তার সাদা রং বিবর্ণ হয়ে যায়, স্রোতের পঙ্কিলতাটুকু সঞ্চয় করেই সে জমে পাথর হতে চায় ; তাতে সৃষ্টি হয় বিকৃত জীব-জীবন—অবশ্য সে অনেক পরের কথা···

—উৎপলা দেবীকে তাহলে তুমি শুধু 'ফেনা' বলছো ?

—বলবার দরকার কি ? আমি 'সোনা' বললেও সে যা আছে, তাই থাকবে।

—তোমার ধারণার কথা শুধোচ্ছি—

—নারী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা আমি ছেড়ে দিয়েছি অনেককাল।

—আর, পুরুষ্ সম্বন্ধে ?— হাসলো অঞ্জনা কথাটা বলে।

—আমার প্রয়োজন নেই, অঞ্জু !

—জগৎ সম্বন্ধে ?

—তারই-বা প্রয়োজন কোথায় ?

—তাহলে কী সম্বন্ধে তোমার প্রয়োজন, দাদা ?

—কিছু না, অঞ্জনা ! একটা নির্ব্বিকার নিশ্চেষ্টতা আমাকে অধিকার করছে ক্রমশঃ। একে ঔদাসীন্য মনে করিস না—

—কী তাহলে ?— অঞ্জনা কঠিন হয়ে তাকালো আলোকের পানে।

—এও তো একরকমের সাধনা। নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিচারশীল মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যে শুদ্ধ মন— যে-মনে আমিত্বের অধ্যাসও নেই, সেই মনে অধিষ্ঠিত থাকার সাধনা এটা—

—এতে কার কি লাভ হবে, দাদা ?

—লাভ-অলাভের খতিয়ান তো এতে নেই, বোনটি! তা করলেই তো মনকে বিচারশীল হতে হয়। আর লাভ-অলাভের কর্ত্তা কি তুই-আমি? না কি অন্য কোনো মানুষ? স্বীকার করি, মানুষ বহুকিছু করেছে এই শত শতাব্দীতে। কিন্তু সে লাভ করেছে, কি লোকসান করেছে, কে বলবে সে কথা? তার সরল আরণ্যক জীবনকে তার জটিল আণবিক জীবনের ঘূর্ণিতে এনে সে লাভ করেছে কি অলাভ করেছে, সে জানে না। অতীত দিনে আধুনিক জগৎ যেমন কল্পনার বস্তু ছিল পক্ষিরাজ-ঘোড়া আর পাতালপুরীর রাজকন্যার স্বপ্ন নিয়ে, আজকের বর্ত্তমান জগৎও তেমনই কল্পনা দিয়েই অতীতকে ধারণা করে—বল্কলবাসা ঋষিকন্যার কক্ষে অযুত ঘৃতকুম্ভের হোমাগ্নি-আয়োজনের চিন্তাধারায়। এ-দুয়ের মধ্যে লাভ-অলাভের প্রশ্ন অবান্তর। সে-দিন সে ছিল, আজও সে আছে—এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। লোকসান খেয়ে খেয়ে মানবস্রোত তো দেউলে হয়ে যায়নি?

—তার চর্ব্বি-জ্বালানো প্রদীপ আজ 'নিওন লাইট' হয়েছে, দাদা!

—চর্ব্বি-জ্বালানো মানুষটি নিওন-জ্বালানো দোকানী থেকে কম সুখী ছিল, বলা চলে না।

—কথাটা কিন্তু কোথা থেকে কোথায় চলে এলো। তোমার সঙ্গে কথা-বলার এই মুস্কিল। আমার প্রশ্ন ছিল, উৎপলা দেবী বিয়ে করলেন না কেন?

—সে-কথা উৎপলা দেবীকেই শুধোবে?

—ওর সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে আমার?

—ওর বাড়ী গেলেই হবে।

—কোথায় বাড়ী? জান তুমি ঠিকানা? ওর শিশু-বিদ্যালয় দেখতে চাই আমি।

—তোমার বরের সঙ্গে যাবে। ঠিকানা ফোন-গাইডে আছে।—যা, চা দে এককাপ। খামোখা কতকগুলো বকালি!

—তুমি বুঝি যাবেনা উৎপলার বাড়ী?

—না। আমার কোনো কাজ নেই ওখানে।

—নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে?— বিদ্রূপ করলো অঞ্জনা হাসি দিয়ে।

—ওখানে দর্শনীয় কিছু নেই—শুধু ফেনা! আমি জলের স্রোত দেখবো, তরঙ্গ দেখবো—

—বিচার করছো তুমি, দাদা— অঞ্জনা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলল।

আলোক তাকালো ওর মুখপানে। তারপর হেসে বলল,

—তুই আমার যোগ্যা শিষ্যা। সত্যি বিচার করা হয়ে গেল এবার। আমি হার মানলাম। কিন্তু আমি তো এখনো সিদ্ধিলাভ করিনি, সাধনা করছি। যা, চা দে—

—হার স্বীকার করলেই হবে না, আমায় নিয়ে যেতে হবে উৎপলা দেবীর বাড়ী।

—আচ্ছা। কবে যাবি?

—আজই। উনি বাড়ী আছেন কিনা, তুমি ফোন করে জেনে নাও।

—এত ব্যস্ত কেন রে, অঞ্জু?

—ওঁর সঙ্গে কথা বলবো আমি। আমার মনে হচ্ছে, উনি তোমায় খুব বেশী ভাববাসেন—অবশ্য তোমার সঙ্গে কোনো কথা আমি ওঁর হতে দেখিনি। কিন্তু…

—কিন্তু?

—উনি যেন তোমাকে দেখেই পরম আনন্দ পাচ্ছিলেন। যেন ভাবছিলেন, উনি তোমার মধ্যে একটা বিশেষ আশ্রয় পেয়েছেন। প্রত্যেকটি কথা বলে উনি তোমারই মুখপানে তাকাচ্ছিলেন, তোমার

সমর্থন আছে কিনা জানবার জন্য। অথচ দেখলাম, ওঁর সঙ্গে যারা এলেন, মিঃ সাহা বা বিকাশবাবু, উনি তাঁদের গ্রাহ্যও করেন না।

—আমি চুপ করে ছিলাম বলেই হয়তো ওর আগ্রহ বেশী হয়েছিল, অঞ্জনা।

—এরকম হয় না, দাদা। তোমার সমর্থন যেন ওঁর বুকের শ্বাস বলে বোধ হচ্ছিল। অন্ততঃ আমি একবার অনুসন্ধান করবো, উনি তোমায় কি ভাবে দেখেন।

—দেখে কি হবে ?

—অন্ততঃ জানা হবে উনি সবটা ফেনা নন ; ফেনার ভেতর হয়তো বাহিত হয়ে আসছে একখণ্ড হীরে—

—হীরক অদাহ্য, অদ্রবণীয়। অলঙ্করণে তার শোভা, অন্ন-পানীয়ে সে মূল্যহীন, অঞ্জনা !

—আমি না-হয় অলঙ্কার রূপেই ওকে ব্যবহার করবো।—এসো, চা খাও।

অঞ্জনা চাকরের হাত থেকে ট্রে নিয়ে চা তৈরী করলো ; দিল আলোককে। ওর বড় মেয়েটা খেলা করছিল, এতক্ষণে এসে বসল আলোকের কোলে ; বলল,

—মামা, খাব টা…

—খাও।— আলোক একটা বাটিতে ঢেলে খানিক দিল ওকে। অঞ্জনা বলল,

—আমি কাপড় বদলে আসি। ট্রামেই যাওয়া যাবে তো ?

—না, ট্যাক্সি করবো।— যা—কাপড় পর। বাবার মত্ নিয়ে আয়—

—বাবা অমত্ করবেন না— চলে গেল অঞ্জনা কাপড় পরতে।

অঞ্জনার মেয়েটা কোলে বসে চা খাচ্ছে আর কথা বলছে কত কি ! শিশুর মুখের আধো-উচ্চারিত অসংলগ্ন কথা চিরদিন মানুষকে আনন্দ

দিয়েছে। এই আধো-উচ্চারিত কথা, এই অর্দ্ধস্ফুট জ্ঞান একদিন পরিপূর্ণ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে পূর্ণত্বে—সেদিন এই শিশুর মধ্যেই কত ছলাকলা, কত কামনা-কলুষতা, কত কর্ম্ম আর ধর্ম্মসাধনার জাগরণ ঘটবে তার ইয়ত্তা নেই। আজকের এই নিষ্পাপ শিশুর আনন্দ-প্রতিমা ভবিষ্যতের কেমন মানবত্বে রূপ নেবে, কেউ জানে না। অথচ সকলেই জানে, এই শিশুর মন একদিন মননের জটিলতায় নিবিড় হয়ে উঠবে। অতি নিকটের নিত্য ঘটনা বলেই মানুষ অনুভব করেনা এই সত্য গভীরভাবে। আলোক ভাবছে···এই শিশু-জীবন হয়তো আগামী শতাব্দীর এক অতিমানবীয় যুগ-জীবন হবে। যে-ভাব, যে-চিন্তা আলোকদের আমলে আবিষ্কৃত হয়নি, এদের জীবনকালে সেইসব চিন্তা জগৎকে প্রভাবিত করবে—গঠন করবে নতুন এক পৃথিবী, কিম্বা হয়তো পৃথিবীর শেষ 'ইজ্‌ম্' এসে গেছে আলোকদের আমলেই। এবার অ্যাটম-বোমার ধ্বংস-শক্তির মধ্যে জাগরণ হবে এক মহাশান্তিময়-ইজ্‌ম্‌এর, যার অবাধ ক্রমোন্নয়নে থাকবে শুধু প্রকৃতির ধীব হস্ত—নির্ম্মম, নিখুঁৎ, নিশ্চিত পরিণাম!

আগামী সহস্রাব্দীর সেই পরিণামটা কল্পনা করতে গিয়ে আলোকের মস্তিষ্কে একটা 'প্লট' এসে গেল অকস্মাৎ। একটা বিশেষ ধরণের চিন্তাধারা, যার সম্পূর্ণ রূপ তখনো ও ধরতে পারছে না। এ যেন বহু-দূরবর্ত্তী পর্ব্বতচূড়া—কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু নির্ভুল। আর একটু পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলেই আলোক ঐ ছবিটা আঁকবে, ঠিক করলো। কোষগ্রন্থ-সংকলনে দীর্ঘদিন কেটেছে, বহুদিন সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বাইরে রয়েছে আলোক—আর একবার ঢুকবে নাকি ওখানে?—চিন্তাটা মনে আসতেই আলোক হেসে উঠলো।

—কি হোল, দাদা? আমি কিছু বেশী সাজসজ্জা করেছি নাকি?—অঞ্জনা এসে দাঁড়ালো কাছে।

—না। আগামী শতাব্দীতে এই মেয়েটার জীবন কিরকম জগতে এসে দাঁড়াবে, তাই কল্পনা করে হাসি পেল— আলোক হাসতে-হাসতেই জবাব দিল অঞ্জনাকে।

—আগামী শতাব্দীর দেরী আছে, দাদা! বৌদ্ধাব্দ আড়াই-হাজার, খৃষ্টাব্দ মাত্র উনিশশো-পঞ্চান্ন—ততদিনে ও বুড়ী হয়ে যাবে···

—বুড়ী হলেও দেখবে সে-যুগ—আর, থাকবে ওর তরুণ সন্তানদল! আগামী শতাব্দীতে জীবনের দেবতা হয়তো নিষ্করুণ মহারুদ্রের রূপে প্রতিভাত হবেন, হয়তো সে-জীবন হবে অতিমানবিক, কিম্বা পারমাণবিক—হয়তো, সেদিন সবাই হয়ে যাবে যান্ত্রিক—অথবা জৈব, কিম্বা জীবাঙ্কুর···

—যা-হয় হবে। চলো এখন— চাকরকে ডেকে অঞ্জনা মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলল।

ছোটটা ঝিব কোলে আছে। আলোক পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়েই বেরিয়ে এল।

—চল, রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নেব— বেরুলো দুজনে।

—ফোন করেছ?

—না, কি দরকার? উৎপলা বাড়ী না থাকে, ফিবে আসবো।

ষ্ট্যাণ্ডে এসে ট্যাক্সি চড়ে চললো ওরা। মোড়ের মাথায় প্রকাণ্ড হাউসে 'জরদ্গব' ছবির ভীড় চলছে। লম্বা লাইন দিয়েছে সব টিকিট কিনবার জন্য।

—এই ছবিটা একদিন দেখতে হবে, দাদা— অঞ্জনা বলল।

—তোর বরের সঙ্গে দেখবি গিয়ে।

—তোমার সঙ্গেই দেখতে হবে। ও বড় বাজে সমালোচনা করে।

—স্বামী-নিন্দা ভারতনারীর পক্ষে পাপ···

—হোক্‌গে! সত্যিকথা বলার পুণ্যে পাপটা কেটে যাবে— হাসল অঞ্জনা।

—চল, তাহলে আজকেই তোকে ছবিটা দেখিয়ে দিই।—এই ড্রাইভার, রোখো—

আলোক ট্যাক্সি থামিয়ে নামালো অঞ্জনাকে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে সটান এসে বেশী দামের টিকিট কিনে বসল দোতালার আসনে। অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে ছবিখানা ওর তরল হাসির আবেদনে। মানুষ যেন ভারী কিছু আর চিন্তা করতে চায় না—হালকা আমোদ, ইতর রসিকতা আর সস্তা গল্পই ওদের প্রিয় আজ। এর চেয়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পের যুগ হয়তো চিন্তাশীল ছিল—চেতনশীল ছিল আত্মানুসন্ধানে।

আলোক নিশ্চুপ বসে রইল সমস্ত সময়টা। অঞ্জনা ছবি শেষ হলে শুধোলো,

—কেমন লাগলো, দাদা?

—আমার কিছু লাগে না, অঞ্জনা—শুধু দেখি। এই যুগকে দু'চোখ ভরে দেখছি। আগামী যুগ দেখতে যদি বেঁচে থাকি তো দেখবো—আমি নিরপেক্ষ, নির্ব্বিকার!

—এই নিরপেক্ষ দর্শন দিয়ে তুমি একটা গল্প লেখ-না, দাদা—ভাল হবে।

—লিখতে গেলে পক্ষপাত এসে যেতে পারে, অঞ্জু! সাধারণ মানুষ তার সৃষ্টির উপর স্নেহশীল হতে বাধ্য।

—না, তুমি হবে না। যদি হও তো, আমি সেটা ধরিয়ে দেব। তোমার কাছে যে-শিক্ষা আমি পেয়েছি, তাতে ও-কাজ আমি করতে পারবো—বিশ্বাস কর তো?

—করি। কিন্তু কী হবে লিখে? দরদী মনের সৃষ্টিই মানুষের দরদ আকর্ষণ করে, অঞ্জনা!

—কিন্তু, আগামী যুগ হয়তো অনাসক্ত মনের সৃজন-শক্তিকেই অভিনন্দন দেবে।

—সে-দিন সত্যি বিশ্ব-সাহিত্য রচিত হবে, অঞ্জনা—যুগসাহিত্য সে-দিনই রূপ পাবে জগতে!

—এমন সাহিত্য কি হয়নি জগতে সৃষ্টি?

—হয়েছে। বাল্মীকির মন দরদী মন—সে সৃষ্টি প্রতি মানবের অন্তরে প্রত্যক্ষ বেদনার রস ঘনীভূত করে তোলে। কিন্তু ব্যাসের মন অনাসক্ত স্রষ্টার মন—সে-সৃষ্টির বিরাট বৈচিত্র্যে প্রত্যক্ষ দরদ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাল্মীকি সীতার পিতা, ব্যাস দ্রৌপদীর কেউ নন, শুধু স্রষ্টা; বাল্মীকির রাবণ প্রত্যক্ষ অভিশাপ, ব্যাসের দুর্য্যোধন অপ্রত্যক্ষ বিপ্লব; বাল্মীকির সৃষ্টিতে স্রষ্টা সর্ব্বত্র সহানুভূতি নিয়ে চলেছেন,—ব্যাসের সৃষ্টিতে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

—তাহলে রামায়ণকে তুমি ছোটো করছো?

—না, অঞ্জনা। আমার ছোট-বড় করবার কোনো অধিকার নেই। দুটিই মহান সৃষ্টি, দুটিই মানব-অন্তরের অপরিসীম ঐশ্বর্য্য। আমি শুধু দরদী সৃষ্টি আর অনাসক্ত সৃষ্টির তফাৎ দেখছি, ঠিক অনাসক্ত দ্রষ্টার মতই। রামায়ণ বা মহাভারত, কোনোটার উপরই আমার পক্ষপাতিত্ব নেই। আমি দেখছি, মহাভারতের যুগ অনাসক্তির যুগ। সঞ্জয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকলেই অনাসক্ত স্রষ্টা। এই সৃষ্টির যেন আবার প্রয়োজন হয়েছে পৃথিবীতে। নিস্পৃহ, মোহ-মমতাহীন হয়ে মানুষের জীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করার দরকার আজ। আজ চলেছে দরদহীন পৃথিবীতে মেকী সাহিত্যের কদর—জাতিতত্ত্বে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে একজাতিত্বের বাগ্মিতা-রূপ অশ্বডিম্ব—পঞ্চকল্যাণের পশ্চাতে পঞ্চাশৎ অকল্যাণের আস্ফালন! কিন্তু শিগগির হয়তো এমন একদিন আসবে, যেদিন নিরাসক্ত ঋষিদৃষ্টি মানুষকে

সত্যজ্ঞান দিয়ে দেখিয়ে দেবে—জীবন কী? জীবনের রুদ্রদেবতার কোথায় অবস্থান।

অঞ্জনা হাসিমুখে শুনছিল ; এতক্ষণে বলল,

—তুমি লেখ দাদা ঐরকম কিছু—

—লেখার আসক্তিটাই ওখানে বাধা, অঞ্জনা! দ্রষ্টা হলেই স্রষ্টা হয় না। স্রষ্টাকে এখানে অনাসক্ত হতে হবে।

—আমি জানি তুমি স্রষ্টা, এবং অনাসক্ত,—লেখ তুমি।

—তোর মধ্যে পৃথিবী-জননীর আবেদন শুনছি! আমি না লিখলেও হয়তো কোনো লেখক লিখবে সে সাহিত্য, যা হবে অনাসক্ত লেখনীর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

'জরদ্গব' ছবির অসাধারণ সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মিঃ সাহা নতুন একটা কিছু করবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। এই উদ্দেশ্যে উৎপলার বাড়ীতে চায়ের আসরে আলোচনা-সভা বসেছে তাঁদের। বিকাশ, বরুণ, মিঃ সাহা একদিকে আর উৎপলা একা অন্য দিকে। অপর কেউ উপস্থিত নেই ; কারণ এসব বৈষয়িক ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। বরুণ গল্প-লেখক হিসাবে বর্ত্তমানে দলের লোক, আর অন্য সকলেই কোম্পানীর অংশীদার। মিঃ ম্যাকু এখনো পৌঁছাননি।

—বর্ত্তমান জগৎ সিনেমার জগৎ ; যুগের চিন্তা আজ ওরই মাধ্যমে অভিব্যক্ত হচ্ছে।— বিকাশ বলল।

—যুগের চিন্তাকে অতো খাটো করে দেখতে ব্যথা বোধ করি আমি— উৎপলা বলল।

—তোমার ব্যথা-আনন্দে কিছু যায়-আসে না, উৎপলা! কথাটা সত্যি।— বিকাশের কণ্ঠ দৃঢ়।

—না— উৎপলার স্বর দৃঢ়তর— সত্যি নয়। যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দ সিনেমা দেখে যোগসাধনা করেন নি। বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সিনেমা দেখে প্রভাবিত হন নি। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়ক শ্রীনেহেরু বা স্যার রাধাকৃষ্ণন্ তোমাদের সিনেমার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হন—এই কথা তুমি বলতে চাও?

—না, আমি জনসাধারণের কথা বলছি।

—জনসাধারণের একটা অপরিণামদর্শী অংশ তোমাদের সিনেমা-শিল্পের ক্রীতদাস। তাদের বিলাস-বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে তোমরা দু'পয়সা করে খাচ্ছ—এই মাত্র সিনেমার দাম। এর জন্য এত বাড়াবাড়ি প্রশংসা করার কি দরকার!— হাসলো উৎপলা; বলল,—সিনেমা-শিল্প বিকৃত জীবনের ছায়া—জৈবধর্মের প্রকাশ মাত্র। ও দিয়ে ব্যবসা হয়, টাকা রোজগার হয়, আর কতকগুলো তরুণ-তরুণীর জীবন জ্বালাময় করে তোলা হয়। সুস্থ-সুন্দর মানবত্ব দিয়ে 'সিনেমা' হচ্ছে না—হচ্ছে, জীবনের বিকৃতি দিয়ে, না-হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দিয়ে।

—সিনেমায় কি মানবতার আবেদন থাকেনা বলছো?— বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—থাকতে দাও কোথায়? 'জরদ্গব' পয়সা আনে, 'জ্বলদর্চ্চি' হয়তো হতাশ করবে তোমাদের। মানুষের ক্লান্ত মনকে আড়াই ঘণ্টার মেকী আনন্দে মশগুল রাখ তোমরা ছবির জৈব নেশায়—জীবনের ধ্যান তাতে থাকে কতটুকু? যা-বা থাকে, তাও বিকৃত জীবন—অসত্য জীবন, অবাস্তব, না-হয় অতিবাস্তব জীবন। একে যুগের চিন্তা বলে চালাতে যাওয়া মিথ্যার উপাসনা।

চা ঢেলে দিল উৎপলা সকলকে। ওর কথার স্ফুলিঙ্গ যেন বিদ্ধ করছে শ্রোতাদের। কী যে চাইছে উৎপলা, ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। বরুণ বলল,

—মানবতার আবেদন যাতে আছে, এমন গল্প কি আপনার পছন্দ হবে?

—কে লিখবে সে গল্প? ভুয়ো, মেকী মানবতার গল্প আমি চাই না। বক্তৃতা-সার কতকগুলো চরিত্র, সেবা-সঙ্ঘ আর চাঁদা-আদায়ের খাতা দেখিয়ে মানবতা কোটানো যায় না,—পথের পাশের ভিক্ষুককে পয়সা-দেওয়া দেখিয়েও না,—নিরাশ্রয়া অবলাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সিনেমার জাহান্নমে ঠেলে দেওয়াতেও না…

—কিসে ফোটে তাহলে?— প্রশ্নটা করলো বিকাশ; প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে কণ্ঠে তার।

—কিসে ফোটে, আমি জানি না। তবে ওগুলোতে ফোটে না, এটা নিশ্চয়।— উৎপলা সংযত কণ্ঠেই বলল,— কিসে হয় তা জানেন শিল্পী, সাহিত্যিক, স্রষ্টা—স্রষ্টা যিনি জীবনের—এবং শিল্পের…

—আলোক হয়তো এর জবাব দিতে পারে। সেদিন দীপ্তি দেবীর চায়ের আসরে কথাটা উঠলে, তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারতো! কি বল?— সুস্পষ্ট বিদ্রূপ এবার বিকাশের ভাষায়।

—আমাদের পরিচিতের পরিধিতে যদি কেউ এর জবাব দিতে পারে, তাহলে আলোকই সেই ব্যক্তি, বিকাশ! তাকে বিদ্রূপ করে ছোট করা যায় না। সে যে তোমার থেকে অনেক বড় তা তোমার ঈর্ষাই প্রকাশ করে দিচ্ছে। দীর্ঘকাল তাকে দেখিনি আমরা, তোমার মুখে তার নামও শোনা যায়নি—আজ হঠাৎ তার কথা কেন তুললে?

—তোমার মনে তার ঠাঁই কোথায় তাই জানবার জন্য।— বিকাশ হাসছে।

—তোমাকে বহুদিন পূর্ব্বেই জানিয়েছি, আলোককে আমি ভালবাসি। সে ভালবাসার মহিমা তুমি বুঝবে না বলে, তোমাকে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। শুধু জেনে রাখ, আলোকের অসম্মান আমি সহ্য করবো না··· উৎপলার কণ্ঠ সতেজ।

—যাক্, যাক্—যেতে দিন, যেতে দিন— মিঃ সাহা থামাতে চাইলেন— আলোকবাবু সত্যি অসাধারণ ব্যক্তি, এ সত্য আমি একমুহূর্ত্তে বুঝেছিলাম। আপনি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকেন, উৎপলা দেবী, তাহলে নিশ্চয় আপনার প্রেম অপাত্রে অর্পিত হয়নি।

—অর্পণ আমি কিছু করিনি, মিঃ সাহা, আমার ভালবাসা আমার নিজের জন্যই। সূর্য্যকে আমরা কী দিতে পারি? তাকে ভালবাসা আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য—আমার জীবনে আলোক সেই সূর্য্য! এ সত্য বিকাশ জানে, আজ আপনারাও জানলেন।

—কথাটা আমিও জানতাম— মিঃ ম্যাকু কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন; বললেন।

—আপনি জানতেন! আপনি তো মানব-চরিত্রের রিরংসার দিকটাই দেখতে জানেন! মানুষ যে সুস্থ-সুন্দর প্রেমের গৌরব বহন করে, এ সত্য আপনার জানার কথা নয়। মিঃ ম্যাকু, আপনারই কদর্য্য সন্দেহ থেকে আমাকে মুক্ত করতে আলোক চলে গেছে, জানেন? আলোকের-আমার সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা কুৎসা আপনার মনঃকল্পিত কদর্য্যতা!

কথার উষ্মা উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। আলোচনা-সভা আঘাত-প্রতিঘাতের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠছে। উৎপলা কাউকে খাতির ক'রে কথা কোনোদিন বলে না। আজও বলবে না, এ জানা কথা। মিঃ সাহা বিজ্ঞ এবং বয়স্ক; সব দিক বজায় রেখে বললেন,

—এসব ব্যাপার ব্যক্তিগত। আমাদের এখানেই থামা উচিত, পলা দেবী! আমি প্রস্তাব করি, আলোকবাবুকে আহ্বান করে তাঁর পরামর্শ আমরা গ্রহণ করবো।

—আহ্বান আপনারা করতে পারেন, আসবেন কিনা, তিনি জানেন— উৎপলা বলল আস্তে।

মিঃ ম্যাকুর অপমান-বোধ অত্যন্ত কম; কিম্বা বোধ থাকলেও বহিঃপ্রকাশ নেই। উৎপলার কথাটাকে লুফে নিয়ে দন্তহীন মুখের হাসি ফুটিয়ে চীৎকার করলেন,

—নিশ্চয় আসবেন। আমি গিয়ে ডেকে আনবো। আপনি ঠিকানাটা দিন—

—ঠিকানা জানি না আমি— উৎপলা চায়ের বাটি এগিয়ে দিল মিঃ ম্যাকুকে।

—সেকি! সেদিন অতক্ষণ কথা বললেন তাঁর সঙ্গে ?

—না। আলোকের সঙ্গে কোনো কথা কইনি আমি। এমনকি ওর সঙ্গিনীর সঙ্গেও না। শুধু করবীর কথায় জানলাম, মেয়েটির নাম অঞ্জনা। আলোকের বোন।

—খুবই শিক্ষিতা মেয়ে মনে হোল— বরুণ বলল।

—আলোকের বোন হতে হলে ওর কমে হয় না, বরুণবাবু··· উৎপলা হেসে বলল।

—কিন্তু, বোন ভাইএর যোগ্যা হয়ে নাও জন্মাতে পারে, পলাদি !— বরুণ হাসল।

—এইজন্যই ঈশ্বর ওকে সহোদরা দেননি। ও-বোন পাতানো বোন।

—পাতানো! তাহলে বান্ধবী বলুন — বরুণের চোখে বিদ্রূপের আমেজ।

—না— উৎপলা যেন গর্জ্জন করলো— আলোকের বোন পাতানো হলেও বোন। যে তাকে দাদা বলবে—তার বোন হবার যোগ্যতা থাকতে হবে, বান্ধবী হবার নয়। অবশ্য, বোন বান্ধবীও—কিন্তু আগে বোন, তারপর বান্ধবী। আপনি আলোককে চেনেন না, বরুণবাবু! তার সান্নিধ্য পেলে আপনার সাহিত্য-জীবন সুন্দরতর হতে পারে,—পারেন তো আলাপ করবেন।— শেষের দিকে উৎপলার স্বর স্নেহমণ্ডিত।

—তাহলে ঠিকানার কি হবে?— মিঃ ম্যাকুর যেন সর্ব্বনাশ হয়েছে, এমনি ভাব।

—কিছু না,—দীপ্তি দেবীকে ফোন করলেই হবে। করবীও বলে দিতে পারে ঠিকানা।

—তাহলে আমি এখুনি দেখি··· বলেই মিঃ ম্যাকু চলে গেলেন ফোন করতে।

উৎপলা হাসলো ওর যাওয়ার পানে তাকিয়ে। বরুণ বলল,

—মানুষ যা চায়, আমাদের সেই রকম ছবি পরিবেশন করতে হয়, পলাদি···

—মানুষ কী চায়, আপনি ঠিক জানেন না। পোলাও না পেলে, পোড়া মুড়িতে সে পেট ভরায়! আবার, পোড়া মুড়ি পোলাওএর থেকে ভালবাসে, এমন বিকৃত-রুচির লোকও আছে পৃথিবীতে। এই মানুষই একদিন বেদ-উপনিষদ-ব্রহ্মবিদ্যা-পরাবিদ্যা চেয়েছে, আজও এই মানুষ বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ পায়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে, আত্মতত্ত্ব অধিগত করে, আবার 'জরদ্গবের' মত ভাঁড়ামীর ছবি দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে—পকেট খালি করে পয়সা ঢালে। কিন্তু চায় সে কী, তা এতে জানা যায় না—

—আপনি কী দিতে চান তাদের?— মিঃ সাহা প্রশ্ন করলেন এবার।

—ঐ আড়াই ঘণ্টায় বিশেষ কিছু দেওয়া যায় না। পর পর কয়েকটা ছবি যদি তৈরী করা যায়, তাহলে হয়তো জীবনের সুরভিত অর্ঘ্য ওদের দান করা যেতে পারে। মানবত্ববোধের নীতিকথা নয়, মানবজীবনের সাবলীল সত্যরূপ—যা প্রেমে মহান, ক্ষমায় সুন্দর; লোভে-পাপে পথভ্রষ্ট হলেও, কুন্তীর মত জননী, কর্ণের মত করুণাময়, রাবণের মত প্রতাপশালী, রামের মত বীর্য্যবান দুর্য্যোধনের মত আত্মমর্য্যাদাশীল,—যার জীবন নীতির বক্তৃতায় নয়, জীবনের নিত্য দিনে বিকশিত হয় শতদলের মত—যার গন্ধ যুগের পর যুগ বিস্তৃত হয়ে চলে, যার আবেদন অন্তহীন কালে অনশ্বর···

উৎপলা আরো বলতো, কিন্তু অকস্মাৎ নিজেকে সংযত করে নিল। ওর কথা-বলার ভঙ্গী আলোকের কাছে শেখা। যখন কথা বলে, নিজেকে যেন ঢেলে দেয় কথার মধ্যে। তাই ওর বলার ভঙ্গী সকলের ভাল লাগে। কিন্তু মিঃ ম্যাকু ফিরে আসছেন হাসিমুখে; বললেন,

—ঠিকানা পেলাম আলোকের। ও তো সেখানে প্রুফ-রিডারের কাজ করে—অতি সামান্য বেতন পায়। খাওয়া, থাকা আর যৎকিঞ্চিৎ হাত-খরচ। ওকে ডেকে আনা কঠিন কি?

—পয়সার মাপকাঠিতে অবশ্য কথাটা সত্যি— উৎপলা বলল,— বেশ, ডেকে আনবেন! কিন্তু মিঃ ম্যাকু, আপনি আলোক সম্বন্ধে অত হীন ধারণা পোষণ করেন কেন? বনের বাঘ উপোস থাকে, তবু সে বাঘ—চিড়িয়াখানায় তাকে ডেকে আনা যায় না দৈনিক মাংসের বরাদ্দ দেখিয়ে। আলোক মাত্র প্রুফ-রিডার—এ কথা বলতে আপনার লজ্জা করলো না! মানুষকে সম্মান করবেন— উৎপলা উপদেশ দিল।

—না—না, আই মিন্— মিঃ ম্যাকু আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইছেন, —আমি কথাটা কিছু ভেবে বলিনি···ওখানে করবী নামে সেই মেয়েটি

বললেন আমাকে—বললেন যে, অঞ্জনার বাবার কোষগ্রন্থ ছাপার কাজে সাহায্য করেন আলোকবাবু…

—হ্যাঁ, হয়তো করেন—তাতে তাঁকে অশ্রদ্ধা করবার কি আছে? প্রুফ-রিডাররাও মানুষ। আর আলোক যে কাজে সাহায্য করে, সে কাজ তার যোগ্য কাজ নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তা তো বটেই— মিঃ ম্যাকু দন্তহীন হাসি দিয়ে নিজেকে ঢাকলেন।— আমি আজ-ই যাব সন্ধ্যায় ওখানে;—কালই ওকে ধরে আনবো এখানে।

—যাবেন— উৎপলা আর কিছু না বলে আর একবাপ ক'রে চা দিল সকলকে।

অতঃপর ঠিক হোল যে, আগামী কালও আবার আলোচনা হবে। 'জরদ্গব' বহু টাকা এনেছে, তাই এবার মহান একটা কিছু করবার জন্য এঁদের চেষ্টা। কিন্তু ঐ সঙ্গে সাধারণ কিছুও করতে হবে, নইলে ব্যবসা চলে না—তাই মিঃ সাহা বরুণকে হাতে রেখেছেন। বরুণ হালকা হাসির গল্প ভালই লিখতে পারে, যদিও সে গল্প বিদেশী গল্পের চুরি; কিন্তু বাজারে চললেই মিঃ সাহা খুসী।

মিঃ সাহা, ফাইন্যান্সএ আট্‌কে গেলেই, উৎপলার কাছে টাকা ধার করেন; কাজেই তাঁর সিনেমা-শিল্পে উৎপলার সমর্থন অত্যাবশ্যক। তাছাড়া ভেতরে আরো গভীর যোগ আছে ব্যবসার, যা সাধারণের জানার কথা নয়। তাই উৎপলার মতের এত মূল্য মিঃ সাহার কাছে। নইলে তিনি যা মনে হয়, করতেন। একটু ভেবে বললেন,

—আমার ইচ্ছে একটা 'জুভেনাইল ছবি'ও করি আমরা—

—ভাল করে একটাই করুন, যাতে শিশু-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই আনন্দ হয়— উৎপলা বলল।

সবাই উঠছে—গেটে একখানা গাড়ী দেখে থামলো সব। নামলো সাধু সিদ্ধেশ্বর আর গেরুয়াধারিণী নির্ম্মলা। নির্ম্মলাকে এরা কেউ চেনে না। উৎপলা হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো।

—আসুন, আসুন! কবে এলেন কলকাতায়?

—কাল। ইনিই উৎপলা দেবী, নির্ম্মলা, বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ের কর্ত্রী।

—কর্ত্রী নই, সাধুজী— উৎপলা সহাস্যে প্রতিবাদ করলো,—কর্ত্তা তিনিই, যাকে আমি জানি না—আপনি যাঁর ধ্যান করেন, আর এই বিশ্বচরাচর যাঁর নাম-গান করে···বসুন!

—বড় সুন্দর বল:লন তো!— নির্ম্মলা হেসে হাত ধরলো উৎপলার।

—বলাটা আমার সুন্দর হয়, ভাই—করাটা অমন সুন্দর হয় কৈ? তাহলে তো বেঁচে যেতাম!

—শুনলাম, বহু ভাল কাজ করেন আপনি?

—একটিও না। ভাল কাজ করার ভান করি। আমি জানি যে ভান করছি, এই আমার গৌরব।—আপনি কোথায় থাকেন, নির্ম্মলা দেবী? কলকাতায়?

—না। ছিলাম বাংলার বাইরে একটা আশ্রমে। ওখানে থাকার অসুবিধা হোল, তাই চলে এলাম। আবার কোথায় যাব, ভাবছি।

—কতদিন গৃহ ছেড়েছেন?

—গৃহ বলতে যা বোঝায় তা কোনোদিন ছিল না। একখানা বাড়ী অবশ্য আমার আছে টালিগঞ্জে, তবে সেটা একজন দান করেছেন আমায়। আপাততঃ তার আয়েই খাই আর বেড়াই এখানে-সেখানে। সিধুদা এলেন, তাই আমিও বললাম—চলো, দেখা করে আসি—

—বেশ বেশ—খুব ভাল করেছেন। ইনি বুঝি আপনার গুরুভাই?

—হ্যাঁ। তবে গুরুভাই বললে যথেষ্ট বলা হয় না। আমি ওঁর শিষ্যারই মতন—এমনকি অনেকে ওঁর শিষ্যা বলেই জানেন আমায়।

মিঃ সাহা জোড়হাতে নমস্কার করেছেন সিধুকে। এতক্ষণে বললেন,

—আমাদের 'জরদ্গব'-মুক্তির দিনে আপনার চরণ-দর্শন করেছিলাম। আজ আবার সেই সৌভাগ্য হোল। একদিন দীনের বাড়ীতে পদার্পণ করতে হবে!

—আমাকে আপনার বাড়ী যেতে বলছেন? বেশ তো, যাব। কেন বলুন তো?

—কোনো কারণ নাই এমন। শুধু আপনার পবিত্র স্পর্শ পাবে বাড়ীখানা। আমি সিনেমা চালাই—অকাজ-কুকাজ অনেক করেছি জীবনে; কিন্তু আপনারা—যাঁরা সত্যি বড়, সত্যি মহান, সত্যকার সতী আর সত্যকার সাধিকা—তাঁদের চরণে আমি সব সময় প্রণতি জানাই। অবন্তী দেবীকে আমি মূর্ত্তিমতী 'সতী' মনে করি। আমি শুনেছি, আপনি তাঁর আত্মীয়—তিনি তো এখন পরম শুভব্রত নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন!

মিঃ ম্যাকু এতক্ষণ কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। এবার বাগ পেয়ে বললেন,

—অবন্তী! আহা-হা—দেবী দ্রৌপদী একেবারে!

সবাই হেসে উঠলো কথাটা শুনে। মিঃ ম্যাকু তৎক্ষণাৎ বললেন,

—আই মিন্ বৃহন্নলা—বৃহন্নলা···

আর একচোট হাসির উচ্ছ্বাস জাগলো সকলের। শুধু সিদ্ধেশ্বর হাসেনি। চুল-দাড়ীর আড়ালে মুখখানা ঢেকেই রেখেছে। বলল,

—অবন্তী···অবন্তী-ই; প্রাচীন এক নগরীর নাম—যার কথা ইতিহাসের পাতায় অশ্রুর অক্ষরে পড়া যায়। অবন্তী পুরাতত্ত্বের বস্তু! ওকে আর টানবেন না এখানে।

একি দরদ! একি সীমাহীন স্নেহতরঙ্গ! উৎপলা অকস্মাৎ যেন বিহ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলো উৎপলা। কে জানে

অবন্তীর সঙ্গে এই সাধুর সম্পর্কের কথা এরা কেউ সম্যক জানে কিনা। কিন্তু নিজেকে বাইরে সংযত করলেও অন্তরের অভ্যন্তরে উৎপলার নারী-হৃদয় যেন ক্রন্দন জুড়েছে। মনে হচ্ছে, অবন্তীর কিছু না-থাকলেও সব আছে—আছে অপার্থিব প্রেমপূত এক মানবহৃদয়। আর কী চাই! উৎপলার সব থেকেও কিছু নেই। উৎপলা চিরবঞ্চিতা। অগাধ ঐশ্বর্য্যের মাঝে উৎপলা পঙ্কশায়িনী—পূজার অর্ঘ্য হবার যোগ্যতা-হারানো ভূপতিত মলিন পুষ্প!

কিন্তু এত চিন্তা অন্তরতলে অবরুদ্ধ করে উৎপলা সিধু আর নির্মলাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, বাকী সকলকে বিদায় দিয়ে। নিজের নিভৃত কক্ষে সিদ্ধেশ্বরকে বসিয়ে উৎপলা নতজানু হয়ে প্রণাম করলো।

—প্রণাম কেন?— হাসলো সিধু কথাটা বলে।

—প্রণাম আপনার সাধুত্বকে নয়; আপনার সুমহান প্রেমকে প্রণাম করি।— হাসলো উৎপলা···

সুরভিত বায়ুতে শ্বাস নিতে নিতে ঘুমিয়ে গেল সীমা। ট্রেনের রাত্রি-জাগরণ, মানসিক ক্লান্তি আর দিনের শারীরিক পরিশ্রম সব মিলে ওকে নিবিড় ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখলো। ঘুম ভাঙতেই দেখলো, সকাল।

তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্যটা সমাধা করেই সীমা বেরিয়ে পড়বে। এখানে ওর আর থাকবার ইচ্ছে নেই। কলকাতায় ফিরে ছেলেটার খোঁজ করবার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করবে, তাই ভাবছিল সীমা। ওর পরিচিতা মেয়ে-দুটি স্নানাদি করে এসে বললো,

—সকালের প্রার্থনায় যোগ দেবে[redacted]

—না ভাই, আমার সময় হবে না।[redacted]এখুনি যেতে হবে।—সীমা জবাব দিল।

—যেতে হবে!— ওরা পরস্পরের মুখপানে চাইছে হাসিমুখেই। একজন বলল,

—যেতে হবে? কোথায় যেতে হবে? এখানে যে থাকবেন বলছিলেন?

—না, থাকা চলবে না। যে কাজের জন্য এসেছিলাম, তা যখন হোল না, তখন থাকবো আর কি জন্যে?— সীমা স্নান করতে চলে গেল একা।

ফিরে দেখলো, ঘরে কেউ নেই। সবাই প্রার্থনা করতে গেছে তাহলে। সীমা কাপড়-জামা প'রে, তার স্যুটকেস আর বেডিং নিয়ে বেরুলো বাইরে। ফলের চুপড়ীটা এখানেই দান করেছে সে। গেটে আসতেই দেখল, দুজন গেরুয়াধারী দরজা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে। সীমা বলল,

—গেট খুলুন, আমাকে যেতে হবে—

—আপনি নির্ম্মলার ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন, বলেছিলেন যে?—সবিনয়ে ওকে জানালো সন্ন্যাসীদের একজন।

—না, আমি আজই কলকাতা চলে যাব— সীমা বলল।

—তা কি করে হবে? আপনি একলা—এভাবে তো যাওয়া হবেনা আপনার!

—আমাকে যেতেই হবে। আমি একা আসা-যাওয়া করি। ঘরের কনে' বৌ নই আমি। গেট খুলে দিন।

—না, আপনি এখন যেতে পারবেন না।

—কারণ?— সীমার কণ্ঠে ক্রোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ।

—'কারণ' আমরা জানি না। আপনি ঐ অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

সীমা ওদের আর কিছু না বলে ফিরে এল 'অফিস' নাম-দেওয়া একটা পাকাঘরে। সেখানেও দুজন সন্ন্যাসীবেশী যুবক। সীমা বলল,

—আমাকে সকালের 'ডাউন' ধরে কলকাতা যেতে হবে। গেট খুলিয়ে দিন—

—তা হয় না। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন না-জানা পর্য্যন্ত আপনাকে ছাড়া হবে না।— বললেন এক সন্ন্যাসী।

—মানে? আমাকে আপনারা আটকে রাখবেন!

—হাঁ, যতক্ষণ আপনার সব-কিছু না-জানা যাচ্ছে। কারণ আপনি মহিলা—হয়তো রাগ করে চলে এসেছেন, কিম্বা অন্যকিছু—যান, ঘরে বসুন-গে। নির্ম্মলা ফিরে আসুক।

—আমার উপর কিসের সন্দেহ আপনাদের?

—সন্দেহ নানা কারণে ঘটে। আপনি সুন্দরী। অল্প-বয়সী। অলঙ্কার, অর্থ আছে সঙ্গে। আপনাকে আমরা একা ছেড়ে দিয়ে বিপন্না করতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের কেউ আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবে। আপনার নিরাপত্তা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

—আমার মনে হচ্ছে, আমি এখানেই নিরাপদ নই।— সীমা সরোষে বলল।

—আপনার যা-খুসী মনে হতে পারে। আপনি যখন আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছেন, তখন আপনার ভাল-মন্দের ভার এখন আমাদের, অর্থাৎ আশ্রমের সকলের। এই আশ্রম জগৎ-কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। এখানে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনার বান্ধবী নির্ম্মলা দেবী এখানে থাকেন। একটা জরুরী কাজে তিনি

কলকাতা গেছেন। তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরবেন। যান, ঘরে যান আপনার—

—আপনারা যেতে দেবেন না আমায়?—সীমা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

—না—গম্ভীর গলায় বললেন সন্ন্যাসী,—নির্ম্মলা না-আসা পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে যেতে চান তো, পুলিশের হাতে দেব আপনাকে। তাঁরা আপনার সম্বন্ধে যা ভাল বোঝেন, করবেন।

—বেশ, ডাকুন আপনি পুলিশ। আমি যাবই। দেখি, কী কবতে পারেন! আর জানবেন, আমি বড সহজ মেয়ে নই—এমন অনেক মেকী আশ্রম দেখা আছে আমার··· সীমা ক্রোধে ফুলছে কথা বলতে বলতে।

—বেশ তো। এটাও দেখুন তাহলে— নীরসকণ্ঠে বললেন সাধুজী।

সীমার পরিচিতা সেই মেয়ে-দুটির একটিকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন,

—এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও তো, শর্ম্মী · বড় রেগে উঠেছেন উনি।

শর্ম্মিষ্ঠা নামে সেই মেয়েটি এসে হাত ধবল সীমার; বলল,

—আসুন। নির্ম্মলাদি এলে, দেখা করে তারপর যাবেন। তাডা কি?

—থাক্, আপনাকে দরদ দেখাতে হবে না—সীমা টেনে নিল হাতখানা।

—দরদ আমাদেব নেই। আমরা মায়া-মোহ-মুক্ত সন্ন্যাসিনী—বলল শর্ম্মিষ্ঠা।

—তা জানি। বালিশের তলায় 'বিশুদ্ধ উপন্যাস' দেখে বুঝেছি—সীমা বিদ্রূপ করল।

—দেখেছেন নাকি ?— হেসে দিল শর্ম্মিষ্ঠা— আরো দু'এক দিন থাকলে পরিশুদ্ধ আসন-প্রাণায়ামও দেখতে পাবেন। চলে আসুন, অনর্থক কথা বাড়াবেন না।

সীমার হাতখানা যেন জোর করে ধরে টান দিল শর্ম্মিষ্ঠা। সীমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে। কিন্তু কী সে করবে এখানে! বলল,

—আপনাদের গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।

—তাঁর সঙ্গে যখন-তখন দেখা হয় না— শর্ম্মিষ্ঠাই জবাব দিয়ে সীমাকে টেনে নিয়ে চললো। সীমার হাতে সুটকেসটা রয়েছে, বেডিংটা পড়ে রইল ওখানেই। ক্রোধে-ক্ষোভে আত্মজ্ঞান-হারা সীমা যেন যন্ত্রচালিতবৎ খানিকটা গিয়ে থামলো...

—চলে আসুন, সীমা দেবী! এ আশ্রমে রাত্রিবাস করলে কেউ আর এখানে দীক্ষা না-নিয়ে ফিরে যেতে পারেন না, বিশেষ তিনি যদি নারী এবং যুবতী হন। নির্ম্মলাদি জানেন এ তত্ত্ব। আমরাও জানছি ভাল করে। চলুন, কোনো উপায় নেই এখন আর!— হাসছে শর্ম্মিষ্ঠা।

—তুমি তাহলে এদের সহযোগী ?— সীমা সক্রোধে শুধালো।

—আমি শিষ্যা, অতএব সহযোগী। কিন্তু আপনি অতখানি ঘাবড়াচ্ছেন কেন! এখানে সত্যি ধর্ম্মসাধনা হয়। অনন্ত বিশ্ব জুড়ে যে নাদব্রহ্ম রয়েছেন—জগৎপ্রপঞ্চের যে ধ্বনিব্রহ্ম, আপনাকে আজই সেটা শুনিয়ে দেবেন আমাদের শ্রীগুরুদেব। দেখবেন, জীবনে কী অসীম তৃপ্তি পাবেন!

—জোর করেই দীক্ষা দেওয়া হয় এখানে ?

—না। তবে বিকারী রোগীকে জোর করেই ওষুধ খাওয়াতে হয়। যদি স্বেচ্ছায় আপনি না দীক্ষা নেন তো, কী আর করা যাবে! সদ্‌গুরুরা পাপী-তাপীকে তরাবার জন্য এরকম করে থাকেন।— হাসছে শর্ম্মিষ্ঠা।

আশ্চর্য্য হয়ে সীমা ভাবতে লাগলো—এই শর্ম্মিষ্ঠার বয়স বড়জোর পঁচিশ বছর হবে। সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। কথাবার্ত্তায় মনে হয়, যথেষ্ট শিক্ষিতা। সে কেন এখানে এভাবে আত্মসমর্পণ করেছে! আর, কেনই-বা সীমাকে এখানে রাখবার জন্য এদের সাহায্য করছে? কিছুই ঠিক করতে পারলো না সীমা। চেয়ে দেখলো, বিরাট এই আশ্রমের প্রায় মধ্যবিন্দুতে সে রয়েছে। বৃক্ষলতার বেষ্টনীতে বড় রাস্তা তো দেখা যায়ই না—কোনোখানে কোনো বসতবাড়ীও ওর চোখে পড়ল না। চীৎকার করলে কোনো ফল হবার সম্ভাবনা নেই। অবস্থা বুঝে সীমা নিঃশব্দে অনুগমন করলো শর্ম্মিষ্ঠার। শর্ম্মী বলল,

—আপনার সম্বন্ধে প্রায় সবই আমাদের জানা হয়ে গেছে, সীমা দেবী! আপনি পরলোকগত জাষ্টিস স্যার চন্দ্রচূড় ঘোষালের দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর কন্যা। আপনার বাবা আপনার জন্য একলক্ষ টাকা আর দুখানা বাড়ী রেখে গেছেন। একটায় আপনি থাকেন, অন্যটা ভাড়া খাটে। আপনার বৈমাত্রেয় ভাই হাইকোর্টের বড় অ্যাডভোকেট। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। জীবনে আপনি বিপন্না হয়ে কিছুদিন আত্মগোপন, মানে 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে' বাস করেছিলেন। সে বিপদ অবশ্য সামাজিক। খালাস হয়ে আবার সমাজে এসে বাস করছেন। লোকে জানে, আপনি বিলেত গিয়েছিলেন পড়তে···এসব জানা হয়ে গেছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

—এসব খবর কোথায় শুনলেন আপনি?—সীমা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

—আপনি আসার পরই আমাদের কলকাতা আশ্রমে 'টেলি' পাঠান হয়। সেখান থেকে সব সন্ধান নিয়ে সকালে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন।

—তিনি এত শিগ্রি এত খবর কি করে জানলেন?—সীমা নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন করল।

—আপনার সম্বন্ধে খবর জানা খুব সহজ। আপনি বিখ্যাত লোকের কন্যা, আপনি সমাজ-সেবিকা; 'যুগনারী'র লেখিকা, নিজেও একজন যুগনারী।

হাসির উচ্ছ্বাসে বিশ্ব বিদীর্ণ করে দিচ্ছে শর্ম্মিষ্ঠা যেন! বলল,

—আপনার সেই তরুণ বন্ধুটি কি খুব সুন্দর ছিলেন? নাকি ভাল গাইতে পারতেন, অথবা আরো অনেক গুণ ছিল তাঁর?···

সীমা জবাব দিল না। একটা নিমগাছের ছায়ায় ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুরন্ত গ্রীষ্মে জল খুঁজে ফিরছে কাঠবিড়ালী, দেখলো সীমা; অনুভব করলো, ঐ কাঠবিড়ালীর যে ক্ষমতা আছে, সীমার এখন তাও নেই। সে বন্দিনী। কিন্তু সীমা ঠিক বুঝতে পারছে না, কেন তাকে বন্দী করা হচ্ছে!

—আমাকে আট্‌কাবার উদ্দেশ্য কি, শর্ম্মিষ্ঠা? আমার দাদা বৈমাত্রেয় হলেও, আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। তিনি আমার সন্ধান করতে ত্রুটি করবেন না; আর আমি যে এইদিকে এসেছি, তা অনেকেই জানে।

—জানে, তাতে কি? আপনাকে তো ধরে রাখা হবে না। আপনি শুধু এখানে আশ্রয় নেবেন শিষ্যত্বের—ব্যস্, আপনার তন্-মন-ধন সবই তখন এদের হবে। ইহকাল এবং পরকাল একসঙ্গে এখানে বাঁধা পড়ে!

—কিন্তু আমি যদি তা না চাই?

—না চাইবার কোনো কারণ নেই। আর, করবেন কি আপনি, সীমা দেবী! বিয়ে আর আপনার হওয়া সম্ভব নয়। যদিই-বা হয় তো, সসম্মানে হবে না। কারণ, অনেকেই আপনার বিষয়ে নানা কথা বলে। টাকা আপনার আছে, তা দিয়ে আরামে বাস করতে পারেন। কিন্তু একা। শুধু প্রবন্ধ লিখে বা জনসেবা করে মানুষ বেশীদিন টিঁকতে পারে না। অন্ততঃ আপনার মত বিলাসী মেয়েরা পারে না। এখানে থাকুন, কোনো অসুবিধা হবে না—সবই এখানে ভাল। কিছু টাকা আশ্রমে

দান করলে আপনার সম্মান হবে রাণীর মত। সবাই খাতির-যত্ন করবে। সকলের গুরু-বোন হয়ে দিব্যি থাকবেন। আসুন, রোদ লাগছে।

—নির্ম্মলাদি কতদিন আছেন এখানে?— চলতে চলতে শুধোলো সীমা।

—তা প্রায় অনেকদিন। তাঁকে এনেছিলেন তাঁরই একজন গুরুভাই। অবশ্য গুরুভাইটি ভেতরে ভেতরে এখানকার লোক, নির্ম্মলাদি জানতেন না। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ওঁদের গুরুদেব কর্ণবিজয় না বর্ণচোরা, কী যেন নাম তাঁর, হিমালয়ে চলে গেছেন। নির্ম্মলাদি নিরাশ্রয়া হয়ে গুরুভাইটির সঙ্গে এখানে এসে পড়েন।— একটু থেমে শর্ম্মিষ্ঠা আবার বলল,— প্রথম প্রথম নির্ম্মলাদিও খুব চোটপাট দেখাতেন এখানে। তারপর সাধনভজন পেয়ে বেশ আছেন। মাসে মাসে, পঁয়ত্রিশ টাকা আসে ওঁর নামে কোত্থেকে যেন—সবই আশ্রম পায়।

—কলকাতা কেন গেল সে হঠাৎ?

—গুরুদেব পাঠিয়েছেন একটা বিশেষ কাজে।— হাসলো শর্ম্মিষ্ঠা।

—কি এমন বিশেষ কাজ?

—সে-সব আমাদের জানার কথা নয়, তবে আমি কিঞ্চিৎ জানি। কাজটা হচ্ছে—খুব নাম-করা এক ডাক্তার, বহু টাকার মালিক, অকস্মাৎ পত্নী-পুত্র হারিয়ে এমন মানসিক অবস্থায় এসেছেন যে, যথাসর্ব্বস্ব কোনো সদ্‌গুরুর সিদ্ধ-আশ্রমে দান করে সন্ন্যাস নিতে চান। নির্ম্মলাদিকে তিনি চেনেন, তাই চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে এখানকার ভিতরের খবর জানবার জন্য। আমাদের শ্রীগুরুদেব তাই সরাসরি নির্ম্মলাদিকে পাঠালেন, সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে এখানে এনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে শান্তি দেবার উদ্দেশ্যে…

—এইটা বুঝি সদ্‌গুরুর সিদ্ধাশ্রম!— সীমার কণ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ।

—নয় কেন? দু'দিন থাকলে আপনিও স্বীকার করবেন, ইহলোক এবং পরলোকের সেতু-বন্ধনকারী এমন আশ্রম আর ভারতে অথবা পৃথিবীতে কোথাও নেই।

—তোমার কথার মধ্যে যেন একটা বিদ্রূপের রেশ ব্যঞ্জিত হচ্ছে, শর্ম্মিষ্ঠা! এই আশ্রম সম্বন্ধে তোমার সত্যি মনোভাবটা বলবে আমায়?— সীমা বসে পড়ল।

—শনৈঃ দিদি, শনৈঃ সবই জানবেন। এখানে আমরা 'অষ্টনায়িকা' ছিলাম, আপনাকে নিয়ে 'নবদুর্গা' হলাম। আর একটি এলে একেবারে 'দশ-মহাবিদ্যা' হয়ে যাব··· হাসতে হাসতে সীমার গায়ে ঢলে পড়ল শর্ম্মী।

—তুমি এখানে কি ভাবে এসেছ, শর্ম্মিষ্ঠা? আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তো তোমার মধ্যে কিছুমাত্র আছে বলে মনে হয় না— শর্ম্মিষ্ঠার হাসি কিঞ্চিৎ থামলে সীমা শুধোলো ও:কে।

—আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নেই আমার মধ্যে! আপনি কিছ্‌ছু বোঝেন না। নির্ম্মলাদির পরেই এখানে আমি আধ্যাত্মিক বক্তৃতায় পারদর্শিনী মেয়েদের মধ্যে। অবশ্য সে-সব বক্তৃতা-ই। কিন্তু জানেন? এখানের অধ্যাত্মরাজ্য—মানবরাজ্য, এমন কি পশুরাজ্য পর্য্যন্ত আস্তৃত। দিনকতক থাকলেই দেখবেন, এ একেবারে ব্রজধাম!

—এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে? একে চালান কারা?

—তার কি ঠিক আছে কিছু। বহু ধনী ব্যবসাদার আছেন এর পরিচালনায়। অবশ্য প্রতিষ্ঠাতা আমাদের শ্রীগুরুদেব। কিন্তু যাঁরা এর পিছনে আছেন, তাঁরা দেশের বড় বড় মহাজন···

—এটা কি তাঁদের বাগানবাড়ী বলতে চাও?

—নাঃ, তোমার সঙ্গে পারা গেল না! বলতে কিছুই চাই না। যা খুসী তুমি বুঝে নাও। এটা আশ্রম—শ্রমসাধ্য কিছু করতে হয় না,

এই স্থবিধা। সকালের প্রসাদ মালপো ভোগ রয়েছে, এসো, সৎকার করি দুজনে।

দুজনের সম্পর্ক কখন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এসেছে কেউ টের পায়নি।

শর্মিষ্ঠা একটা ঢাকা-দেওয়া খাবারের থালা বের করলো। প্রচুর সুখাদ্য রয়েছে তাতে। একটা ছোট প্লেটে দিল কতকগুলো সীমাকে।

—চা খাও তো তুমি? আনতে বলছি।—শর্মিষ্ঠা খেতে খেতে বাইরে গেল।

সীমা ভাবতে লাগলো—কী আহাম্মুকী কাজই না সে করে ফেলেছে এখানে এসে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বেশী কিছু করবার চেষ্টা করলে সীমা আরো বিপদে পড়তে পারে। অতএব নির্ম্মলার ফেরা পর্য্যন্ত নিঃশব্দে অপেক্ষা করবে সে—ঠিক করলো।

কিন্তু যার খোঁজে এখানে এসেছে সীমা, সে কোথায়? সেই খোকা! ওর নাম দিয়েছে নাকি 'কড়ি'। সীমা কোনো নাম দেয়নি ওকে; দেবার স্থযোগ হয়নি সীমার। 'খোকা' বলেই চালিয়েছে এতদিন। 'কড়ি' নামটা কি আর থাকবে তার? সীমা তাকে হারালো—তাকে বিশ্বের জনস্রোতে হারিয়ে ফেললো সীমা। কোন্ এক অপুত্রক দম্পতী তাকে মানুষ করবে, মা-বাবা ডাক শুনবে তার মুখে—সীমা জানতে পারবে না। ভালই হোল···

কিন্তু সীমা ছেলেটার কোমল স্পর্শ ভুলতে পারছেনা কিছুতেই। এই ক'মাস ধরে চেষ্টা করে পারেনি সে ভুলতে। সীমা এখানে বন্দী হয়ে গেল। তাকে খোঁজার আর পথ তো খোলা রইলনা সীমার কাছে!

বন্ধন-বেদনাকে আচ্ছন্ন করে সীমার মনে সন্তানহারা মায়ের গভীর বেদনা বজ্রনির্ঘোষে জানাচ্ছে—সে ব্যথা আছে, থাকবে ··সে অমোঘ!

আলোক গেছে দপ্তরীর বাড়ী কোষগ্রন্থ বাঁধানোর কাজে। অঞ্জনা এসে দেখলো, ওর টেবিলে একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। খোলা চিঠি। পড়ল অঞ্জনা,

"আলোক, অকস্মাৎ সেদিন তোকে চায়ের আসরে দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দ বোধ করেছি। এমন করে তুই কাণা-গলিতে আত্মগোপন করে আছিস, তা কে জানতো! যাই হোক, একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোকে আমার দরকার। যদি আজ সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ী আসিস তো সব কথা জানাব। আশা করে রইলাম তোর আসার।

ইতি—বিকাশ।"

বিকাশকে সেদিন দেখেছে অঞ্জনা দীপ্তি দেবীর চায়ের আসরে। কিন্তু আলোকের সঙ্গে তার কতখানি পরিচয়, তার খোঁজ করেনি অঞ্জনা, কারণ ওর মনটা উৎপলার সঙ্গে আলোকের সম্বন্ধ-নির্ণয়েই ব্যস্ত রয়েছে এই ক'দিন। অকস্মাৎ বিকাশের কাছ থেকে কেন এই চিঠি এল! চিঠিখানা ডাকে আসেনি, কেউ দিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ বিকাশবাবুর বাড়ীর বেয়ারা। খামের উপর লেখা 'আরজেন্ট'। ঠিকানাটা খুব পরিষ্কার হাতে লেখা; কতকটা মেয়েলী হাতের মনে হয়।

টেবিল গোছাতে গোছাতে অঞ্জনা ভাবতে লাগলো, এতদিন আলোক রয়েছে এখানে—এতো স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে, যেন মনেই হয় না, আলোক তার প্রাইভেট টিউটার। অথচ আলোকের সম্বন্ধে কত কম খবরই রাখে অঞ্জনা! কিন্তু কিই-বা দরকার অত খবর রাখার? পুরুষ-মানুষের কত বন্ধু থাকে, কত বান্ধবী থাকে। কত জায়গায় কতরকম কাজে ঘুরতে হয় তাদের—মেয়েদের অত খবর রাখা চলে না। আলোক তার দাদা, এই অঞ্জনার গৌরব!

—এই যে, আপনি আছেন দেখছি— মিঃ ম্যাকু নমস্কার জানালেন।

—আসুন। কি খবর?— অঞ্জনা প্রতি-নমস্কার করে স্বাগত জানালো ম্যাকুকে।

—আলোক কোথায়? এখনো আফিস-টাইম হয়নি বুঝি?

—আফিস কিসের? দাদা বেরিয়েছেন একটু বাইরে। বসুন। কার আফিসের কথা বলছেন?

—আলোক এখানে চাকরী করে তো? থাকে কোথায়? মেসে?

—এখানে চাকরী করেন তিনি, কে বলল আপনাকে? এটা তাঁর বাড়ী। তিনি আমার দাদা হন। কোত্থেকে এসব আজগুবি খবর সংগ্রহ করলেন আপনি!

অঞ্জনা যে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, মিঃ ম্যাকু বেশ বুঝলেন। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকুব বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, বিশেষ সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে। তৎক্ষণাৎ অঞ্জনাকে প্রসন্ন করবার জন্য বললেন,

—আই সি-ই-ই-ই—! আপনি তার বোন! ওঃ, এক্সকিউজ মি প্লিজ। আমি দীপ্তি দেবীর কাছে শুনলাম যে, আলোক আপনার বাবার লেখা-লেখি, বই-ছাপা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। তাহলে আমি ভুল শুনেছি—

—না, ঠিকই শুনেছেন। আমার বাবার সব-কিছু তিনিই দেখেন, কারণ তিনিই দেখবার অধিকারী। তবে চাকরী নয়, উত্তরাধিকার।

কথায় উত্তাপ এখনো যথেষ্ট অঞ্জনার, কিন্তু সে সংযত হল। বলল,

—সেদিনও আপনি দাদার সম্বন্ধে কী একটা রিমার্ক করেছিলেন। ব্যাপার কি বলুন তো? আমার দাদাকে আপনি এত হীন চোখে দেখেন কেন?

—না—না—না, নিশ্চয় নয়। একি কথা বলছেন, অঞ্জনা দেবী! একি বলছেন? আপনার দাদা আমাদের উৎপলাশ্রমের সেক্রেটারী

ছিলো—সে আমার বিশেষ স্নেহপাত্র। আর, তাকে আমাদের দরকার বলেই আজ এখানে এসেছি। কোথায় সে? ডাকুন—

—তিনি বাড়ী নেই। ফিরতে দেরী হবে। কী দরকার, আমায় বলতে পারেন।

—হ্যাঁ, আপনাকে বলতে আপত্তি কিছু নেই। এক কথায়, আমরা একটা ভাল গল্প চাইছি মন্দার-প্রডাকৃসনের পরবর্ত্তী ছবির জন্য। আলোক যদি গল্পটা লেখে, আমি একবার দেখে অ্যাপ্রুভ করে দেব,—না-লিখবে কেন! সে তো লেখে—লিখুক—ভাল টাকা পাওয়া যাবে—মানে, পাইয়ে দেব আমি—বুঝলেন। তাকে এই খবরটা দিয়ে আপনি উৎপলা দেবীর কাছে যেতে বলবেন, আজই সন্ধ্যায় যেন যায়, কারণ, জানেন তো, বিস্তর গল্প-লিখিয়ের ভিড় আজকাল। আমি-ই আলোকের কথাটা পেড়ে রেখেছি ওখানে—

প্রতিমার মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে অঞ্জনা শুনলো মিঃ ম্যাকুর কথা—ভেতরে কর্ম্মরত ঝি'কে ইঙ্গিত করে সে একগ্লাস জল আর মিষ্টি আনতে বলেছে। ঝি আসতেই তার হাত থেকে খাবারটা নিয়ে মিঃ ম্যাকুর সামনে ধরে দিতে দিতে বলল,

—বিস্তর লিখিয়ের ভিড় যদি তো, দাদাকে আর খোঁজেন কেন? দাদা তো গল্পের-তাড়া-বগলে সিনেমা-ওয়ালাদের দরজায় ধন্না দেন না! তিনি লেখেন অত্যন্ত কম, প্রকাশ হয় তার থেকেও কম—

—তার-ই জন্য তো ওকে চাইছি। কম লেখে, আর ভাল লেখে। আমাদের সকলের ইচ্ছে, এই গল্পটা আলোক লিখে দিক।

—আমি জানাব আপনার কথা দাদাকে—

—হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন একবার ওখানে—

—পাঠিয়ে দেব কি করে মশাই! তাঁর খুসী হয় তো যাবেন। আমি খবরটা দেব।

—আপনি অনুরোধ করতে পারবেন না ?— মিঃ ম্যাকু উঠতে উঠতে বললেন।

—অনুরোধ কেন, আদেশ করতে পারি। বোনেরা যা করতে পারে, আমিও তাই পারি। কিন্তু এখানে করবো কেন ? তিনি ভাল মনে করেন তো যাবেন ওখানে।

—বলবেন, উৎপলা দেবী তাঁকে ডেকেছেন একবার—

—তাহলে 'মন্দার প্রডাক্সন' নয়, উৎপলা দেবী ডাকছেন ?

—ওই একই কথা। উৎপলা 'মন্দার প্রডাক্সন'এর ডিরেকটার-বোর্ডের সদস্যা। ওঁরই বাড়ীতে আলোচনা হবে আজ সন্ধ্যায়। আচ্ছা, নমস্কার—

মিঃ ম্যাকু বেরুলেন পথে। খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে বললেন,

—বলবেন, খাঁটি মানবতার আবেদন আছে, এমন একটা গল্প আমরা চাই।

আবার নমস্কার করে চলে গেলেন মিঃ ম্যাকু। অঞ্জনা কোনো জবাব দিল না আর। নিঃশব্দে টেবিলটা গোছাতে গোছাতে ভাবছে—আলোক এখানে আসবার আগে কী একটা আশ্রমে চাকরী করতো। ওখানে থাকতেই লিখতো মাসিক কাগজে। একটা বইও বের করেছিল। তারপর এখানে এই সাতবছর, কোষগ্রন্থই তাকে সংকলন করতে দেখেছে অঞ্জনা।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে দাদা 'জলদর্চ্চি' বইখানাও লিখলো, কী অসাধারণ পরিশ্রম করেছে দাদা ! এই মাসখানেক মাত্র বেরিয়েছে বইখানা। কল্পনাতীত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে এর মধ্যে ; বৎসরের সেরা বই বলে সুখ্যাত হয়েছে।

তাই আজ দাদার ডাক পড়েছে উৎপলার দরবারে। কিন্তু এই ম্যাকু লোকটা দাদার উপর এত ঈর্ষ্যাপরায়ণ কেন, ভেবে পাচ্ছে না

অঞ্জনা। নিশ্চয় এমন কোনো ব্যাপার ভেতরে আছে, যাতে এই লোকটা দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু কথাটা আর ভাববার সময় হোল না অঞ্জনার; রান্নাঘর থেকে ডাকলো ঝি ওকে কী একটা তরকারী ধরে যাবার ভয় দেখিয়ে। অঞ্জনা তাড়াতাড়ি গিয়ে জল ঢাললো কড়াতে। এখন আর ওর সময় নেই, বাবার স্নান-পূজার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আলোক এল অনেক বেলায়; রোদে মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।

—ছাতাটা হোল কি তোমার! হারিয়েছ?— অঞ্জনা বলল ওকে দেখামাত্রই।

—সাত বছরের পুরোনো ছাতা, কাপড়টা শিক থেকে ছেড়ে গেছে, দেখিস নি?

—না, আমি আর দেখি কোথায়? দেখবে তোমার বৌ এসে এবার। দেখ-গে, কবে আমি সেলাই করে রেখে দিয়েছি তোমার ছাতা— অঞ্জনা গম্ভীর মুখে বলল।

—তাহলে আমায় দিসনি কেন?

—যাবার সময় আমায় বলে গিয়েছিলে? আর, সাত বছরের ছাতা হলেও, ব্যবহার করেছ কবে তুমি? তোমার তো ধুতি-পাঞ্জাবীগুলোও সাত বছরের!

আলোক কথা না বলে হাসলো একটু। অঞ্জনা বলল,

—ঐ ছাতাটা তোমাকে কে যেন দান করেছিল, দাদা—সে খুবই নির্ব্বোধ লোক নিশ্চয়—

—কেন, নির্ব্বোধ কেন সে?

—তোমাকে ছাতা দেওয়া মানে ছাতার অপমান। ছাতাখানা আজও কত সুন্দর আছে, আর তুমি রোদে ঘুরছো! কোথায় গিয়েছিলে? দপ্তরীর বাড়ীতে এত দেরী হবার তো কথা নয়।

—না-রে, বইএর দোকানগুলোতে খবর দিতে হোল যে 'মহাকোষ' বের হয়েছে। তাছাড়া কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে হোল···এইসব কাজে দেরী হয়ে গেল। যাই, স্নানটা করে আসি— আলোক স্নান করতে চলে গেল বাথরুমে।

অঞ্জনা ওর খাবার ঠাঁই ঠিক করতে করতে দেখতে পেল, একখানা 'মহাকোষ' আলোক হাতে করে এনে রেখেছে ওর বাবার টেবিলে। বাবা শুয়েছেন। তাড়াতাড়ি অঞ্জনা বইখানা দেখলো এসে। বিরাট গ্রন্থ, পঁচিশশো পাতার বই। বাঁধানোও তেমনি মজবুত। মূল্য পঁচিশ টাকা।

—ওরে বাপ! কে কিনবে এত দামী বই।— আপন-মনে বলল অঞ্জনা।

—ওর কমে দেওয়া যায় না, অঞ্জু। দাম যথেষ্ট কম করা হয়েছে। কিনবে লাইব্রেরী, আর দেশের যারা জ্ঞানপিপাসু— আলোক বাথরুম থেকে ফিরে বলল।

—বেশ। বসো, খেতে দিই।—তোমার 'জলদর্চ্চি' কেমন বিক্রী হচ্ছে, দাদা?

—ভালই। আবার এডিসন দিতে হবে শিগ্রি— হেসে বলল আলোক।

—'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তী—নারী, না, নগরী—দাদা?

—দুটোই— হেসে বললো আলোক— নারী-নগরী-নাগরী-নায়িকা একাধারে—

—অসাধারণ চরিত্র, দাদা। এটা কি তোমার অনাসক্ত মনের সৃষ্টি?

—সেটা তো পাঠকরা বলবে রে— ভাত মাখতে মাখতে বলল আলোক।

—বলছে! হ্যাঁ, শোনো—সেই ম্যাকু-ভদ্রলোক এসেছিলেন সকালে। বললেন যে, ওঁদের নতুন ছবির জন্য একটা মানবতার

আবেদনওয়ালা গল্প চাই। তাই তোমাকে উৎপলা দেবী ডেকেছেন। আজই সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে সেখানে।

—আজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে বিকাশের ওখানে যেতে হবে, অঞ্জু। মিঃ ম্যাকুকে তুই জানালি নে কেন?

—আমি কি করে জানবো, তুমি আজ সন্ধ্যায় কোথায় যাবে? অবশ্য আমি তোমার টেবিলে বিকাশ বাবুর চিঠি দেখেছিলাম। কিন্তু তোমার ওখানে যাবার সম্মতি তো আমি জানতাম না···

—আচ্ছা, ফোন করে উৎপলা দেবীকে জানিয়ে দেব। আর কি খবর?

—আর কিছু না। বিকাশ বাবু তোমার বন্ধু তো?

—না, সহপাঠী।— আলোক খেতে আরম্ভ করলো। অঞ্জনাও আর বলল না কিছু।

খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করে আলোক; ঘুমায় না। অঞ্জনা এর মধ্যে খেয়ে এসে বলল,

—উৎপলার বাড়ী যাবার সময় আমায় নিয়ে যেও।

—ওখানে কি জন্যে যাব আমি?

—উনি ডেকেছেন তোমায়, বললেন মিঃ ম্যাকু। মোটা টাকা পাওয়া যাবে।

—টাকা কি হবে? টাকা রোজগারের ফন্দি তো আমি করিনে, দিদি!

—ওঁরা একটা ভাল গল্প চান···

—ওঁরা সেটা যে-কোনো বেহেস্ত্ থেকে নিতে পারেন।

—বেহেস্ত্ কেন?— অঞ্জনা তাকে প্রশ্ন করলো।

—ওদের গল্প বেহেস্ত্ থেকেই আসে—না-হলে ওদের পয়সা হয় না।

—আমার বড্ড ইচ্ছে, তোমার গল্প সিনেমার ছবিতে দেখি।

—ওটা মেয়েলী ইচ্ছে। যা, গরমের দিন—খানিক শুয়ে বিশ্রাম কর-গে।

আলোক তাড়িয়ে দিল অঞ্জনাকে প্রায়। অঞ্জনা কিন্তু তার নিজের ঘরে এসে অনেক কথাই ভাবতে লাগলো। আলোকেব সঙ্গে এই অর্থহীন কথা বলার উদ্দেশ্য ওর, উৎপলার প্রতি আলোকের মনোভাব জানা। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না অঞ্জনা। আলোক যেতে চায় না উৎপলার সান্নিধ্যে! কেন? অঞ্জনা নিরাকবণ করতে পারছে না কারণটা। করবী সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছে অঞ্জনা। কারণ, করবী সেদিন বরুণকে ডেকেছিল আলোকের মনে ঈর্ষ্যা জাগাবার জন্য। করবী এতো ছোট, জানতো না অঞ্জনা! ওকে দাদার বৌ করা যায় না। কে তবে হবে দাদার বৌ? দাদার গল্পের নায়িকা অবন্তী—কে সে? সে কি আছে পৃথিবীতে? অথবা ওটা দাদার কল্পনা মাত্র? কিন্তু, কী আশ্চর্য্য চরিত্রের মেয়ে অবন্তী! কিন্তু···অবন্তী-চরিত্রের মেয়েও দাদার বৌ হবার যোগ্য নয়—ভাবছে অঞ্জনা ··

'জলদর্চ্চি' বইখানা আবার টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। কত কী ভাবছে অঞ্জনা। নিজের জন্য ওর কোনো চিন্তা নেই। সুস্থ এবং স্বস্থ হয়ে দিব্যি শান্ত-জীবন যাপন করতে পারে। অথচ আশ্চর্য্য, নিতান্ত অনাত্মীয় আলোকের জন্য চিন্তার ওর অবধি নেই। আলোককে পরিপূর্ণ সুখী না করতে পারলে অঞ্জনার যেন সর্বই ব্যর্থ হচ্ছে! কী ভাবে সেটা হয়? কতটুকু কী করতে পারে অঞ্জনা আলোকের জন্য! অবিলম্বে আলোককে সংসারী না করতে পারলে, সে হয়তো সন্ন্যাস নেবে। কারণ বাবাকে বলেই রেখেছে আলোক যে, কোষগ্রন্থটা বের করে দিয়েই সে ছুটি নেবে—বেরুবে ভারত-ভ্রমণে। ঐ ভ্রমণে বেরুনোটাই সন্ন্যাস নেওয়ার সামিল। কিছু কি করা যায়না দাদা চ'লে যাবার পূর্ব্বে?

মনের উত্তেজনায় উঠে বসলো অঞ্জনা। ছোট বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছিল—তাকে একবার দেখলো, তার পর ঘড়ি দেখলো সাড়ে-তিনটে। বড়-দিনের বেলা, শেষ হতে দেরী হবে। অঞ্জনা এ ঘরে এসে দেখলো, আলোক কী একটা বই পড়ছে।

—আমি তোমার সঙ্গে বিকাশবাবুর ওখানে যেতে পারিনা, দাদা?

—না। আলোক কঠিন জবাব দিল— সেখানে তোর কী কাজ?

—ঘরের ভেতর ভাল লাগে না, বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে···

—আজ হয়তো তোর বর আসবে। যাবি তার সঙ্গে বেড়াতে—

—তুমিই-বা নিয়ে গেলে? সে তো আসবে রাত্রে।

—আমি তাকে বিকেলে আসতে বলে দেব।

—অর্থাৎ, তুমি নিয়ে যেতে চাও না—কেমন?

—না। আমাকে অস্থানে-কুস্থানে ঘুরতে হবে।

—কুস্থানে?···

—হ্যাঁ—বিকাশ কুস্থান-ই। সেখানে তোকে আমি নিয়ে যেতে চাই নে···যা, চা দে—

নিজের প্রয়োজনেই বিকাশ ডেকেছে আলোককে। কড়েয়া রোডের প্রকাণ্ড বাড়ীটার দরজায় পৌছাতেই, বিকাশ নিজে এসে হাত ধরে নিয়ে গেল ভেতরে। বিশাল বাড়ী, সুসজ্জিত। বিকাশ বেশ ধনী হয়ে উঠেছে এর মধ্যে।

—তারপর আলোক, তোর সঙ্গে একযুগ পরে দেখা সেদিন!

—হ্যাঁ, দীর্ঘদিন পর। তা আজ আবার আমাকে কী দরকার হোল?

—বলছি। বোস, চা খা। প্রয়োজন আমারই ব্যক্তিগত।

আলোক অপেক্ষা করতে লাগল বিকাশ কী বলে শুনবার জন্য। চা-খাবার এল। খাওয়াও চলছে, বিকাশ কোন কথা বলছে না তার প্রয়োজন সম্বন্ধে। শুধু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছে আলোককে। কোষগ্রন্থটা কী ব্যাপার, কত ছাপা হোল, কী পেল আলোক ওতে, ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর আলোক বলল,

—তোর কথাটা এবার বল, বিকাশ। আমার বেশী সময় নেই।

—হ্যাঁ শোন, পরশু আমাকে দিল্লী যেতে হবে সরকারী কাজে। ওখানে দিন সাত থেকে ফরেন-এ যেতে হবে—

—রাষ্ট্রদূত হয়ে নাকি!

—ঐরকমই কিছু। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—আমাকে! কেন বিকাশ? সেক্রেটারীর কি দেশে এতই অভাব হোল?— হাসল আলোক।

—না, সেক্রেটারী হয়ে নয়। সঙ্গী হয়ে যাবি। খরচ অবশ্য আমার। বিনিময়ে আমি কিছু চাইব তোর কাছে।

—কি?— বিস্মিত আলোক তাকালো বিকাশের পানে।

—আমাদের একটা এয়ার-সার্ভিস আছে, জানিস তো?— বিকাশ ধীরে ধীরে বলল,—ঐ সার্ভিসটায় তোকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরবি, দেশ-ভ্রমণের এতবড় সুযোগ আর হয় না। ঐ আমোদজনক কাজের সঙ্গে লিখবি একটা ভাল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—

—সে কাহিনী কি তোর নামে প্রকাশ করতে হবে, বিকাশ?— আলোক হাসলো কথা বলে।

—না-না-না আলোক, নিশ্চয় না। তোর নামেই সবকিছু হবে। আমার দরকার অতি সামান্য··· একটু থেমে বলল—শোন—

বিকাশ অল্প হেসে একটু কেসে আবার আরম্ভ করলো—উৎপলাশ্রম ছাড়ার পর তোর এতদিন কোনো খবর না পাওয়ায় আমরা ভেবেছিলাম, তুই সন্ন্যাস নিয়েছিস—না-হয়…তোর ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়েছে! কিন্তু দেখা গেল, তা নয়। তুই বাহাল-তবিয়তেই আছিস— হাসলো বিকাশ আবার…

বিকাশের এতখানি ভনিতা করে কথা বলার কী কারণ, আলোক ঠিক বুঝতে পারছে না। তথাপি চুপ করেই রইল সে বাকীটা শুনবার জন্য।

—তুই ঠিকই আছিস, আলোক, তোর যেমন থাকা উচিত তাই—

এ নিয়ে আমার কিছু মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেছে আমার জীবনে—

—আমি-ই কিছু ঘটালাম নাকি?— আলোকের কণ্ঠে ক্ষীণ বিদ্রূপ।

—হ্যাঁ, পরোক্ষে তুই এর মূলে। তুই হয়তো জানিস না, উৎপলাকে আমি ভালবাসি—আমি চাই, সে সুখী হোক—

—হোক-না, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না— আলোক বললো,—অবশ্য আমি জানতাম না যে, তোর সেই দেহগত কামসর্ব্বস্ব ভালবাসা তুই আজও বহন করে চলেছিস অন্তরে।

—করছি বহন— বিকাশ আবার হাসলো একটু— ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে, আলোক! এমন হয়… হাসল বিকাশ আবার।

—নিজেকে ঐতিহাসিক করতে যাস-নে, বিকাশ! আমি জানি, বহু নারীর সঙ্গে বহু ব্যাপারে জড়িত তুই ছিলি। এখনো আছিস। উৎপলা সেই নারীস্রোতের একটা বড় তরঙ্গ মাত্র—তবু মেনে নিলাম, তুই তাকে আজও ভালবাসিস—বেশ, এখন বল—আমার এখানে কোথায় স্থান?

—উৎপলা তোকে ভালবাসে। অবশ্য সে ভালবাসা একটু উঁচু-দরের, একটু 'সাব্লাইম'—দেহের আবেদন থেকে মনের আবেগ সেখানে অনেক প্রবল; তবু এটা ঠিক যে, নিছক মনের আবেগ নিয়ে মানুষ সুখী হতে পারে না···

—তোর কথা সত্যি হলেই-বা আমি কি করতে পারি, বিকাশ— ?

—তুই উৎপলাকে বিয়ে কর— কথাটা বলে বিকাশ তাকালো আলোকের পানে।

—অবাক করছিস, বিকাশ!— আলোক বলল,—প্রেমের মহিমার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকতে, উৎপলা দেবী আমার কাছে মানবতার আবেদনওয়ালা গল্প চেয়ে পাঠান কেন! তোকে দাঁড় করিয়ে দিলেই তো সেটা হতে পারে?

—কথাটা তুই বিশ্বাস করলি নে, আলোক?

—বিশ্বাস করা কঠিন, বিকাশ—খুবই কঠিন এ যুগে। অবশ্য আমি মানি, খুব খারাপ মানুষও একদিন খুব ভাল হতে পারে। শয়তান 'দেবতা' হয়ে যেতে পারে। সে-হিসেবে এই দীর্ঘকাল উৎপলার জন্য অপেক্ষা করে তোরও হয়তো এইরকম তার সম্বন্ধে মনোভাব হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিকাশ, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে কোনো ভাল কাজ করা চলে না। তোর বঞ্চিত মনের বেদনার এই আধ্যাত্মিক প্রকাশ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—এটা ঈর্ষ্যার অন্য রূপ।

—কি করে বুঝলি?— বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—বুঝতে দেরী লাগে না, বিকাশ! এতকাল ধরে উৎপলার প্রতি তোর এই মোহ, আমি 'প্রেম' বলতে চাই না—তোকে বঞ্চিতের বেদনায় বিকৃত করে তুলেছে! তুই চাইছিস, উৎপলার অন্তরে একটা মহান আদর্শ-প্রেমিকের আসন গ্রহণ করতে,—ব্যাপারটা সত্যি 'প্রেম' হলে খুব আনন্দের হোত, বিকাশ! কিন্তু সত্যি নয়—

—কেন সত্যি নয়? তোর সন্দেহ কিসে, আলোক? আমি অনেকদিন থেকেই একথা ভাবছিলাম। তোর খোঁজ না পেয়ে চুপ করে ছিলাম এতদিন—

—আমার খোঁজ পাওয়া খুব কঠিন ছিল না, বিকাশ। বাড়ী থেকে না বেরুলেও কাগজে-পত্রে আমি বের হয়েছি বহু বার! অন্ততঃ খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে তুই আমার সন্ধান করতে পারতিস। কিন্তু, যাক্ সে কথা। তোর এই মনোভাব যে সত্যি, অর্থাৎ 'সিন্‌সিয়ার' নয়, তার প্রমাণ তুই নিজেই দিয়েছিস। তুই বললি যে, উৎপলা আমাকে যেভাবে ভালবাসে সেটা 'সাব্লাইম' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, অতএব তোর কথামতই বিবাহ-বন্ধন এতে অনাবশ্যক। তবু তুই চাইছিস যে, আমি তাকে বিয়ে করি। এর থেকে মহৎ কিছু তোর কল্পনায় এলোনা কেন, বিকাশ?

—আর কি মহৎ থাকতে পারে, আলোক?

—আছে। মহত্তর হচ্ছে, তাকে তার ভাবরাজ্যে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়া। আর মহত্তম হচ্ছে, তোর নিজে তাকে বিয়ে করে আমার প্রতি তার অহৈতুকী প্রেমটাকে তোর প্রতি দাম্পত্য-প্রেমে পরিণত করা··· হাসলো আলোক।

—আমি ওকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করেছিলাম, আলোক—

—এ কাজ প্রস্তাবে হয় না, বিকাশ! উৎপলাকে আমি যতটুকু চিনি, তাতে জানি যে, আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা সে কোথাও গোপন করবে না। তুই এইটা জেনে তাকে বিয়ে করতে চাইলে, সে নিশ্চয় রাজী হোত।

বিকাশ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। দীর্ঘদিন পূর্ব্বে উৎপলা তো তাকে এই কথাই বলেছিল যে—আলোকের প্রতি তার প্রেম জেনেও যদি বিকাশ রাজী থাকে তো, উৎপলা তাকে বিয়ে করতে সম্মত আছে।

বিকাশ তখন রাজী হয় নি, প্রত্যাহার করেছিল তার প্রস্তাব। মনে পড়ল বিকাশের। বলল,

—আমি যাকে বিয়ে করবো, সে অন্যকে ভালবাসে—এটা কেমন করে সহ্য হয়, আলোক ?

—হাঃ হাঃ হাঃ— আলোক অজস্র হাসিতে উচ্চকিত করে দিল জায়গাটা ; বলল,— এতক্ষণে ধরা পড়ে গেলি, বিকাশ ! উৎপলাকে তুই কিছুমাত্র ভালবাসিস নে। এমনকি, কোনো মোহ'ও নেই তার প্রতি তোর। তুই চাইছিস, উৎপলা যে-জাহান্নমে ইচ্ছে যাক, তার অন্তরে তুই প্রতিষ্ঠিত থাকবি। অনেক পুরুষ আছে, যারা নারীকে মনোগতভাবে জয় করেই নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে ; তাদের পৌরুষ তৃপ্তি পায়। তুই সেই শ্রেণীর······ একটু থেমে আলোক আবার বলল,— এইসব পুরুষরা অপর মেয়েকে অসতী করতে যতখানি পটু, নিজেদের স্ত্রী-কন্যাকে সতী দেখতে তার শতগুণ অধিক মনোবিকার-গ্রস্ত। এ এক রকমের ব্যাধি। উৎপলাকে তুই কিছুমাত্র বিশ্বাস করিস না, অথচ তুই তাকে দেখাতে চাস যে— তুই একটা মহান প্রেমিক। প্রেম রাজনীতি বা অর্থনীতি নয়, বিকাশ, প্রেম মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুমহান বেদনা—তার স্থিতি আত্মায়,—তার প্রকাশ অশ্রুতে !

বিকাশ চুপ করে রয়েছে, মুখখানা বেশ গম্ভীর। আলোকও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,— আমাকে নিয়ে এই অভিনয় তোর না করাই ভাল, বিকাশ ! বিয়ে আমি করবো না, ঠিক করেছি। আর, উৎপলাও আমাকে শুধু শ্রদ্ধা করে—আমাকে বিয়ে করার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তার, আমি জানি। তুই যদি এখনও বিয়ে না করে থাকিস তো, অনায়াসে তাকে করতে পারিস।

—সে বলে যে, সে তোকে ভালবাসে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে ভালবাসা বৈষয়িক নয়। আমার চরিত্রের কোনো একটা দিক তার ভাল লেগেছে, সেইটুকু অবলম্বন করে তোকে উৎপলা পরীক্ষা করে নিলো। তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই পরীক্ষায় 'ফেল' করলি।

—কিন্তু বিয়ে করার পরও যদি জানি যে, সে তোকেই চায়?—বিকাশ বলল স্বীকৃতির সুরে।

—বলবে না। অত বোকা মেয়ে নয় উৎপলা।— হাসলো আলোক; বলল হেসে,— বিয়ে তুই ওকে করতে চাস না, বিকাশ, এ আমি জানি। ওকে তোর জন্য কাঁদাতে চাস তুই! কিন্তু বয়স হয়েছে। আর এ ছেলেমানুষী কেন! আমরা দুজনেই ত্রিশ পার হয়েছি। তুই এবং আমি-ও। বিয়ে যদি করতে হয় তো আর দেরী নয়, অবিলম্বে যাকে হোক করে ফেল—

আলোক উঠলো। ওর মুখের হাসিটা সরল-সুন্দর। ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে দু'পা চলে আসতেই বিকাশ বলল ত্বরিত কণ্ঠে,

—শোন আলোক, তোর অসাধারণ বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিনই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি; কলেজ-লাইফ থেকেই। কিন্তু আজ একটা জায়গায় তুই ভুল করছিস।

—কোথায়?— আলোক ফিরে দাঁড়লো।

—আমি সত্যি চাই, উৎপলা সুখী হোক—

—তুই নিজে তাকে সুখী করতে পারিস, বিকাশ! তার গত জীবনের সব ভুলে, তোরও গত জীবনের সব কথা তাকে ভুলিয়ে সুস্থ-সবল প্রেম দিয়ে তাকে তুই সুখী করতে পারিস। অপর কেউ তা পারবে না।

—কেন?

—কারণ, উৎপলা আর তোর মধ্যে একদিন নিবিড় সৌখ্য ছিল—দুজনে দুজনের জীবন নিয়ে অনেক খেলা খেলেছিস। মনে হয়, আজ

যৌবনপ্রান্তে দুজনে নীড় বাঁধলে, ভালই কাটবে তোদের। কারণ, এ প্রেম চপল হবে না, স্থির এবং স্থায়ী হবে।

—প্রেম হবে?— প্রশ্নটা করার সঙ্গে হাসল বিকাশ।

—'প্রেম' মানে আধ্যাত্মিক কিছু নয় এখানে। ম্যারেজ-কনট্রাক্ট। জীবনরথ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট। বর্ত্তমান যুগের চুক্তিবদ্ধ বিয়ে তো গোপী-প্রেম নয়, বিকাশ! সীতা-সাবিত্রী গল্পের ব্যাপার এখন। কাম মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; বিয়ে তাকে আইনের চারুতা দেবার ব্যসন মাত্র। তাকে সুরুচিপূর্ণ করে সমাজ-গঠনের জন্য বিয়ের বন্ধন মানুষ স্বীকার করছে আজ। নইলে বিচ্ছেদের মামলা এত বেশী হোত না আদালতে। যাক্, আমি চললাম, বিকাশ—একটু বিশেষ কাজ রয়েছে।

—শোন, আর একমিনিট— বিকাশ বললো,— তোর 'জলদর্চ্চি' যদি আমরা 'ছবি' করি তো তোর আপত্তি হবেনা তো?

—না। কিছুমাত্র না। অবশ্য আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। অনর্থক আবেগ বা অকারণ কথা জুড়ে গল্পকে 'কমার্শিয়াল' করা চলবে না।

—না। আমরা ভাল ছবিই করতে চাই।

—'ভাল'র সংজ্ঞা পাত্রভেদে ভিন্ন, বিকাশ!—আচ্ছা, চললাম।

আলোক চলে গেল বেরিয়ে। বিকাশ ভাবতে লাগলো।··· অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী আলোক; এত শক্তির অধিকারী হয়েও কেমন আশ্চর্য্যরকম নির্লিপ্ত! বিকাশের কাছে এ এক পরমাশ্চর্য্য। কিন্তু বিকাশ দীর্ঘদিন থেকে চেনে আলোককে। দেশমাতার মুক্তি-সাধনায় যখন আলোক জেলে গিয়েছিল, তখনো সে ছিল যেমন নির্ব্বিকার, আজও তেমনি আছে। অথচ ইচ্ছে করলে ধনে মানে সে বিকাশ অপেক্ষা অনায়াসে অনেক বড় হতে পারতো। কিন্তু বিকাশের ধারণা ছিল, আলোক উৎপলার সম্বন্ধে আগ্রহশীল। আজ সে-ভুলটাও

ভাঙলো বিকাশের। আলোক সর্ব্বত্র নিরাসক্ত। তার লেখার মধ্যেও। 'জলদর্চ্চি'র প্রত্যেকটি সমালোচনা লেখকের একান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা স্বীকার করেছে। বিকাশ নিজেও এই মত্ সমর্থন করে। 'জলদর্চ্চি' বর্ত্তমান সাহিত্যে একটা বিশেষ সৃষ্টি···

কথাটা মনে উদয় হতেই বিকাশের অন্তরে আর একটা চিন্তা খেলে গেল। আলোক তার সহপাঠী—আলোক সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, দেশ স্বীকৃতি দিচ্ছে তার—এখন বিকাশ একটা বড়রকম সভার আয়োজন করে আলোককে যদি সম্বর্দ্ধনা জানায় তো, উৎপলার চোখে বিকাশ কিছুটা উদার বলে পরিচিত হতে পারে। আলোকের গৌরবে-যে বিকাশ গৌরব অনুভব করে, এটাও প্রকাশ করা হয়—এমন কি, বিকাশের অনসূয়ত্ব প্রমাণিত হতে পারে অনায়াসে।

চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র অনেকগুলো কথা একসঙ্গে ভেবে নিল বিকাশ···কিছু টাকা খরচ হবে। হোক। নিজেকে অনসূয় এবং উদার প্রতিপন্ন করবার এমন সুযোগ বিকাশ ছাড়বে না। উৎপলাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে বিকাশের সত্যি নেই ; কিন্তু কোনো নারীর চোখে হীন হয়ে থাকবে, এটা সহ্য হয় না বিকাশের। আলোককে নিয়ে যে-খেলা সে খেলতে চেয়েছিল, তা হোল না ; কিন্তু আরো সহস্র রকম খেলা জানা আছে বিকাশের !

ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী আনতে বলল বিকাশ, উৎপলার ওখানে যাবার জন্য। নিজেও পোষাক পরতে গেল।

উৎপলা তার বাড়ীতে সিধু আর নির্ম্মলাকে পেয়ে বিপুল আনন্দ বোধ করলো। এতখানি আনন্দের কারণ,—অবিরাম বৈষয়িক ব্যাপার, এবং সেই সংক্রান্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ওর বর্ত্তমান মানসলোকে বিরক্তিকর।

অতি সামান্য একটু পরিবর্ত্তন ঘটলো এই দুজন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ পেয়ে। কিন্তু এই সামান্যকেই অসামান্য মনে করলো উৎপলা।

উৎপলাকে বলল সিধু তার আগমনের কারণ। সেই জীবন নামে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায় সে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসী করবাব জন্য। কারণ সিধু ওর মধ্যে সন্ন্যাসের লক্ষণ দেখেছে। উৎপলা কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেও, ভাবলো যে, যদি সত্যি জীবন সাধক হয় তো মন্দ কি? কিন্তু জীবন যেতে চাইবে কিনা, জানতে হবে। বলল,

—ওর গার্জেন হিসেবে আপনার নামই লেখা হয়েছে খাতায়, তবে সম্পর্কে 'পিতা' বলে লেখা হয় নি। ইচ্ছে করেই লিখিনি আমরা।

—দরকার হয় তো লিখে নেবেন— বলল সিদ্ধেশ্বর।

—ও যদি আপনার সঙ্গে চলে যায় তো, আর কিছু করার দরকার হবে না। তাহলে ভোরেই ওখানে যেতে হয়। ট্রেনে গেলেই সুবিধা।

—বেশ— সিদ্ধেশ্বর বলল,— ট্রেনেই যাওয়া যাবে ভোরে।

ভোর পাঁচটার ট্রেনে রওনা হয়ে ন'টার মধ্যেই পৌঁছে গেল উৎপলা, নির্ম্মলা আর সিদ্ধেশ্বর। নির্ম্মলা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই উৎপলা জেনে নিয়েছে এর মধ্যে, তবে খুব বেশী ভেতরের কথা নির্ম্মলা ভাঙেনি। সে বলল যে, কলকাতার এক প্রতিষ্ঠাবান ধনী ডাক্তারকে তাদের শ্রীগুরুদেবের কাছে নিয়ে যেতে এসেছে নির্ম্মলা; কিন্তু ডাক্তার ভদ্রলোকটি কলকাতায় নেই—কোথায় বেরিয়ে গেছেন, কেউ জানে না।

—কী নাম সে ডাক্তারের?— উৎপলা প্রশ্ন করলো নির্ম্মলাকে।

—ডাঃ গুহ।

নির্ম্মলার মুখ থেকে কথাটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপলা যেন আঁৎকে উঠলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বলল,

—ডাঃ গুহ খুব নামকরা ডাক্তার; ধনীও খুবই। কিন্তু তিনি কেন আশ্রমবাসী হবেন? বয়সও খুব বেশী নয় তাঁর। কিছু ব্যাপার ঘটেছে নাকি?

—উনি লিখেছেন— নির্ম্মলা সংযতভাবেই বলতে লাগলো,— পর পর কতকগুলো দুর্ঘটনা ঘটায় ওঁর মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে খুব বেশী। জীবনটা আনন্দহীন হয়ে উঠেছে। তাই চাইছেন কোনো সদ্‌গুরুর আশ্রয়। মানে, বৈরাগ্য জেগেছে আর কি!

—শ্মশান-বৈরাগ্য!— বলে হাসলো উৎপলা।

—চেনেন নাকি ডাঃ গুহকে?

—উনি খুব বিখ্যাত ডাক্তার সহরের। ওঁকে প্রায় সকলেই চেনে— বলে উৎপলা ও-আলোচনা বন্ধ করে অন্য কথা পাড়লো। কিন্তু নির্ম্মলা ভাবতে লাগলো—ডাঃ গুহকে উৎপলা কতখানি চেনে? চিন্তার জন্য কথায় সে যোগ দিতে পারছিল না ঠিকমত।

নিজের অতীত জীবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে নির্ম্মলা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছাল যেখানে ডাঃ গুহ একজন বিশেষ ব্যক্তি। কিন্তু সে দীর্ঘদিনের কথা। ডাঃ গুহ তখন সবে পাশ করেছেন আর নির্ম্মলা সপ্তদশী কুমারী। চিন্তাটা মনের পরতে আসতেই কেমন যেন লাল হয়ে উঠলো সে বাহ্যাভ্যন্তর।

'বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়' অর্থে বিশ্বের শিশুদের বিদ্যালয়, যে শিশুদের ওপর কারো দাবী নেই এবং যে শিশুগণ কোনোদিন কারো কাছে দাবী জানাবে না। তথাপি জীবনের পিতৃপরিচয় কেন রাখতে চেয়েছে উৎপলা, সে এক রহস্য। এখানে কোনো বালকবালিকার কোনোই পরিচয় রাখা হয় না—না পিতার, না বা মাতার। শুধু যিনি শিশুকে দিয়ে যান, তাঁরই নাম-ঠিকানা এবং কোথায় শিশুটিকে পেয়েছেন, তাই লেখা থাকে। যদি কোনোদিন কেউ শিশুর উপর দাবী জানায় এবং

উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারে তো সে-শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এরকম ঘটনা এখানে এপর্য্যন্ত ঘটেনি। তবু উৎপলা চেয়েছিল, জীবনের পিতৃপরিচয়ে থাক্ সিদ্ধেশ্বরের নাম। কিন্তু অবন্তী লেখেনি সে পরিচয়। কারণ সিদ্ধেশ্বরকে কোনো হাঙ্গামায় জড়াতে চায় না অবন্তী।

সেই সিদ্ধেশ্বরই আজ এসে জানাল যে, জীবনকে সে নিয়ে যাবে হিমালয়ে। সেখানে যোগধর্ম্মে ওকে দীক্ষিত করে 'সন্ন্যাস' দেবে। কথাটা শুনে অবন্তী দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বলল,

—নিজেকে কেন তুমি আবার মায়ায় জড়াতে চাইছ, সিধুদা?

—মায়া নয়, অবন্তী, ভারতে সত্যকার সাধুর অভাব ঘটেছে। ঐ ছেলেটার মধ্যে সাধুর লক্ষণ দেখেছি আমি। ওকে আমি সত্যকার সন্ন্যাসী করতে চাই—এই ভারতে আবার সন্ন্যাসধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য।

—কিন্তু সিধুদা, জীবনকে মোটেই ভারতীয় বলে মনে হয় না। ওর আকার-আকৃতি সবই বৈদেশিক—ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ কিভাবে থাকবে! ও নিশ্চয় কোনো শ্বেতাঙ্গের ঔরসজাত। অবশ্য ওর আচার-আচরণ সবই ভারতীয়।

—আমার সে কথা মনে হয়েছে, অবন্তী! কিন্তু তবু আমি দেখেছি ওর মধ্যে সাধুর অসাধারণ লক্ষণ রয়েছে। অন্ততঃ আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

—তোমার ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যাবে। কিন্তু সিধুদা, তোমার সাধনপথের কোনো বিঘ্ন না হয় ভেবেই আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাকে মুক্তি দিয়েছি; নইলে আজ আমাকে এখানে এসে পরের ছেলে মানুষ করার কাজ করতে হোত না। তুমি আমাকে সেদিনও গ্রহণ করতে চেয়েছিলে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জীবন তুমি লাভ করেছ, একটা বিদেশী ছেলে মানুষ করতে গিয়ে তা যেন পণ্ড না হয়ে যায়—

—আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়, অবন্তী! ফলাফল ভগবানের হাতে।

—বেশ, তুমি চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি—একটু থামলো অবন্তী, তার পর বলল,— উৎপলাদি ওকে এনেছেন, খুবই স্নেহ করেন তিনি ওকে। অপর্ণা নামে কে একটা ঝি নাকি ওর মা, অন্ততঃ তাই আমরা জানি। বাবার সম্বন্ধে কারো কিছু জানা নেই। ও যদি সত্যি সাধক হয়, সন্ন্যাসী হয় তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু উৎপলাদির মত্ দরকার। আর—

—আর কি ?

—আমি ওকে আরো ছু'একবছর পালন করি। তারপর তুমি নিয়ে যেও। আগামী ফাগুনে ওর পরীক্ষা—সেটা দিয়ে নিক। এর মধ্যে আসন-প্রাণায়াম তুমি আরো কিছু শিখিয়ে দাও। সেগুলো অভ্যাস করুক এখন।

কথাটার যৌক্তিকতা অনুভব করলো সিদ্ধেশ্বর। অন্য কেউ ওখানে ছিল না ; অবন্তীকে সিধুর সঙ্গে একা কথা কইতে ছেড়ে দিয়ে উৎপলা গিয়েছিল নির্ম্মলাকে নিয়ে বিদ্যালয় দেখাতে। সব দেখে নির্ম্মলা বলল,

—এ একটা ভাল কাজ, পলা দেবী ! বর্ত্তমান যুগের মেকী ধর্ম্মাশ্রম থেকে এ কাজ অনেক বেশী মহৎ। কিন্তু এরকম এই একটামাত্র বিদ্যালয় তো যথেষ্ট নয় ?

—না, এরকম শত শত হওয়া দরকার। কিন্তু করে কে ? সরকারী সাহায্যও হয়তো পাওয়া যায়, তবু দেশের মানুষ উদ্যোগী হয় কৈ ! আমাদের ইচ্ছে, এরই গোটাকয়েক ব্রাঞ্চ করি—হয়তো করা হবে।

—'হয়তো' কেন ? আপনি করুন। কিন্তু এদের নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কী করা হবে ?

—আমরা চাই দেশের একদল ভালো সন্তান তৈরী করতে। এমন এক সৈনিক-গোষ্ঠী আমরা তৈরী করতে চাই, যারা হবে যুগোত্তর জীবনের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা! হিংসায়, দ্বেষে, দ্বন্দ্বে-যুদ্ধে হত-আহত আর্ত্ত-ব্যথিত পৃথিবীর মাতৃ-অন্তরকে আমরা সেই সন্তান উপহার দেব, যারা শান্তি-সৌম্য-সৌভ্রাত্রের বিজয়গানে পূর্ণ করবে আগামী দিনের পৃথিবীকে···

উৎপলা কথাগুলো বললো দীর্ঘদিনের একখানা চিঠি থেকে। কৃষ্ণার লেখা সে চিঠিখানি। কৃষ্ণা ছিল উৎপলার কলকাতা-আশ্রমের একজন কর্ম্মী। অত ভাল কর্ম্মী উৎপলা কমই পেয়েছে। আজ যদি সেই কৃষ্ণা থাকতো!···ভাবতে ভাবতে উৎপলা বলল,

—এ আইডিয়া অবন্তীর। কিন্তু তারও পূর্ব্বে আমার একটি বান্ধবী ছিল কৃষ্ণা নামে, সে-ই এর বীজ বপন করে যায় আমার এবং অবন্তীর মধ্যে।

নির্ম্মলা কিছু বলবার পূর্ব্বেই সিধু আর অবন্তী এসে দাঁড়াল। উৎপলাকে ওরা জানালো যে, জীবন আরো কিছুদিন থাক্ এখানে। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা ওর হয়ে যাবে। সিধু আজই কয়েকটা বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দেবে জীবনকে, যেগুলো এই সময়টায় সে অভ্যাস করবে। উৎপলা শুনে বলল,

—কিন্তু ওকে সাধু তৈরী করে কী লাভ হবে?

—লাভ-অলাভের কথা জানি না, উৎপলা দেবী— সিধু স্নিগ্ধস্বরে বলল,— ও সাধু হবে, ওর সেই লগ্নে জন্ম। অবশ্য গোড়ার দিকে অনেক বাধাবন্ধ আছে, কিন্তু শেষ অবধি সাধু ওকে হতে হবে। যে লক্ষণ আমার শরীরে শৈশবে দেখে আমার ঠাকুরদা আনন্দ করতেন, আমি জীবনের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখেছি। খুব স্পষ্ট লক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি, ওর ফল ফলবেই।

—বেশ, ফলবে। কিন্তু আমরা কেন জোর করে সেটাকে আগিয়ে আনতে চাইছি! যার যা হবার হবে, স্বাভাবিক ভাবে—এইটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

উৎপলার কথায় সিধু আরো দমে গেল। ওর মুখের পানে চেয়ে গভীর দুঃখ জাগছে অবন্তীর অন্তরে। সে কিছু রুক্ষস্বরে বলল,

—কাউকে সাধু বা অসাধু বানাবার তুমি কর্ত্তা নও, সিধুদা! তোমার নিজের সাধন-ব্যাপারেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। জীবন কী হবে, তা দেখবেন জীবনের ভাগ্যবিধাতা। অনর্থক কেন তুমি মোহগ্রস্ত হোচ্ছ! নিজের গুহায় গিয়ে তপস্যা কর-গে যাও। বর্ত্তমান যুগে সাধু-জীবনের কোনো মূল্য নেই···

—মূল্য না-থাকাই সাধুজীবন, অবন্তী! কিন্তু তোমার তিরস্কার আজ আমার সত্যি ভাল লাগলো। এই তো তোমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম! আমি কে ওকে সাধু বা অসাধু বানাবার? যিনি আমার মধ্যে এই সংকল্প জাগিয়েছেন, তিনিই তোমার মধ্যে একাজ করার বিপদ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনিই উৎপলা দেবীর মধ্যে বাধা দান করলেন। বেশ, আমার আশ্রমেই আমি ফিরে যাব। যদি কখনো তোমার ইচ্ছে করে, অবন্তী, তাহলে চলে যেও—আমার ঠিকানা তোমার জানাই আছে— সিধু থামলো।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো ব্যাপার, সেই জীবন কোথায় ছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে। অকস্মাৎ সামনে এসে পরিষ্কার কণ্ঠে জানাল,

—আমাকে যাবার অনুমতি দাও, মা—আমি সাধুই হতে চাই—

—আর একটু বড় হলে তোমার মতের মূল্য হবে, জীবন, এখন থাক্। পড়াটা শেষ করে নাও।—যাও এখন— উৎপলা বলল ওকে।

নিঃশব্দে চলে গেল জীবন। উৎপলা দেখলো ওর চলন-ভঙ্গিমা, যেন মার্চ করে যাচ্ছে কোনো সৈনিক।

—ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ কী দেখলেন আপনি? ও তো একটা পালোয়ান গোছের ছেলে। যুদ্ধে গেলে সৈনিক হতে পারবে।

—হ্যাঁ, সৈনিকই হবে ও। যুদ্ধের নয়, শান্তির সৈনিক। স্বাস্থ্যের প্রতীক ও, শান্তির দেবতা হবে—ও হবে আগামী যুগের পূর্ণ মানুষ— সিধু বলল হেসে।

—পূর্ণ মানুষ?— উৎপলার কথার স্বরে বিস্ময়।

—হ্যাঁ, ওর মধ্যে পূর্ণ-মনুষ্যত্ব লক্ষ্য করেছি আমি। ওর জন্ম, ওর অজ্ঞাত জীবনেতিহাস—ওর অপরিচয়ের গ্লানিকে ছাড়িয়ে, ও সূর্য্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবনে। ও জীবনরূপী রুদ্র, কালের মহিমময় স্রোতে ভেসে এসেছে মহাকালের মহিমা প্রকাশ করতে…

—আপনার কথা সত্যি হোক— উৎপলা বললো; তারপর বলল,— যদি একবছর পরে ওর মধ্যে দেখি সেরকম্ কিছু, তাহলে আপনার হাতে দেব আমি ওকে।

—আর না, আমাকে মাফ করবেন। আমি আর কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাই না। অবন্তী আমাকে সামলে দিয়েছে। আমি আজই চলে যাব আমার গুহাতে। এর পর অজানা এক ঈশ্বরের চিন্তায় আমার জীবন শেষ করবো, উৎপলা দেবী—মানুষের মধ্যে আর আমার ফিরে আসার ইচ্ছা নেই। অবন্তী আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আর তো কোনো বন্ধন আমার রইল না—জীবনকে নিয়ে আর জড়ানো কেন!

উৎপলা কিছুই বলতে পারলো না। জীবনকে সিধুর সঙ্গে ছেড়ে দিতেই সে প্রথমটা রাজী হয়েছিল প্রায়; কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখে, তার 'মা' ডাক শুনে উৎপলার মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। না, জীবনকে সে ছেড়ে দিতে পারে না।

ওখানে খাওয়া সেরে ছুটোর 'ডাউন' ধরে ওরা আবার কলকাতায় ফিরে এল। সিধু আর নির্ম্মলা গেল টালিগঞ্জ।

উৎপলা নিজের বাড়ীতে ফিরে দেখলো, বিকাশ, মিঃ সাহা আর বরুণ বসে আছেন তার অপেক্ষায়।

পথশ্রমে ক্লান্ত উৎপলা গৃহে ফিরেই ওদের দেখে খুসী হতে পারলো না। কিন্তু সে জানতো, ওঁরা আসবেন আজ সিনেমা-সংক্রান্ত কথার আলোচনা করতে ; তাই জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল,

—বসুন সব, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি— ওপরে চলে গেল উৎপলা।

কিন্তু হাত-মুখ ধোবার পূর্ব্বেই সোফায় সে শুয়ে পড়লো গিয়ে। কী যে এক মানসিক ক্লান্তি ও;কে আচ্ছন্ন করছে, ও জানে না। কেন এই ক্লান্তি, ও বুঝতে পারছে না। এ যেন যুদ্ধজয়ের পর সৈনিকের শ্রান্তি। না না, যুদ্ধ কবে করলো উৎপলা! ওর ভাগ্যই ওকে সর্ব্বত্র বিজয়িনী করেছে। জীবন-যুদ্ধলক্ষ্মী ওব জন্য 'জয়মাল্য' সাজিয়েই রেখেছিল—কিন্তু শুধুই তো জয়মাল্য ? কী পেল উৎপলা এই বিজয়ের পুরস্কার? কোথায় তার রাজ্য, রাজপুত্র, রাজসিংহাসন! এ যেন কোম্পানী-দত্ত 'রাজা' উপাধি—রাজ্য নেই, কোম্পানীর সম্মান যোগাতেই গলদঘর্ম্ম হতে হয়!

কী আছে আজ উৎপলার ? না স্বামী, না বা পুত্র-কন্যা—নাই একটা স্নেহের অবলম্বনও! জীবনকে নিজের কাছে রেখে দিনকয়েক উৎপলা স্নেহের ক্ষুধা মিটিয়েছিল। কিন্তু মিঃ সাহা, মিঃ গায়েন, বিকাশ এবং সমাজের বহু ব্যক্তিই ঐ পথে-পড়া ছেলেটার 'মা' সাজা সহ্য করতে চায় না। জীবন অপর্ণার ছেলে—চরিত্র-ভ্রষ্টা একটা ঝি'র পুত্র! কিন্তু কে চরিত্রবতী? কেই-বা ঝি নয়? সংসারে সকলেই তো ঝি-চাকরের কাজ করছে। কেউ টাকার গোলামী করে, কেউ-বা সম্মানের, কেউ

আবার ও-দুটোব সঙ্গে রিপুর কৃতদাস—তবু জীবন সমাজগতভাবে ঝি'র ছেলে এবং তার কোনো পিতৃপবিচয় নেই। পিতৃপরিচয়ও সংগ্রহ করেছিল উৎপলা, সাধু সিদ্ধেশ্বরের সম্মতিতে। কিন্তু এখানে বহু ব্যক্তিই জানে—জীবন অপর্ণার পুত্র। সিধুকে ওব বাবা হতে হলে—অপর্ণার স্বামী হতে হয়। অকলঙ্ক সিধুব চরিত্রে এই অপবাদ দিতে চায়নি অবন্তী, এবং উৎপলাও। তাই সিধুর সম্মতি পেয়েও উৎপলা বা অবন্তী খাতায় লেখেনি সিধুর নাম জীবনের 'বাবা' হিসেবে।

কিন্তু আজ যখন সিধু নিয়ে যেতে এল জীবনকে একটা মহান জীবন-পথে চালাবার জন্য, তখন উৎপলা বাধা দিল কেন! কেন ছেড়ে দিল না জীবনকে সিধুর সঙ্গে? নিজের চিন্তায় নিজেই বিস্মিত হোল উৎপলা। ভাবতে লাগলো—জীবন চোর হবে অথবা সাধু হবে,. তাতে উৎপলার কি এসে যায়? কিছুমাত্র না। বরং সিধুর সঙ্গে জীবনকে ছেড়ে দিলে, একটা ভাল পথে তাকে এগিয়ে দেওয়া হোত। নিজের কাছে তো তাকে রাখতে পারলো না উৎপলা! চাকরের মত রাখলে অবশ্য কারও আপত্তি করবার কথা ছিল না। কিন্তু উৎপলা তা পারে নি। সন্তানবৎ ওকে মানুষ করতে গিয়ে উৎপলা সব থেকে বেশী আঘাত পেয়েছে তার মা'র কাছে! নইলে সামাজিক মর্য্যাদাকে হয়তো উৎপলা অগ্রাহ্য করতে পারতো। পারিবারিক অশান্তি অবিশ্রাম দগ্ধ করছিল উৎপলাকে, তাই ওকে বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে দিতে বাধ্য হোল সে। এমন কি, ঐ বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়টি জীবনকে রাখবার জন্যই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা বললে বেশী বলা হয় না। কিন্তু, জীবনকে নিয়ে এতো ওর ভাবনা কেন?···

অকস্মাৎ উঠে পড়ল উৎপলা। নীচে ওঁরা সব বসে আছেন, দেখা করতে হবে। বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড় বদলে উৎপলা নীচে এল। বসবার ঘরে ঢুকবার পূর্ব্বেই শুনতে পেল, বিকাশ বলছে,

—'জলদর্চ্চি' এক বৈরাগী মনের অনাসক্ত সৃষ্টি। সিনেমার ছবিতে চাই বেগ-আবেগ—অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-অশ্রুর নিবিড় প্রকাশ। ওতে তার কিছু নেই। তবু আপনারা কেন যে ও-বই করতে চান, জানি না! উৎপলাকে খুসী করার জন্য যদি হয় তো, আমার কিছু বলবার নেই।

—ওতে ভাল ড্রামা তৈরী হতে পারে, বিকাশবাবু— বরুণ বলল,— বেগ বা আবেগ অথবা অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রনাট্য-লেখকের কাজ।

—কিন্তু জাতি-কুল-পরিচয়হীন সন্তান দিয়ে গল্পের আরম্ভ— মিঃ সাহা বললেন,— এ বস্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলাদেশে চলবে বলে মনে হয় না। 'সেন্সর' হয়তো আট্‌কে দেবে। আর, সেন্সর ছাড়লেও, জনসাধারণ চাইবে না—

—তবু আপনি ঐ বইখানা কেন ধরতে চাইছেন?— বিকাশ প্রশ্ন করলো।

—কারণ,— মিঃ সাহা বললেন— গল্পটা নানা দিক দিয়ে অসাধারণ; ওতে ঘটনার অভিনবত্বের সঙ্গে চরিত্রের অজ্ঞাত দিক চমৎকার ফুটেছে। কুমারী মাতার বাৎসল্য সত্যবতীকে স্মরণ করায়, কুন্তীকে কৃপার চক্ষে আনে আমাদের—বিদুর-জননীর অপ্রকাশ মাতৃত্ব ব্যথা জাগিয়ে তোলে! নারী-জীবনের এমন অসাধারণ প্রকাশ আমি আর দেখিনি। ওদিকে এক ভীষ্মবৎ নির্ব্বিকার যোগী—অনাসক্ত দ্রষ্টা। অন্যদিকে এক শ্রীকৃষ্ণবৎ পুরুষ নিয়তির মত নির্ম্মম, নিজের বংশনাশকে যিনি আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করেন…

—আপনি তো খুব রসজ্ঞ পাঠক, মিঃ সাহা!— বরুণ বলল প্রশংসা করে।

—না, এমন কী আর। তবে, দীর্ঘদিন নাটক নিয়ে কারবার করছি… মিঃ সাহার সলজ্জ কণ্ঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপলা এসে বসল আসনে। বিকাশ বল্‌ল,

—তুমি কি 'বিশ্ব-শিশুদের' দেখতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। সেই সন্ন্যাসী ওখান থেকে একটি ছেলে চান শিষ্য করবার জন্য—

—নিলেন? কাকে নিলেন?

—দিইনি। উনি জীবনকে চান। বলছেন যে, জীবন বড় সাধু হতে পারবে—

—সেই ঝি'র ছেলেটা?— কথার সঙ্গে বিকাশ হেসে উঠলো তীব্র ভাবে।

—ওর মা ঝি, বাবা হয়তো রাজাধিরাজ। হয়তো বড় কোনো ঋষি, হয়তো পরাশব! এখানে এমনও তো কেউ থাকতে পারেন, যাঁর বাবা রাজাধিরাজ হলেও, মা হয়তো নগরের আবর্জ্জনা—হয়তো পণ্যনারী··· ! – উৎপলার স্বর তিক্ত।

—তুমি চটে যাচ্ছ, উৎপলা, আমি হেরিডিটির কথা বলছিলাম···

—তোমার বা আমার, অথবা আমাদের কারো সেটা জানা নেই বিকাশ! সাধু সিদ্ধেশ্বর বলছিলেন যে, জীবনের শরীরে সাধু হবার লক্ষণ আছে। ঝি'র ছেলে ঋষি নারদ, মহাত্মা বিদুর। জেলেনীর ছেলে বেদব্যাস। জবালার ছেলে সত্যকামও তো জবালোপনিষদের রচয়িতা! এ-সব হয় সব দেশে, সকল সময়। কিন্তু যাক্,—এখানে কী কথা হচ্ছিল?

—'জলদর্চ্চি' বইখানাই আমরা চিত্রায়িত করতে চাই— মিঃ সাহা বললেন।

—আলোকের সঙ্গে কথা বলা দরকার— উৎপলা মৃদু কণ্ঠে বলল।

—হ্যাঁ, আমার দেখা হয়েছে আলোকের সঙ্গে। তার অমত্ নেই। সে চায় যে, তার গল্প এবং চরিত্রগুলি যথাযথ রাখতে হবে— বিকাশ বলল।

—ড্রামা তৈরী করতে হলে অনেক অদল-বদল করতে হবে — বরুণ বলল।

—তা হোক, মূল গল্প ঠিক থাকা দরকার। মেকী হাসি বা নাকী কান্না অথবা খামোখা বিয়োগান্ত বা মিলনান্ত করা চলবে না, এই তার মত্।

—তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হোল তার ?— উৎপলা প্রশ্ন করল।

—আমার বাড়ীতে। তাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—কেন ?— উৎপলার কণ্ঠে প্রভূত বিস্ময়— তুমি কি ছবির গল্পের জন্য তাকে ডেকেছিলে ?

—না। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।— হাসল বিকাশ কথাটা বলে ; বলল,— আলোক আমার সহপাঠী, বন্ধু। আজ আমি রাজনীতিক, সে লেখক। কিন্তু একদিন আমরা একসঙ্গে দর্শন আলোচনা করতাম…

—এখানে কি সে আসবে বলেছে ?

—না, ওরকম কোনো কথা আমি শুধোইনি তাকে। সে ব্যস্ত ছিল।

—মিঃ ম্যাকু তাহলে যাননি বোধ হয়— উৎপলা নিজের মনেই বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় গিয়েছিলাম— বলতে বলতে ম্যাকু প্রবেশ করলেন। বসতে বসতে বললেন,—আমার কথার বেঠিক হয় না, পলা দেবী ! তাছাড়া এটা আপনার কাজ। আমি সকালেই গিয়েছিলাম তার কাছে। সে বাড়ী ছিল না। ওখানে অঞ্জনা নামে যে-মেয়েটি থাকে, তাকেই বলে এসেছি। আলোক নিশ্চয় আসবে এখুনি।— মিঃ ম্যাকু কথাগুলো বলে গেলেন।

—না এলেও ক্ষতি নেই। সে আমাকে কথা দিয়েছে, 'জলদর্চ্চি'র ছবি করতে তার আপত্তি নেই। টাকাকড়ির কথা কিছু অবশ্য কইনি আমি। তবে, বইটার স্ক্রীন-রাইট কিনলে তো তাকে টাকা দিতে হবে ?

—নিশ্চয়। দশ হাজার টাকা আমরা দেব ও-বইএর জন্য— মিঃ সাহা বললেন।

—দশ—হা-জা-র! না-না-না, মিঃ সাহা, অত টাকা কেন দেবেন? দু'হাজার পেলেই আলোক বর্তে যাবে। থাকে তো একটা কাণাগলির আধভাঙা বাড়ীতে, এক খেয়ালী লোকের সেক্রেটারী হয়ে! প্রাইভেট মাষ্টার ছিল ঐ মেয়েটার। ওকে অত টাকা কেন দিতে হবে অনর্থক?···

মিঃ ম্যাকু সজোরে এবং সবেগে বলে গেলেন কথাগুলো। মিঃ সাহা নিঃশব্দে চেয়ে আছেন উৎপলার পানে। বিকাশও নীরব। বরুণ যেন গায়ে-পড়া ভাবেই বলল,

—দশ হাজার টাকা খুব বেশী দাম।

—আরে না-না-না, কোম্পানীর অতখানি লোকসান আমি কিছুতেই হতে দেব না। দশহাজার টাকা একটা গল্পের দাম! একি রবীন্দ্রনাথের গল্প!— আবার বললেন মিঃ ম্যাকু।

—মিষ্টার ম্যাকু!— মিঃ সাহা ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন— খেঁদী নামে একটা মেয়েকে, যার গুণের মধ্যে সে খুব কুৎসিত আর ঝগড়াটে—আপনি চারহাজার টাকা দিইয়েছেন 'জরদ্গব' ছবিতে ঝি'র পার্ট করবার জন্য। আর, একজন সত্যকাব সাহিত্য-শিল্পীকে দশহাজার টাকা দিয়ে সাহিত্যকে সম্মানিত করতে আপনি এত নারাজ কেন, জানতে পারি কি?

—না-না না···নারাজ নয়, আমি ন্যায্য মূল্য দিতে চাইছি। অর্থাৎ, আমার মতে ও-গল্পের দাম দু'হাজারের বেশী নয়। অবশ্য উৎপলা দেবীর মত্ ফাইন্যাল বলে বিবেচিত হবে।

—না— উৎপলা বলল,— ছবির জন্য আমি 'জলদর্চ্চি' নির্ব্বাচন-ই করিনি। বাংলাদেশে ও-বইএর ছবি করবার মত সাহসী কোম্পানী আজও গজিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ওর চরিত্রগুলো অসাধারণ

উলঙ্গ, গল্পটা অস্বাভাবিক আবেগহীন। ও যেন বৈশাখী সূর্য্যের প্রখর তাপ—কোথায় মাটি ফাটছে, দেখবে না; কোথায় জল শুকোলো, জানতে চাইবে না—তৃষ্ণায় কে কার বুকের রক্ত পান করলো, দরদহীন হাতে লেখক লিখে গেছে। বঞ্চিত প্রেম আর ক্ষুধিত মাতৃত্ব ওখানে নিয়তির মত অনিবার্য্য। মানুষ ও-বইএ মহাভারতের চরিত্রের মত. পুতুল—এক নিষ্করুণ চক্রই সব-কিছু চালনা করে! ও বই চলবার মত মন আজও তৈরী হয়নি দেশের!

উৎপলার কথার পর আর 'জলদর্চ্চি' সম্বন্ধে আলোচনা হবার কথা নয়, কিন্তু বিকাশ কিছু বলতে চায়; তার পূর্ব্বেই মিঃ সাহা বললেন,

—আমরা একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কিছুদিন আগে একখানা ছবিতে বিধবা তরুণীর তীর্থযাত্রা-পথে প্রেম করার কাহিনী চলতে দেখলাম—

—মানবতার দিক থেকে চলাই তো উচিত। বিধবা হলেই সে বিষাক্ত হয় না। তারও অন্তরে অমৃত থাকতে পারে।— বলল উৎপলা,— কিন্তু মিঃ সাহা, 'জলদর্চ্চি' বহু-টাকার ব্যাপার। লোকসান খেলে কোম্পানীর ক্ষতি হবে—

—না, একেবারে লোকসান খাবার ভয় নেই। অবশ্য ছবিটার 'ট্রিট্‌মেণ্ট' খুব ভালভাবে হওয়া দরকার। আলোকবাবু নিজে ভার নিলেই ভাল হয়। বরুণবাবু তাঁর সঙ্গে থাকবেন— মিঃ সাহা তাকালেন উৎপলার দিকে।

—আমার আপত্তি নেই। তবে আলোক কি করবে তা সে-ই জানে!

—চলুন না, যাওয়া যাক্ ওঁর ওখানে একবার— বললেন মিঃ সাহা।

—যাবেন?— বরুণ বলল— গেলে মন্দ কি হয়?

—বেশ তো, চলুন। আমি বাড়ী চিনে এসেছি। যেতে অসুবিধা হবে না।— মিঃ ম্যাক্ বললেন।

মিঃ ম্যাকুর কথার পর সবাই চুপচাপ। উৎপলাকেই কথার জবাব দিতে হবে। কিন্তু সে বসেই রইল চুপ করে। বিকাশ বলল,

—অকস্মাৎ এক অপরিচিত বাড়ীতে উৎপলার যাওয়া ঠিক হবে না--

—না, বিকাশ! অপরিচিত নয় অঞ্জনা— উৎপলা হাসলো।

—তবে?— বিকাশের কণ্ঠ তীক্ষ্ণ।

—আমার সাহস হয় না— উৎপলা মলিন হাসলো— পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র মানুষ, যার দৃষ্টির সামনে আমি পদ্মের মত বিকসিত হতে পারি। আবার, ঐ একটি মাত্র মানুষ, যার প্রখর কিরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে আমাকে পাতার আড়াল খুঁজতে হয়।

—জলেও বাস করতে হয়— বিকাশ বিদ্রূপ করলো।— কিন্তু কেন উৎপলা?

—মানুষের অন্তরের আত্মপ্রকাশকে বিদ্রূপ করো না, বিকাশ, ওতে নিজের আত্মার অসম্মান করা হয়। আলোক তোমার বা আমার কাছে অতি তুচ্ছ একটা প্রাইভেট মাষ্টার বা প্রাইভেট সেক্রেটারী, অথবা একটা দরিদ্র সাহিত্যিক—কিন্তু দীপের শিখার দাহিকা-শক্তি কিছু কম নয়, বিকাশ! তোমার গলার হীরের বোতামের থেকে তার দীপ্তি অনেক বেশী, তোমার প্রাসাদের থেকে তার পায়ের ধুলো মূল্যবান—এ সত্য তুমিও জানো।

—আলোক সম্বন্ধে তুমি কিছু বেশী উচ্ছ্বাস-পরায়ণা, পলা! এর কারণ, তুমি তাকে অহেতুক একটা প্রেমের চোখে দেখ। আলোক মহৎ, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তার ভয়ে তোমার লুকিয়ে থাকবার তো কোনো হেতু দেখি নে?

—ভয়ে নয়, বিকাশ, ভালবাসায়। আমার ভালবাসা শুকিয়ে যাবার ভয়ে ওর কাছ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই…

—এমন ঠুনকো ভালবাসার দাম কী, উৎপলা?— বিকাশ যেন রূঢ় হয়ে উঠলো।

—তুমি বুঝবে না, বিকাশ! ভালবাসা ঠুনকোই হয়। প্রেম ফুলের মত কোমল। এ তো কাম নয় যে, দেহ নিষ্পেষিত করে অর্ঘ্য দিতে হবে! একে সযত্নে সাজিয়ে রাখতে হবে পুকুরের পদ্মের মত দূরে দূরে। রাত্রে বুজে-থাকা পদ্মের প্রভাত-জাগরণ তুমি দেখনি, বিকাশ—মধ্যাহ্ন-সূর্য্যেও দেখনি তুমি পদ্মকে! তুমি দেখেছ—গোলাপ, শীতের অন্ধকার রাত্রেও যার অভিসার অনায়াস। কিন্তু থাক্ এসব কাব্য। আমার আত্মপ্রকাশের এটা স্থান, কাল, পাত্র নয়···

—আলোককে তুমি তো বিয়ে করলেই পার, উৎপলা!

—বিয়ে? না বিকাশ, বিয়ে করলে তোমাকেই করতাম। বর হিসাবে তুমি-ই বরণীয়।

—আলোক শুধু স্মরণীয়?— বিকাশের হাসিটায় ব্যঙ্গ বিচ্ছুরিত।

—হ্যাঁ। কিন্তু আলোচনাটা ব্যক্তিগত হচ্ছে, বিকাশ। তোমরা চাও তো, যাও আলোকের কাছে। আমি যদি কখনো যাই, তো একা যাব। অভিসারিকার মত যাব। 'জলদর্চ্চির' চিত্ররূপের জন্য আলোকের সঙ্গে আমি আলাপ করতে যাব না। আমি আজ ক্লান্ত আছি···উঠলাম—

উৎপলা উঠে চলে গেল। বিকাশ চুপ করে রয়েছে। মিঃ ম্যাকু বললেন,

—চলুন না, আমরাই চলুন যাই ওর বাড়ী। এই তো শ্যামবাজার?

কেউ কোনো কথা কইল না।

চৌরঙ্গীর পথে আসতে আসতে আলোকের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল, বড় একটা সুটকেস তার দরকার বাইরে যাবার জন্য। বাস থেকে

নেমে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে এ-পারের দোকানে আসছে, হঠাৎ ডাক শুনতে পেল,

—আলোক—ও আলোক—আলোক···

তাকিয়ে দেখলো এক শ্মশ্রুকেশধারী গৈরিকবাস সাধু ডাকছেন। কাছে এসেই চিনতে পারলো—সিদ্ধেশ্বর, পাশে এক মহিলা। ওরা ট্যাক্সিতে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, ট্রেনেব ক্লান্তি সর্ব্বাঙ্গে।

—কি রে সিধু? কোত্থেকে?

—আয়, উঠে বোস, আলোক—টালিগঞ্জে আয় আমাদের সঙ্গে। ওখানেই কথা হবে। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি— বলতে বলতে সিধু হাত ধরে টেনে নিল আলোককে ট্যাক্সির মধ্যে। ট্যাক্সি চলতে লাগলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আলোক বলল,

—কবে এলি তুই কলকাতায়? কেমন আছিস?

—আছি ভালই। বলছি সব কথা। এই মেয়েটির নাম নির্ম্মলা, আমার গুরুভগ্নী। আমরা গিয়েছিলাম··· বলে সিদ্ধেশ্বর বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয় সংক্রান্ত কথা বললো আলোককে। সব শেষে বলল,

—অবন্তী ওখানে ভালই আছে, আলোক! সে-ই আমায় ফিরিয়ে দিল।

—খুব ভাল করেছে, সিধু! সত্যিই সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছে সে। তোর আর কিছুতে জড়ানো উচিত নয়। —বলে আলোক আকাশপানে চেয়ে রইল গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়িয়ে। নির্ম্মলা নিশ্চুপ বসে ছিল। এতক্ষণে বলল,

—সিধুদা ওঁর সাধনার বীজ কোথায় রাখবেন ভেবে ঐ ছেলেটিকে নিতে চেয়েছিলেন···

—সাধনার বীজ আকাশে-বাতাসে থাকে, নির্ম্মলা-দিদি! ঋষিযুগের সাধন-মহিমা আজও এদেশের প্রতি পরমাণুতে রয়েছে, তাই সিধুর

পকেটে শালগ্রাম-শিলা ঢুকে তাকে সাধু করে—তাই অবন্তীর বঞ্চনার বেদনা অন্নপূর্ণার মাতৃমহিমায় বিকসিত হতে চায়! সহুরে অবন্তী সহধর্ম্মিণী হয়ে ওঠে, নাগরী অবন্তী নারীত্বের বিজয়নিশান উড়ায়। সাধনার বীজ সঞ্চিত রাখতে এখানে মহারুদ্র যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন—যাঁর দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি···শুভদৃষ্টি···পাষণ্ড সিধুকে যে-দৃষ্টি পরম পথে চালনা করেছে—

—আমার প্রশংসা করছিস, আলোক?

—না সিধু, কারও নিন্দা-প্রশংসার বাইরের এ কথা। এদেশের জল-মাটিতে যা জন্মায়, তার কথাই বলছি। এখানে বেশ্যা হয় ব্রতচারিণী, স্বৈরিণী হয় সহধর্ম্মিণী! এদেশে লাম্পট্যের মধ্যে থাকে স্বর্গীয় প্রেম—দস্যুতার মধ্যে দাতাকর্ণের মহত্ব।

—কিন্তু আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, আলোক! সেই জল-মাটি-হাওয়ার জোর যেন কমে আসছে। ক্রমশঃ যেন আমাদের মানবধর্ম্মও বিসর্জ্জন দিতে চলেছি···

—ও কিছু না। মহাকাল জেগে রয়েছেন সর্ব্বদা— আলোক বলল,—ধর্ম্ম ছাড়া এদেশের আর কোনো সম্বল নেই, সিধু! এদেশের যা-কিছু গৌরব সব ধর্ম্ম নিয়ে। ত্রিশরণ মন্ত্র বা পঞ্চশীলের কথা ঐ ধর্ম্ম থেকেই এসেছে। সাময়িক গ্লানি এখানে জাগে, কিন্তু সেটা একান্ত সাময়িক। তার প্রয়োজন শুধু ধর্ম্মকে যুগোপযোগী করবার জন্য। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ধরেই টিঁকে থাকবে শুধু নয়, সগৌরবে গুরু হয়ে থাকবে মানুষের।

পথ শেষ হোল। গাড়ী এসে থামলো নির্ম্মলার বাড়ীর দরজায়। নির্ম্মলা সাদর আহ্বান জানালো আলোককে নামবার জন্য। কিন্তু আলোক বলল,

—আপনারা ক্লান্ত। এখন আর আমি গিয়ে কি করবো! আজ যাই, আর একদিন কথা হবে—

—না, আমরা হয়তো আজই রাত্রের গাড়ীতে চলে যাব। আসুন আপনি—

আলোক আর কথা বাড়ালো না, ঢুকলো ওদের সঙ্গে ভেতরে। ভাল গাড়ীতে ভাল ক্লাশে এসেছে ওরা, খুব বেশী ক্লান্ত তাই হয়নি। শুধু গরমের জন্য শরীর কিছু অবসন্ন। কিন্তু সিধু সন্ন্যাসী মানুষ, কৃচ্ছ্র সাধন ওর করায়ত্ত। বাথরুমে ঢুকে মগ-কতক জল ঢেলেই ও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। নির্ম্মলাও স্নান করে কাপড় ছেড়ে এল। আলোক চুপচাপ বসে একখানি গীতার পাতা উল্টাচ্ছিল। সিধুর ঝোলার সম্পদ ওই গীতাটি। পূজা করে। পাঠ করে সময় সময়।

—তুই কি কোনো আশ্রমে থাকিস, সিধু? কিম্বা গুহাতে?—

—আশ্রমেই থাকতাম। এখন থাকি দূর-পাহাড়ে, একটা কুঁড়ে বেঁধে। চণ্ডীপাহাড় নাম। যদি কখনো যাস, ওখান হয়ে আসিস, আলোক! স্থানটি খুব মনোরম। তোর পছন্দ হবে। কিন্তু তোর ঘর-সংসার কি, আলোক? বিয়ে তো করেছিস?

—না। বিয়ে আর করবো না— আলোক বলল হেসে।

—তাহলে কি সন্ন্যাস নিবি শেষটায়?

—না সিধু, সন্ন্যাস আমার ধর্ম্ম নয়। আমি শুধু দেখে যাব পৃথিবীতে কত দেবাত্মা মানব আছে, আবার মানবরূপী দানব আছে! আমি দেখবো, মহাকাল কেমন করে জীবনকে জন্ম-জরা-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মহামানবতার পথে নিয়ে চলেছেন! দেখবো,—আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসের অন্তরালে কেমন করে বিশ্ব-কল্যাণের সঞ্জীবনী লুকিয়ে থাকে! এই আমার সাধনা।

—ও খুব বড় সাধনা, আলোক! কিন্তু, ওগুলো ক্ষুরধার চিন্তার রাজ্য। অধ্যাত্ম রাজ্য অন্য-একটা ব্যাপার—যেখানে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অসীম হয়ে যায়—

—হ্যাঁ, সিধু! কিন্তু সে-জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাজে লাগে না। নিরাকার ব্রহ্মধ্যানে ব্যক্তিগত ব্রহ্মানন্দ লাভ হতে পারে, সমষ্টিগত লাভ ওতে খুবই কম। তাই বলে আমি তোকে নিরুৎসাহ করছি না। যে পথে তুই চলেছিস, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু আমাব পথ ভিন্ন। আমি অনন্তকাল ধরে বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করতে চাই সাধারণ জীব আর জগতের মধ্যে। অতীত যুগের সঙ্গে অনাগত যুগেব সেতুবন্ধনটি কেমন অপরূপ কৌশলে হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি দেখবো—যিনি ঐ সেতুবন্ধন রচনা করেন, তাঁকে না-দেখলেও আমি ক্ষতি বোধ করি না। আমি অভিনয় দেখছি, নাট্যকারকে নাই-বা দেখলাম!

—আমি তোকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে পারবো না, আলোক। আমি বিশ্বাস করি তোর সাধনা আরো মহান, আরো উচ্চাঙ্গের। কিন্তু এও সত্য যে, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণশীল সাধুদের ব্যক্তিগত কল্যাণচিন্তা পৃথিবীর সমষ্টিগত কল্যাণও প্রসব করে—

—হ্যাঁ, করে। সেই কথা এখানে এসেই বলেছিলাম। আজও ঋষিযুগের সাধনশক্তি এদেশেব আকাশে বাতাসে কল্যাণ-প্রসূ হয়ে রয়েছে বলেই, এদেশের এত গৌরব। স্বাধীন ভারতে এইজন্যই কল্যাণরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করে, পঞ্চশীলের পরিকল্পনা হয়—মানুষের আত্মঘাতী যুদ্ধোন্মাদনাকে নিরস্ত করতে শান্তির বাণী বহন করে চলে ভারত দেশে দেশে। কিন্তু মহাকাল কী যে করবেন—বলা যায় না, সিধু! তিনি নিয়তির মতই নিষ্ঠুর। মূর্তি তৈরী করতে ছেনীর ঘা দিতে তিনি কার্পণ্য করেন না—

সিধু নিঃশব্দে বসে রইল। আর কোনো কথা বলবার মত নেই যেন তার। আলোক এবার উঠবে; ওকে যেতে হবে শ্যামবাজার—অনেকদূর রাস্তা, কিন্তু সিধু হঠাৎ বলল,

—একটা অনুরোধ আছে, আলোক! রাখবি?

—কি ? বল !—আলোক অপেক্ষা করতে লাগল।

—জীবন নামে যে ছেলেটি থাকে ঐ শিশু-বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি তাকে দীক্ষা দিয়ে সাধনার পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। উৎপলা দেবী দিতে চাইলেন না। কে জানে কেন, তিনি পছন্দ করেন না ওর সাধু হওয়া। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেছি আমি। ওকে সুযোগ দেওয়া দরকার। আমার অনুরোধ, তুই ওকে মানুষ করবার ভার গ্রহণ কর। ও একটা অসাধারণ মানুষ হবে।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ— আলোক হেসে উঠলো। বলল—তোর সাধন-ভজন কিছুই হচ্ছে না, সিধু, বৃথা ঘুরে মরছিস। জীবন কী হবে বা না-হবে, তা নিয়ে তোর অত মাথাব্যথা কেন? কে কী হবে তা কেউ জানে না। জীবনকে যিনি জননীর গর্ভে এনে এতবড় করেছেন, তিনিই ওকে মানুষ বা অমানুষ, যা খুসি করবেন। তোর বা আমার ইচ্ছেতে কিছুই হয় না, সিধু—ঐ পাতাটিও পড়ে না। এ বোধ তোর হয়নি আজও? কী তবে করছিস বনে-জঙ্গলে ঘুরে?

—আমি ওর মধ্যে সাধুর লক্ষণ দেখেছি, আলোক— সিধু আত্মসমর্পণ করছে যেন।

—বেশ, ওর সাধু হবার হয় তো, যিনি লক্ষণ দিয়েছেন, তিনিই সেটা করবেন। এখানে তোর আমার কর্ত্তৃত্বের মূল্য কি? তুই চেষ্টা করেছিলি, এই যথেষ্ট। এখন নিজের গুহায় গিয়ে সাধনা কর। তোর যে পথ, সে পথে আত্মকর্ত্তৃত্ব অহঙ্কারের দ্যোতক। অবন্তীকে আমি আজ প্রণাম জানাচ্ছি, কারণ সে সত্যি তোর সহধর্ম্মিণীর কাজ করেছে তোকে ফিরিয়ে দিয়ে। তোদের দেহজ কাম আজ প্রেমজ পরাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সিধু! আজ অবন্তী তোর সত্যকার সাধন-সঙ্গিনী।

সিধু নির্ম্মিমেষ চোখে চেয়ে ছিল আলোকের পানে। কথা শেষ হলে বলল,

—এমন করে আমি হয়তো বলতে পারবো না, আলোক—তবে তোর এই কথাই আমি সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করছি—সন্ন্যাস না নিয়েও তুই সাধক, তুই চির সন্ন্যাসী! অবন্তীকে আমি কখনো স্পর্শ করিনি। আমি জানি, অবন্তী দুশ্চারিণী, অবন্তী অসতী। কিন্তু ঐ অবন্তীই আমার জীবনে আজ ইষ্টদেবী হয়ে উঠলো, আলোক—

সিধুর কথা আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল। আলোক হেসে বলল,

—নিজেকে নিস্পৃহ কর, সিধু, শুধু দেখে যা সেই বিশ্বনিয়ন্তার ধ্বংস আর সৃষ্টি, সৃষ্টি আর ধ্বংস! অবন্তী কী হবে তা আমরা জানতাম না। তুই কী হবি, তুই কি জানতিস? মানব-জীবন এমন অজ্ঞাত এক রহস্য-পারাবার যার কূল নেই, পার নেই। এই দৃশ্যমান জীবনেই যখন এত রহস্য, এত দুর্গমতা—তখন জীবনের পর জীবনকে জানার সাধনা কত কঠিন, কত মহৎ, কত আনন্দময়—অনুভব কর, সিধু! মুক্তি নিয়ে কি হবে? এই বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করার মধ্যে কি আনন্দ নেই?

সিধু চুপ করে রইল। নির্ম্মলা নিশ্চুপ বসে শুনছিল ওদের কথাবার্ত্তা। আলোকের কথায় ওর অন্তরে অনেক ভাবের আলোড়ন জেগেছে। এতক্ষণে বলল,

—বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে নিজেকে যে জড়িয়ে ফেলতে হয়, আলোকদা···

—কিছুটা পড়তে হবেই। তবে পাঁকাল-মাছের মত থাকার চেষ্টা করতে হয়। দেহে যদিও পাঁক লাগে, মনকে রাখতে হবে নির্ম্মল। সাধনার এটা গোড়ার কথা, দিদি! আপনারা এই পথে চলছেন, আমি এ বিষয় কি বলবো? আমার ধারণা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে নিজেকে নিস্পৃহ এবং নির্ব্বিকার করতে পারলেই সাধনা হয়, সিদ্ধি

হয়। সবই লাভ হয়। এর জন্যে গিরিগুহা বা বন-জঙ্গল হাতড়ে বেড়ানো নিরর্থক। অনশন বা অর্দ্ধাশনেরও প্রয়োজন নেই। বিশ্বলীলায় তিনি থাকুন বা না-থাকুন, লীলা তো প্রত্যক্ষ! সেটা দেখতে জানলে যে আনন্দ লাভ হয়, আপনাদের ভূমানন্দ থেকে তা কম কিসেব ?—হাসলো আলোক— অবশ্য 'ভূমানন্দ' কি, আমি জানি না। কিন্তু সিধু, অনন্ত বিশ্বের স্বজন-পালন-লয়ের কর্ত্তাকে তুই কয়েকটা প্রাণায়ামের 'দম' টেনে আর কয়েক হাজার 'নাম' জপ করে জেনে ফেলবি—এই-বা কেমন দুঃসাহস ?

—সত্যিই দুঃসাহস, আলোক, তাঁব কেউ ইতি করতে পারেনি!

—এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, সিধু, তবু এইটুকু বিশ্বাস কবি যে, কে কী হবে—কেউ জানে না। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ হয়তো একে আমার মানসিক দুর্ব্বলতা বলবে। বলুক। তবু এটা সত্য যে, সৃষ্টিলীলায় কিছুর উপর কারো হাত নেই।

আলোক উঠলো। নির্ম্মলা এসে প্রণাম করলো ওকে। নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করে সে বেরিয়ে যাচ্ছে, নির্ম্মলা অতি সংক্ষেপে বলল আলোককে তার আশ্রমবাসের কাহিনী। আলোক সব শুনেও চুপ করে রয়েছে।

নির্ম্মলা কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকার পর বলল,

—আমার আর কলকাতায় একদণ্ড থাকার ইচ্ছে নেই। কিন্তু যেখানে ছিলাম, সেখানেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করি না। আমি কী করবো, আলোকদা? কোথায় থাকবো আমি? —নির্ম্মলার কণ্ঠে কাতরতা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

—এতবড় বিশ্বরাজ্যে থাকবার অভাব হবে না, নির্ম্মলাদি! বিশেষতঃ তুমি অর্থহীন নও। আপাততঃ এখানেই তুমি থাকতে পারবে কিছুদিন—

—না, আলোকদা, এখানকার ঠিকানা সেই আশ্রমের লোকেরা জানে। আমাকে তারা এখানে থাকতে দেবে না। যদি ওখানে ফিরে না যাই তো, ওদেব আশ্রমের গুপ্তকথা ফাঁস হবার ভয়ে আমাকে ওরা কী না করতে পারে?

—বল কি, নির্ম্মলাদি!

—কিছু বেশী বলছি না।

আলোক শুধু চুপ করে রইল দীর্ঘক্ষণ। নির্ম্মলা ওর উত্তরের প্রত্যাশায় বসে থেকে শেষে অধীর হয়ে বলে উঠলো,

—আমি তাহলে অবন্তী দেবীর বিশ্ব-শিশুবিদ্যালয়ে যোগ দিই গিয়ে—

—না— আলোক বলল,—না নির্ম্মলা, ওকাজ তোমার নয়। তুমি নারী হলেও ঠিক 'মা' নও; নায়িকাও নও তুমি, তুমি সাধিকাও নও। তোমার মধ্যে রাজনীতির সাধনা লক্ষ্য করেছি, ধর্ম্মনীতির সাধনাও লক্ষ্য করলাম। এখন তুমি সমাজনীতিতে গেলেও একই ফল হবে। তুমি পাশ করতে পারবে না। তোমার ঐ আশ্রমে ফিরে যাওয়াই উচিত।

—আমাকে আবার ওখানে যেতে বলছেন!

—হাঁ। ওখানে যতটা ক্ষতি তোমার হবার, তা হয়েছে। এবার ওখানে থেকেই আত্মসংশোধন কর কিছুদিন। তার পর ঈশ্বর যেমন করাবেন, তাই করবে।

—কেন একথা বলছেন, আলোকদা!— নির্ম্মলার চোখ অশ্রুপঙ্কিল হয়ে উঠলো।

—তুমি অকালে ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে বাহাদুরি দেখাতে গিয়েছিলে, নির্ম্মলা, তাই তোমার পতন ঘটলো এভাবে। ভোগ পূর্ণ না হলে ত্যাগ করা যায় না। তোমার এখনো সময় হয়নি। ওখানেই তুমি ফিরে যাও—

নির্ম্মলা আর কিছু বলল না। আলোক চলে যাওয়ার পর সামান্য

জলযোগ করে ওরা শুয়ে পড়ল। ভোরে উঠেই রওনা হয়ে গেল যে যার ঠিকানায়।

আশ্রমের কামরায় সীমা একাকিনী। বেশ বুঝতে পারছে যে তাকে বন্দী করা হয়েছে, যদিও বাইরে থেকে বুঝবার কোনো উপায় নেই যে সে বন্দিনী। খাবারের থালাটা পড়ে আছে। সীমা খায়নি। বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে—সীমা শোবে কিনা, কে জানে! নিশ্চুপ বসে বসে ভাবছে। রাত দশটার বেশী।

কেন এরা সীমাকে বন্দী করলো! সীমার সঙ্গে এখনো বড় জোর শ'খানেক টাকা আছে, আর যে সামান্য অলঙ্কার এবং হাতঘড়িটা রয়েছে তার মূল্য চার-পাঁচশো টাকার বেশী নয়। এতো অল্পের জন্য এরা নিশ্চয় একজন নারীকে বন্দী করবে না—সীমা ভাবছে, আর একটা বস্তু আছে, সীমার রূপ-যৌবন এবং সতীত্ব। সতীত্ব কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই সীমার হাসি পেল। কিন্তু সীমা তো এখনও দ্বিচারিণী হয়নি!—তার সতীত্ব সে রক্ষা করবে। তার নারী-মর্য্যাদার হানি ঘটতে দেবেনা সীমা—যা হবার হোক!

সীমা আহার্য্য স্পর্শ করলো না, চুপ করে শুয়ে পড়লো বিছানায়—ভাবলো, সে কিছুতেই ঘুমুবে না। কিন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে! দূরের ট্রেনের আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখলো, ভোর। পশ্চিমগামী ভোরের ট্রেন জংশন ষ্টেশনে দাঁড়ালো এসে। সীমা উঠে বসলো বিছানায়। না-খাওয়ার জন্য শরীর অবসন্ন। মনের জোরে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল আশ্রমের বাগানে।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আশ্রম। সুমুখের গেটে দুজন সন্ন্যাসী দাঁতন করছেন গাছের ডাল দিয়ে। সীমা বুঝলো, দাঁতন করবার সঙ্গে

গেট পাহারা দিচ্ছেন ওঁরা। সীমা খানিক দূরে দূরে বেড়াতে লাগল। গেটের সামনে থামলো একটা সাইকেল-রিক্সা; নামলেন স্যুটপরা এক ভদ্রলোক। দুটো স্যুটকেস আর প্রকাণ্ড একটা বেডিং তাঁর সঙ্গে। সেগুলো নামিয়ে, ভাড়া চুকিয়ে তিনি গেটের ভেতর এসে প্রশ্ন করলেন,

—নির্ম্মলা দেবীর সঙ্গে এখন দেখা হবে তো?

—না। তিনি কলকাতা গেছেন। আসুন, ভেতরে আসুন—

স্বাগত জানালেন সন্ন্যাসীরা। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে কিঞ্চিৎ কাছাকাছি আসতেই সীমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো—সীমা চেনে ঐ ভদ্রলোকটিকে। উনি-ই ডাঃ গুহ! সীমা কেমন-যেন অভিভূত হয়ে উঠলো। সে ছুটে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় পালাবে? চারিদিকে সুদৃঢ় সুউচ্চ প্রাচীর। অভিমন্যুর মত সীমা এই আশ্রম-ব্যূহে ঢুকে পড়েছে। নির্গমনের পথ জানা নেই। এখানে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত হয়ে ওকে অপমৃত্যু বরণ করতে হবে!

ডাঃ গুহ এইদিকেই আসছেন। সন্ন্যাসী দুজন বয়ে আনছেন তাঁর স্যুটকেস আর হোল্ড-অল। সীমা একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালো। কিন্তু ডাঃ গুহ ওকে দেখে ফেলেছেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন,

—সীমা! তুমি এখানে?

—হ্যাঁ— নিরুপায় সীমা স্খলিত কণ্ঠে জবাব দিল ঝোপের আড়াল থেকেই।

—নির্ম্মলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না, আমি আসার আগেই নির্ম্মলাদি কলকাতা চলে গেছেন।

—তুমি এখানে কেন এসেছ, সীমা? এমনি বেড়াতে?

—হ্যাঁ— বলে সীমা পাশ কেটে চলে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডাক্তার গুহ তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসী দুজনকে বললেন,

—এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আপনারা আমার জিনিষগুলো নিয়ে যান যেখানে যাবার, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—ওর সঙ্গে পরে কথা বলবেন। আসুন, মুখহাত ধুয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে কিছু খান•••

—না— ডাঃ গুহ যেন ধমক দিলেন ওদের— আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। যান আপনারা—

সন্ন্যাসী দুজন কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন—তবু কিন্তু তাঁরা যাচ্ছেন না। ডাঃ গুহর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। সরোষে বললেন,

—ও আমার বিশেষ পরিচিতা। আত্মীয়া। ওর সঙ্গে কথা বলবো, সেখানে আপনারা সঙ-এর মত দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন? যান—

সন্ন্যাসীরা আর কিছু বলতে সাহস করছেন না—চলে যাবেন—কিন্তু একজন বললেন,

—কোনো আশ্রমবাসিনীর সঙ্গে বিনা অনুমতিতে কথা বলা নিষিদ্ধ।

—বলেন কি! কেন? কতদিন থেকে ও আপনাদের আশ্রমবাসিনী?

—বেশিদিন না হলেও, ও আশ্রমের কন্যা—আপনি গুরুজির অনুমতি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। আমরা এখানকার আইনের দাস।

—আচ্ছা। চলুন— ডাঃ গুহ বললেন,—আপনাদের আইনটাই দেখা যাক্—

ওরা সবাই এগিয়ে গেলেন। একটা ঝোপের আড়াল হয়ে গেলেন সবাই। সীমা এবার এসে তার কুঠরীতে ঢুকবে—শর্ম্মিষ্ঠা এল—

—তোমার সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের পরিচয় আছে নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু উনি কেন এখানে এসেছেন?

—জানি না। হয়তো আশ্রয় নেবেন এখানে।— বলে শর্ম্মিষ্ঠা হাসলো।

—উনি তো আশ্রমবাসী হবার মত লোক নন— সীমা বলল।

—আজকাল আশ্রম বহু এবং বিচিত্র, সীমাদি! এইটাই হয়তো ওঁর উপযুক্ত আশ্রম—

সীমা আর কথা বললো না, হাতমুখ ধুতে গেল। ফিরে দেখলো, প্রসাদী প্রাতরাশ নিয়ে শর্ম্মিষ্ঠা অপেক্ষা করছে। সীমা ফিরতেই বলল,

—রাত্রে খাওনি কেন, সীমাদি? ভয়ে?

—না। ভয় কিছু করি না। প্রবৃত্তি হয়নি। সব খাদ্য রুচিকর হয় না, শর্ম্মিষ্ঠাদি!

—ক'দিন না-খেয়ে থাকতে পারবে?

—কেন! এখানে থাকতেই হবে, এমন তো'কথা নেই। চলে যাব।

শর্ম্মিষ্ঠা আর কিছু বললো না, হাসলো শুধু। সীমা প্রাতরাশও গ্রহণ করলো না। শর্ম্মিষ্ঠা দেখলো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে; তার পর বলল,

—নির্ম্মলাদি না-আসা পর্য্যন্ত তুমি যেতে পাবে না। না-খেয়ে থাকবে কি করে? খেয়ে নাও। খাবাবে বিষ তোমাকে দেওয়া হয়নি।

—অমৃত দিলেও আমি খাব না।—নিজের বিছানাটায় বসলো সীমা।

—তোমার যা-খুশী কর— বলে শর্ম্মিষ্ঠা চলে গেল বেরিয়ে। সীমা আকাশ-পাতাল ভাবছে বসে-বসে!

ডাঃ গুহ কেন এলেন এখানে! সীমা-যে এখানে এসেছে, তা তো ডাঃ গুহর জানবার কথা নয়। কারণ, দীপ্তিদি ছাড়া সে খবর অপর কেউ জানে না। আর, সীমা যেদিন নওকিশোরের কাছে খবর পেয়ে খোকাকে ঘরে এনেছে, সেইদিন থেকে সে আর নিজের ঘরে বাস করেনি; একটা মেয়ে-বোর্ডিংএ থাকতো। তার ঠিকানা কারো জানা নেই। তবে ডাঃ গুহ জানলেন কি করে যে, সীমা এখানে এসে রয়েছে!

কিছুই ঠিক করতে পারছে না সীমা। অথচ ডাঃ গুহ যখন এখানে এসেছেন তখন কিছু একটা ব্যাপার ভেতরে রয়েছে, এই ওর ধারণা

হোল। নির্ম্মলাদি নাকি কোন্ এক ডাক্তারকে আনতে কলকাতা গেছেন। তাহলে কি সেই ডাক্তার এই ডাঃ গুহ? প্রশ্নটা মনে জাগার সঙ্গেই উত্তর পেল সীমা—ইনি ছাড়া কে আর হবেন? নির্ম্মলাদি তো ভালই চেনেন এই ডাঃ গুহকে!

চেনে সীমাও। খুবই ভাল চেনে। বালবিধবা নির্ম্মলা কুমারী-পরিচয়ে কলকাতায় পড়তে এসে বিপন্না হয়—ডাঃ গুহ তাকে বিপদ্‌মুক্ত করেন। কর্ণবিজয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দলভুক্ত অবস্থাতেই ঘটে নির্ম্মলার জীবনে এই বিপর্য্যয়। সীমা তখন হেসেছিল প্রচুর, বিদ্রূপ করেছিল বিস্তর। কিন্তু কে জানতো, ঐ ডাক্তার গুহ আবার তারও জীবনে আবির্ভূত হবেন অন্য রূপে! হ্যাঁ, নির্ম্মলাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সীমা পড়লো ডাঃ গুহর ফাঁদে—ধনী অভিজাত পরিবারের কন্যা সীমা! শিক্ষিতা, সুন্দরী সীমা—খ্যাতিমান পিতার কন্যা সীমা ডাক্তার গুহকে ভালবাসলো, কী দেখে কে জানে! কিন্তু ডাঃ গুহ শুধু তার জীবনটাকে জ্বালাময় করে দিয়েই সরে দাঁড়ালেন।…না, তাঁর হাসপাতালে ঠাঁই দিয়ে সীমাকে বিপদ্‌মুক্ত করতেও চেয়েছিলেন তিনি! কিন্তু সীমা ঐ হাসপাতালের ঝি রুক্‌নীর সঙ্গে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। তারপর তিন-চার বছর কেটেছে—কতদিন, ঠিক মনে নেই সীমার। মনে হয়, এক যুগ—সীমা আর ডাঃ গুহর ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। অকস্মাৎ আজ ডাঃ গুহকে দেখে ওর মনে হচ্ছে, সবই নিয়তি। হয়তো আরো কিছু বিরাট দুঃখ আছে সীমার কপালে, তাই এখানে ডাঃ গুহর আবির্ভাব!

অকস্মাৎ ঘরের দরজা ঠেলে শর্ম্মিষ্ঠা ঢুকলো, সঙ্গে ডাঃ গুহ। সীমা সোজা হয়ে বসে তাকাল ওদের পানে। শর্ম্মিষ্ঠা চলে গেল। ডাঃ গুহ কোমল কণ্ঠে বললেন,

—শুনলাম, তুমি নাকি কাল থেকে কিছু খাওনি?

—না— সীমা জবাব দিল,— খেতে ইচ্ছে করে না আমার।

—বেশ, এখানে খেতে হবে না। তোমার বিছানা বেঁধে নাও। আমরা এখনি যাব।

—কোথায় ?— সীমা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—যেখানে হোক, চল। আমি তোমায় নিয়ে যেতেই এসেছি। অবশ্য আমি জানতাম না যে, তুমি এখানে আছ। বিস্তর খোঁজ আমি করেছি তোমার। তুমি তো বাড়ীতে ছিলে না ?

—না, আমি একটা মেয়ে-বোর্ডিংএ থাকতাম। কিন্তু কেন আমার খোঁজ করলে ?

—নওকিশোরের মুখে খবর পাই যে রুক্নী-ঝি মারা গেছে। ছেলেটাকে সে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কোথায় সে ?

—জানি না— সীমা আকাশের পানে চাইল। বুকের ব্যথা ওর আর কেউ বুঝবে না!

—জান না ?— ডাক্তার গুহ পাংশু হয়ে গেলেন— জান না কি, সীমা ?

—না। জানি না— সীমা সরোষে বলল,—আজ আবার তার খোঁজ কেন ? পিতৃপরিচয়হীন একটা জঞ্জাল—কি হবে তার খবর নিয়ে ?

—সীমা— ডাক্তার গুহর স্বর আটকে যাচ্ছে— সে বেঁচে আছে তো সীমা ?

—জানি না— সীমা আবার বলল একই কথা।

নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন ডাঃ গুহ প্রায় মিনিটখানেক, তার পর বললেন,

—হাজার শিশুকে আমি হত্যা করেছি, সীমা— তাদের আত্মার আর্ত্তনাদ আমাকে জীবন্তে নরক-যাতনা দিচ্ছে। একটাকে তুমি হত্যা করতে দাওনি, যেটা আমার নিজের। সীমা, সত্যি বল—সে কি বেঁচে

নেই? যদি বেঁচে থাকে তো, আমি আজই পৃথিবীর কাছে প্রচার করবো—সে আমার সন্তান··· বল সীমা—

ডাক্তার গুহর কণ্ঠের করুণ মিনতি সীমাকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারলো না। নিঃশব্দে সে বসেই রইল। ডাক্তার গুহ বুঝলেন, ছেলেটা বেঁচে নেই। চোখের কোণে জল এল তাঁর। ধরা গলায় বললেন,

—নওকিশোর আমাকে খবর দিয়েছে, সে তোমার কাছে ছিল··· সত্যি ছিল, সীমা?

—ছিল— সীমা এতক্ষণে বলল,—কিন্তু আমি তাকে কেমন করে রাখতে পারি? যে সামাজিক মর্য্যাদা পেলে, তাকে আমার কাছে রাখা আনন্দময় হোত—তার থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পর আজ আবার প্রশ্ন কেন!

—সে কোথায় আছে?

—জানি না। তাকে আমি এক অপুত্রক দম্পতির হাতে দান করে ফেলেছি। সে এখন কোথায়, আমি জানি না। তার খোঁজে এসেই আমার আজ এই অবস্থা!

—সে তাহলে বেঁচে আছে? বেশ, চল, আমরা খোঁজ করবো। দেশে দেশে খুঁজব তাকে। চল সীমা, ওঠ—আজই যেতে হবে, এক্ষুনি।

—তোমার সঙ্গে কোন্ অধিকারে যাব আমি? কে তুমি আমার!

—চল—ঐ মন্দিরে আজই তোমাকে সব অধিকার দিচ্ছি, এসো। ওঠো—

সীমার হাত ধরে ওঠালেন তাকে ডাক্তার গুহ। সীমা কাঁপছে আবেগে-উদ্বেগে—আশা-নিরাশার উচ্ছ্বসিত ছন্দে! বলল,

—সন্তান-স্নেহ তোমারও আছে তাহলে?

—ওর থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই, সীমা! জীব-জগতে ওর মত শক্তিশালী কিছু নেই আর। পুরুষ বা নারী প্রেম করতে পারে যেখানে-সেখানে, যার-তার সঙ্গে, যতবার ইচ্ছে—সে সম্পর্ক সামাজিক, পাতানো। সন্তান-স্নেহ প্রাকৃতিক, স্বভাবজ। প্রতি জীবের মধ্যে ওর আবেদন অনিবার্য্য; ওকে অস্বীকার করা নিতান্ত মূঢ়তা।

—এ সত্য এতো দেরীতে বুঝলে কেন! নতুন কিছু ঘটেছে নাকি তোমার জীবনে?

—হ্যাঁ! সামান্য একটু ঘটেছে। তুমি জানো না, অবন্তী নামে একটি অসাধারণ তরুণীর দিকে আমার আকর্ষণ ছিল, যাকে বিয়ে করবার জন্য তোমাকে এড়িয়ে চলছিলাম এতদিন। সে একজনের বাগ্‌দত্তা, এই জানতাম। কিন্তু বছর তিন-চার তার কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে জানতে পারলাম, সে একটা শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশের পরিত্যক্ত সন্তানদের প্রতিপালন করছে। সেখানে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করলাম—

সুটকেসটা গোছাতে গোছাতে মৃদু হাসছিল সীমা—ডাঃ গুহর কথার শেষে বলল,

—বিয়ে করতে চাইল না সে তোমার মত বরকে? আচ্ছা মেয়ে তো!

—না সীমা, শোন। সে বাগ্‌দত্তা যাঁর সঙ্গে, তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। অতএব সেই অবন্তী অপর আর কাউকে বিয়ে করবে না; শুনে, অবাক হয়ে গেলাম। বর্ত্তমান যুগে এমন অসাধারণ নিষ্ঠা শুনেছো কোথাও?

—না। এ যদি সত্যি হয় তো, অবন্তীর চরিত্র এযুগের নয়। কিন্তু তাতে তোমার কি?

—শোনো—তার আশ্চর্য্য সতীধর্ম্মে আমি মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলাম…

—তুমি মুগ্ধ হলে?— সীমা যেন বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করছে!

—সীমা! সৃষ্টির জীবের মধ্যে শুধু মানুষেরই আত্মজ্ঞান (self-consciousness) আছে বলেই সে মহৎ। মানুষ যতই দুরন্ত-দুর্বৃত্ত হোক, সে অমৃতের পুত্র। আদর্শের মহত্ত্বে তার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কিন্তু শোনো—প্রশ্ন করলাম, তাকে সন্ন্যাস নিতে দিলেন কেন? উত্তরে সে কি বললো জানো? বললো,—'আমার স্বামী সৃষ্টির মানসস্রোতে মহত্ত্বের বীজ বপন করছেন! আমাকে গোটাকতক সন্তান দেওয়ার থেকে সে-কাজ অনেক বড় কাজ'—

—ওরে বাপ! এই রকম বলল?— সীমা অবাক চোখে তাকালো।

—হ্যাঁ— আরো বলল—অতি সহজ কথায় বলল,—'আমার স্বামীর বিরাট মহৎ পিতৃত্বের আমি সমান অংশীদার—আমি মা! আজ এখানকার একশো সন্তান আমাকে "মা" বলে—একশো কোটি সন্তান আমাকে একদিন "মা" বলবে! আমার স্বামী হবেন তাদের পিতা।'—

—অসাধারণ মেয়ে! কিন্তু তোমার পরিবর্ত্তনটা হোল কোথায়, আর কেমন করে?— সীমা সুটকেসে চাবি বন্ধ করে শুধোলো।

—আমি কিছু টাকা দিতে চাইলাম তার আশ্রমের জন্য। শুনে সে বলল,— 'আমার পবিত্র কাজে আপনার পাপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করে একে কলুষিত করবো না। আমি যে সন্তানদের পালন করি, আপনি তাদের হত্যাকারী—

—চলো সীমা— ডাঃ গুহ হোল্ড-অলটা নিলেন। বেরিয়ে এল সীমা ওর পিছনে।

আশ্চর্য্য যে, সাধুরা কেউ কিছু এখন বললেন না। শুধু শর্ম্মিষ্ঠা একটু হাসলো ক্ষীণ হাসি।

* * *

সীমা পথে যেতে যেতে ভাবছে—সবই এক অদৃশ্য শক্তির খেলা! অবন্তীর কাছে আঘাত পেয়ে ডাঃ গুহর এই পরিবর্ত্তন সীমার জীবনে

এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা করলো। ছেলেটাকে অবন্তীর কাছে দিয়ে এলে, সীমা আজ তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোত না। কিন্তু এও বোধহয় সেই করুণাময়েরই লীলা। উচ্চশিক্ষিতা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সীমার মনোরাজ্যে আজ কয়েকটা ঘটনার পারম্পর্য্য যেন বিস্ময় জাগাচ্ছে। এখানে তার আসার মূলে রয়েছে ছেলেটার অনুসন্ধান; কিন্তু তাকে অবলম্বন করেই এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ঐ আশ্রমে সীমা এল— ওখানে নির্ম্মলা থাকলো না; সীমাকে ওরা আট্‌কালো, নইলে ডাঃ গুহর সঙ্গে সীমার দেখা হোত না—সবই যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের পরিচালনা! দূরে মন্দিরের চূড়ার উদ্দেশে সীমা করজোড়ে নমস্কার জানাল।

—হ্যাঁ, প্রণাম কর, সীমা! আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তোমরা হারিও না ঈশ্বর-বিশ্বাস। তোমাদের মধ্যে তিনি থাকলেই আমাদের পথেও আলো পড়বে—ডাঃ গুহর কণ্ঠস্বর আবেগে অশ্রুময়।

—তোমার পরিবর্ত্তনটা অত্যন্ত আকস্মিক! এ টিঁকবে তো?— সীমার প্রশ্নে কৌতুক।

—আকস্মিক নয়, সীমা! দীর্ঘ সাতবছর ধরে আমি অবন্তীকে প্রার্থনা করে এসেছি। ওর স্বামিনিষ্ঠা, ওর সতীধর্ম্ম, ওর সন্তানবাৎসল্য—নারীর মহত্ত্বের প্রতি আমার অন্তরের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিল। মনে পড়ল— সন্তানের প্রতি মমত্ববোধে তোমার দু'চোখের দৃষ্টি-কারুণ্য, তোমার সতীনিষ্ঠার জাগ্রত মহিমা—তোমার প্রেমের অবিনাশী শক্তি! মনে হোল, তুমিও ঐ অবন্তীর জাত। এক তুচ্ছ সন্ন্যাসীর জন্য তার অপূর্ব্ব ত্যাগ-বরণ আমাকে বার বার বলেছে, তুমিও ঐ অবন্তীরই অংশ—ঐ সর্ব্বত্যাগিনী সহধর্ম্মিণী—আমার পাপের সব বৃত্তান্ত জেনেও তুমি আমায় ভালবাস! অবন্তীর রূপৈশ্বর্য্যে আমার আর লোভ নেই—তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য আমি তোমার মধ্যে লাভ করবো।

—আমি যেন তোমাকে তা দিতে পারি— সীমার চোখে জল এসে গেল।

সিদ্ধেশ্বরের কাছে বিদায় নিযে আলোক বাড়ী ফিরলো। অঞ্জনা অনুযোগ করলো, এত রাত্রি পর্য্যন্ত দাদা ছিল কোথায়। আলোক বলল,

—পথে বেরুলেই পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, অঞ্জনা! দেরী হযে যায়।

—ওঁরা সব এসেছিলেন—মিঃ সাহা, মিঃ ম্যাকু, বরুণবাবু—তোমার বইটার ছবি করবেন—

—উৎপলা আসেনি নিশ্চয়।

—না, তিনি আসেন নি। আমি ওঁদের বললাম, ও বইএর ছবি করা খুব শক্ত। তবু যদি ওঁরা করতে পারেন তো, দাদা যাতে দেন 'স্ক্রীণ-রাইট' তা আমি করবো। মিঃ সাহা দশহাজার টাকা দেবেন বলেছেন ওর জন্য ; তোমাকে থাকতে হবে সঙ্গে।

—তুই ঠিকই বলেছিস, অঞ্জু, তবে সঙ্গে থাকা আমার সম্ভব হবে না। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই ভারত-ভ্রমণে বেরুবো। তোর কাছে আসবার আগে ঐ সঙ্কল্পই আমার ছিল। হঠাৎ তোকে পেয়ে আট্‌কে গিয়েছিলাম এখানে। এবার বেরুতে হবে। আর দেরী নয়। ওঁরা আবার কখন আসবেন বললেন ?

—কাল সকালে। তোমাকে বাড়ী থাকতে বলেছেন। উৎপলাদিও আসবেন হয়তো।

—না, তিনি আসবেন না।

আলোক খেতে বসল।

—কেন দাদা?— অঞ্জনা আশ্চর্য্য হয়ে শুধোলো,—উৎপলাদি এ বাড়ীতে আসতে চাননা নাকি?

—না, বাড়ীতে আসবেন না কেন? আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না।

—কারণ?

—এমন অনেক ব্যাপার আছে, অঞ্জু, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সবেতেই কারণ খুঁজতে যাওয়া মানুষের মূঢ়তা। তুই দেখিস, উৎপলা দেবী আসবেন না।

খেয়ে শুয়ে পড়লো আলোক। কিন্তু অঞ্জনা দীর্ঘক্ষণ ভাবলো, কেন উৎপলা আসবে না তাদের বাড়ী। কেন সে আলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায় না! অঞ্জনা জেনেছে, আলোক কিছুদিন উৎপলার আশ্রমে চাকরী করেছিল, কিন্তু তাতে আলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উৎপলার সঙ্কোচ কেন? আলোকই-বা কেন চায় না উৎপলার সান্নিধ্যে যেতে? মানব-মনের এই মহারহস্য যেন অবাক করে দিচ্ছে অঞ্জনাকে।...

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অঞ্জনা।

পরদিন সকালেই এলেন মিঃ সাহা, মিঃ ম্যাকু এবং বরুণবাবু। উৎপলা সত্যি আসেনি। আলোক কোনো কথা বলবার পূর্ব্বে অঞ্জনা বলল,

—দাদা থাকতে পারবেন না আপনাদের ছবির ব্যাপারে। কিন্তু আমি থাকবো।

—সে তো খুব আনন্দের বিষয়।— মিঃ ম্যাকু-ই বললেন তাড়াতাড়ি।

—কিন্তু আলোকবাবু না থাকলে চিত্রনাট্য-রচনায় অসুবিধা হবে— বরুণ বলল।

—আলোকবাবুর থাকা খুবই দরকার— মিঃ সাহা বললেন,—কারণ বইখানা শক্ত বই। ওকে চিত্রে রূপদান করতে লেখকের সাহায্য অনিবার্য্য।

—কিছু না, মিঃ সাহা— আলোক বললো,— এদেশের চিত্রপ্রযোজক আর পরিচালকদের কাছে লেখকের মর্য্যাদা কতখানি, আমি জানি। জানি তাঁরা সর্ব্বজ্ঞ—সবজান্তা। তাঁরা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎএর লেখারও সংশোধন করবার দুঃসাহস রাখেন! আমি তো নগণ্য!— হাসলো আলোক।

—লেখকই সৃষ্টি করেন— বরুণ বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু প্রযোজক, পরিচালক তা স্বীকার করেন না। তাঁরা কিছু বলেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখান যে তাঁরাই সব। অতএব আমার না-থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না। আর হোলে, এ বই নেওয়া এখন বন্ধ থাক্। কারণ আমি দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে যাব—আমি দেখতে চাই জননী ভারতের বর্ত্তমান রূপ!

—না না, বইখানার 'রাইট' আমি নেবই। ওটা বেহাত হতে দেওয়া হবে না। একখানা ভাল ছবি আমি করতে চাই। লাভের জন্য নয়—চিত্রশিল্পও যে সত্যকার শিল্প, সিনেমাও যে শ্রেষ্ঠ কলা হতে পারে—তাই প্রমাণ করবার জন্য। টাকা আমি অনেক রোজগার করেছি, আলোকবাবু, হয়তো আরো রোজগারের পিপাসাও আছে—কিন্তু, জীবনে ভাল কিছু করলাম না, এ চিন্তা সময় সময় অসহ্য ঠেকে! বইখানা দিন আপনি আমাদের। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ওকে যথাযোগ্য রূপ দেবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না—

—'বর্ত্তমান জগৎ' সিনেমামুখী জগৎ, মিঃ সাহা— আলোক বললো,— ওতে ভাল অনেক কিছু করা যায়—মানুষের চরিত্রকে মানবচেতনায় জাগরিত করাও সম্ভব সিনেমার মাধ্যমে। যদি সত্যি ভাল কিছু করবার ইচ্ছে জেগে থাকে আপনার তো, আমার কিছু নিবেদন আছে—

—বলুন, বলুন—আমি আদেশ বলে মনে করবো আপনার কথা।

—না, অতোটা কিছু করতে হবে না— হাসলো আলোক— আমার অনুরোধ খুব ছোট, খুব সরল—লক্ষ্য রাখবেন, ছবি দেখে যেন মানুষের

অন্তরে সামান্যও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগরিত হয়। দৃশ্যমান্ জগতের অন্তরালে যে অদৃশ্য-শক্তি—তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা যদি-বা না জাগে, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস অন্ততঃ হোক মানুষের—এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। জীবনকে দেখানোই 'জীবনায়ন' নয়, মিঃ সাহা, জীবনের অয়ন অর্থাৎ বিস্তারেই থাকে 'জীবনায়ন'—

—শেষের কথাটির একটু ব্যাখ্যা করে দিন—বরুণ অনুরোধ করলো।

—জীবনের বিস্তার অর্থে প্রতি জীবনের সঙ্গে প্রতি জীবনের যোগ, অখণ্ড জীবন-স্রোতকে ধারণা করা—যে জীবন-স্রোত ছিল, আছে, থাকবে; যার লক্ষ্য নিজেকে সুস্থ-স্বস্থ-শান্তিময় করা—আলোক একটু থেমে আবার বলল,

—জড়বিজ্ঞান মানুষকে বহুদূর এনেছে, কিন্তু অ্যাটম বোমের আতঙ্ক থেকে তো মানুষ রেহাই পেল না! ধনতন্ত্র গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র বা শ্রমিকতন্ত্রবাদে মানুষকে কোথাও পরা-শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। মানুষ 'তন্ত্র' গড়ছে আর ভাঙছে—কোথাও স্থির হতে পারছে না; কোনো 'বাদ'ই শাশ্বত বলে মানতে পারছে না। কারণ, বর্তমান যুগ অধ্যাত্মবাদ-বর্জ্জিত এক অতিবাস্তব যুগ—যার আবেদন শুধু জীবনের দৈনন্দিনতার আয়োজনেই পরিসমাপ্ত হচ্ছে। জীবন-দর্শনের অভাবে জীবনাদর্শ জাগছে না পৃথিবীতে···

সাগ্রহে শুনছিল বরুণ কথাগুলো। মিঃ সাহাও বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। কিন্তু মিঃ ম্যাকু যেন অধীর হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ। তিনি একবার বইখানা নাড়লেন, কলমটা খুললেন—ব্লটিং-প্যাড্খানায় আঁচড় কাটলেন, অতঃপর অকস্মাৎ বলে উঠলেন,

—আই অ্যাড্মিট্, আই অ্যাড্মিট্—এসব কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে। ওসব কথা সাহিত্যে মানায়, ব্যবহারে লাগে না।

—ব্যবহারে লাগাবার জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত, মিঃ ম্যাকু, নইলে রূপকথা নিয়ে মানুষ খুসী থাকলেই পারতো— আলোক বলল,— আপনাদের সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। আমার বই যদি নিতে চান তো, ঐ একটি অনুরোধ আমার—কোথাও আমার আদর্শবাদকে ক্ষুণ্ণ করা চলবে না; কারণ আমি বিশ্বাস করি—জড়বাদে মানুষ বাঁচবে না, সে বাঁচবে অধ্যাত্মবাদে। বাস্তবতায় তার জীবনের প্রসার নয়, তার জীবনের প্রসাব আদর্শের দৃষ্টিতে এবং সৃষ্টিতে; আয়ু, আরোগ্য, বিজয়-ই তার একমাত্র কাম্য নয়—তার কাম্য পরা শান্তি, পরম শান্তি—

—মানুষ চায় আনন্দ—এন্‌টার-টেন-মেণ্ট দরকার— মিঃ ম্যাকু বললেন।

—সে আনন্দ স্বাস্থ্যকর হতে হবে। 'জরদ্গব'-এর জ্বর-বিকারগ্রস্ত আনন্দকে আমি 'আনন্দ' বলি না। হাসি থেকে অশ্রুতে আনন্দ বেশী, যদি সে অশ্রু মানবাদর্শের মহিমা প্রকাশ করে···

—অশ্রুতে আনন্দ! কী সব বাজে··· মিঃ ম্যাকু বলতে গেলেন।

—থাক্‌ ওসব তর্ক এখন— মিঃ সাহা যেন ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন মিঃ ম্যাকুকে।

অতঃপর চুক্তিনামা সই হয়ে গেল। চেকখানা হাতে দিলেন মিঃ সাহা; আলোক নিঃশব্দে সেটা এগিয়ে দিল অঞ্জনার হাতে। অঞ্জনা বলল,

—চিত্রনাট্য লেখা হলে আমি শুনবো সমস্তটা, এই কথা রইল।

—হ্যাঁ—আপনাকে শুনিয়ে যাব আমি— বরুণ বলল কথাটা।

ওদের যাবার সময় আলোক আবার বলল,— যদি সত্যি মানুষের কিছু ভাল করতে চান, মিঃ সাহা, তাহলে দর্শকদের অন্তরে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন—ও থেকে ভাল আর কিছুতে হয় না।

মিঃ ম্যাকু সজোরে বললেন,—ধর্ম্ম করবার জন্য কেউ ছবি দেখতে আসে না, মশাই—ওসব কথা মঠে গিয়ে বলবেন।

আলোক শান্তস্বরে বলল,—মঠ মাঠ মন্দির মানবহৃদয়—সর্ব্বত্র বলবো, মিঃ ম্যাকু—অন্নজলের ক্ষুধা আপনিই জাগে, যৌনক্ষুধা জাগে যৌবনকালে স্বাভাবিকভাবেই; কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষুধা জাগিয়ে না দিলে জাগে না। এই সেই পরম ক্ষুধা, যা জীবনকে করে জ্যোতির্ম্ময়, মৃত্যুকে করে অভীঃ··· আচ্ছা, নমস্কার—

সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলে অঞ্জনা হেসে বলল আলোককে,

—মিঃ ম্যাকু কাল বলেছিলেন যে, বইখানা তিনিই ধরিয়ে দিচ্ছেন। আজ দেখলাম, উনিই বেশী বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এ কী ব্যাপার, দাদা?

—অনসূয় হওয়ার অভাব, বোনটি! শাস্ত্র সর্ব্বাগ্রে মানুষকে অনসূয় হতে উপদেশ দিয়েছেন। অপরের লাভে আনন্দ না করতে পারিস, অন্ততঃ দ্বেষ করিস না—একেই বলে অনসূয় হওয়া।

—মিঃ ম্যাকু তোমার উপর কেন অত অসূয়, দাদা?

—স্বভাব— হাসলো আলোক; বলল,—কালই আমি বেরুবো ভারত-ভ্রমণে, ব্যবস্থা কর।

—অত তাড়া কেন, দাদা! বেরুনো কি পালিয়ে যাচ্ছে?— অঞ্জুর কণ্ঠে বিষাদ স্পষ্ট।

—হ্যাঁ রে, পালাচ্ছে বইকি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত পালিয়ে যাচ্ছে। এই দেশভ্রমণ করবো ভেবে সাতবছর করা হচ্ছে না—সাতটা বছর পালিয়ে গেল!

—আরো সাত দিন না-হয় যাবে?

—তাতে কার কি লাভ হবে, অঞ্জু? আর তোর দাদা সন্ন্যাস নিচ্ছে না। মরেও যাচ্ছে না। বেঁচেই সে রইল—পৃথিবীর কোনো প্রান্তে সে থাকবে মহারুদ্রের আবির্ভাব দেখবার জন্য!

অঞ্জনা চুপ করে রইল। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে প্রসন্ন হতে পারছে না। আলোক চলে যাবে, এ যেন অসহ্য তার কাছে। সে চেয়েছিল, সর্ব্ববন্ধনহীন আলোককে সংসারের বন্ধনে বেঁধে দিতে। আলোক অস্বীকার করলো সবই। তবু যে অপার্থিব স্নেহ সে পেয়েছে আলোকের কাছ থেকে, তাতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা ওর সহনাতীত। শুধু সান্ত্বনা, আলোক বেঁচে থাকবে—থাকবে তার যোগ্য ভূমিতে। বলল,

—চিঠিপত্তর আমায় দেবে না, দাদা!

—না। আমার অন্তরের স্নেহ তুই সর্ব্বক্ষণ অনুভব করবি, অঞ্জু! চিঠি লিখে কি হবে?

—সাধারণ মানুষের বস্তুর দিকে লোভ বেশী, দাদা! চিঠি সেই বস্তু, যা আত্মীয়ের কুশলবার্ত্তা আনে।

—তুই সাধারণের থেকে কিছু বেশী হবি—তুই জানবি, অ-কুশল কিছুতে নেই। সবই এগিয়ে চলেছে এক মহা-মঙ্গলের পানে ··

—অ্যাটম বোমও?— ব্যঙ্গ করলো নাকি অঞ্জনা!

কিন্তু আলোক সহাস্যে বলল,

—হ্যাঁ, অ্যাটম বোমও। অ্যাটম বোমের আতঙ্ক মানুষকে তার অনিবার্য্য ধ্বংসের চিন্তায় আতঙ্কিত করে তুলেছে। মানুষ সাবধান হবার চেষ্টা করছে আজ। আজ সে ভাবছে, অ্যাটম বোমের প্রভাবে যদি তার পরবর্ত্তী বংশধরকে বিকলাঙ্গ বা বিকৃতবুদ্ধি হতে হয়, তবে কার জন্য করছে সে এই রাজ্যবিস্তার! মানুষ আজ বুঝতে চাইছে, অঞ্জনা—মোক্ষো ধীর্জ্ঞানং—মোক্ষ-বিষয়িনী জ্ঞান ছাড়া আর সবই 'অজ্ঞান'। বিজ্ঞান ব'লে মানুষ যাকে নিয়ে বড়াই করেছে এতদিন, তা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়—কল্যাণ তাতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে কল্যাণ একান্তভাবেই পার্থিব। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মধ্যে রোগ-আরোগ্য

করবার কল্যাণ-চিন্তা নিশ্চয় আছে—কিন্তু রোগ-এড়ানোর বিলাসটাই তার মূলে কাজ করছে বেশী। আয়ুকে বাড়াবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা জীবনকে দীর্ঘকাল ভোগ করবার ইচ্ছা-প্রসূত। জড়বিজ্ঞান ওর বেশী এগুতে পারেনি। কিন্তু ঐ সব সাধনাই চলেছে এক মহামঙ্গলের পানে, যার পূর্ণতা প্রকাশ পেলে দেখা যাবে—সবই কল্যাণময়, সবই অখণ্ড আনন্দদ্যোতক !

—সবাই তখন ঈশ্বর-বিলাসী হয়ে উঠবে ?

—ঈশ্বর-বিলাসই শ্রেষ্ঠ বিলাস, অঞ্জু ! ঈশ্বরকে হাত-পা-ওয়ালা জীব কেন ভাবছিস ! ঈশ্বর একটা ভাব, আইডিয়া—যার অখণ্ড জ্ঞান অমৃতত্বের বীজকে রক্ষা করে। জীবন-সাধনার মূল উদ্দেশ্য সেই বীজকে বপন করা, বর্দ্ধন করা—ফলপ্রসূ করা—

—থাক্ দাদা, এসব বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব। যাও, স্নান কর, খাবে—

—হ্যাঁ, থাক্।

আলোক স্নান করে খেল। তার পর বেরিয়ে গেল কাজে।

পরদিন বিছানা আর সুটকেস নিয়ে হাওড়ায় ওকে তুলে দিয়ে এল অঞ্জনা পশ্চিমগামী একটা মেল-ট্রেনে। ফেরবার পথে ওর স্বামীকে বলল,

—দাদাকে প্রণাম করতেও ভুলে গেলাম আমি আজ !

—চোখের জলের থেকে প্রণাম বড় নয়, অঞ্জনা ! প্রণাম নাই-বা করলে ?

—হ্যাঁ। কিন্তু দাদাকে আমি কী দিতে পারলাম এই সাত বছরে !

—তোমার দাদা আলোক—সূর্য্য! তার কাছ থেকে শুধু পেতে হয়, দেবার কিছু নেই।

অঞ্জনা চোখের জলটা গড়িয়ে পড়ে যেতে দিয়ে উচ্চারণ করলো,

—ইদমর্ঘ্যং ওঁ আলোকায় নমঃ...

পরম জননীর পূজা-উৎসব হবে অবন্তীর শিশু-বিদ্যালয়ে। অবন্তী আয়োজন করছে—আড়ম্বরহীন আনন্দের আয়োজন। জগতের মাকে নিজের মা বলে যাতে শিশুরা চিনতে শেখে, তারই লক্ষ্য আয়োজনের সর্ব্বত্র। সব শিশুই শুনছে, বলছে, ভাবছে—মা আসছেন। মা'র আগমন-সংবাদটি এমনভাবে জানানো হয়েছে ছেলে-মেয়েদের যে—কেউ বুঝতেই পারছে না, এ একটা পূজার উৎসব। এ যেন সত্যকার মা-ই আসবেন ছেলেমেয়েদের দেখতে—তাদের আনন্দ দিতে, আশীর্ব্বাদ করতে।

অবন্তী-ই এই ভাবটি প্রচার করেছে বিদ্যালযের সর্ব্বত্র। নিখিল বিশ্বের জননীকে একান্তভাবে এই আশ্রমবাসীদের জননীরূপেই যেন এখানে দেখতে চায় ওরা। মা যাদের জন্ম থেকেই অদৃশ্য, মাকে যারা চেনেনা-জানেনা, তাদের অন্তর মায়ের আগমন সংবাদে অবিশ্রান্ত উল্লসিত হয়ে রয়েছে। যে-ঘরে মাকে আনা হবে, সেই ঘরখানা বার বার ঘুরে আসছে ওরা।

অবশেষে নিখিল চিত্ত নন্দিত করে 'মা' এলেন। সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজার উৎসব সানন্দে সম্পন্ন হোল। বিজয়া-দশমীর আয়োজনে ব্যস্ত অবন্তী।

আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু অবন্তী নিজের কথাও ভাবে। ভাবে বাল্য-কৈশোর-যৌবনারম্ভ! এই অজয় নদের কূলেই কেটেছে ওর

জীবনের সেই মধুর দিনগুলি। এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, ভাল করে দেখলে আবছা দেখা যায় ওর পরিত্যক্ত পৈতৃক ভিটা—ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম। এই শিশু-বিদ্যালয়ের জমিটা ওর পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাই পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে অবন্তী এই স্থানটিই নির্ব্বাচন করেছে ওর জীবনের সর্ব্ববৃহৎ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজের জন্য। ভাবতে থাকে—ওর জীবন-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের। আলোক, সিদ্ধেশ্বর, উৎপলা বা ডাঃ গুহ শুধু নয়—ওর বিরাট জীবন-নাটকে বহু বিচিত্র চরিত্রের সম্মিলন ঘটেছে; কত দেশী, কত বিদেশী বন্ধু—কত ঘটনা আর অঘটন নিয়ে ওর জীবন! তার পর শিশু-বিদ্যালয় যেন উপন্যাসের উপসংহার। করুণ হাসে অবন্তী কথাটা মনে হতেই। আগের দিনে, বঙ্কিম-যুগে প্রতি উপন্যাসের শেষে একটা করে 'উপসংহার' অধ্যায় থাকতো। উপন্যাসের চরিত্রের কার কী হোল, কে কোথায় গেল—তাই লেখা থাকতো উপসংহারে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ওর আর চলন নেই। অধুনাতন কালে পাঠককেই ভেবে নিতে হয়, কার কী হওয়া উচিত। এটা নাকি আর্ট।

হতে পারে! কিন্তু অবন্তী তবু ভাবে, যে জীবন সে অজয়কূলে আরম্ভ করেছিল আলোকের সাথীরূপে, সেই জীবনের শেষ পরিণাম এই অজয়কূলেই শিশু-বিদ্যালয়ের পরিচালিকা রূপে শেষ হবে। কোথায় আলোক, কোথায়-বা সিদ্ধেশ্বর! কোথায় গেলেন ডাঃ গুহ, যিনি অবন্তীকে বিয়ে করবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে চেয়েছিলেন, কারণ অবন্তীর সতী-গৌরব তাঁকে অভিভূত করেছে। 'অবন্তী বর্ত্তমান যুগের সীতা-সাবিত্রী।'—ক্ষীণ হাসলো অবন্তী।

ওর জীবনকাব্য যদি কেউ কখনো অধ্যয়ন করে, তো কি পাবে? পাবে অনেক কিছু। পাবে সব থেকে বড় একটা তত্ত্ব, যে তত্ত্ব সাধারণ নারী-জীবনে পাওয়া যায় না—সেটা এই যে নারী কাকে ভালবাসে,

তা সে নিজেই জানে না। অবন্তী কাকে ভালবাসে, অবন্তী কি তা জানে ?

উত্তরটা মনের গভীর থেকে উঠতে-উঠতেই যেন ঘোলাটে হয়ে গেল মনটা। নাঃ, ঠিক ধরা গেল না! মনে পড়ল, আলোকের লেখা 'জলদর্চ্চি'র কয়েকটা কথা ঃ

"আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাদ দিলে প্রেম মানবজীবনে কদাচিৎ আবির্ভূত হয়। সাধারণ ভাষায় যাকে প্রেম বলা হয়, সেটা দৈহিক মিলন-পিপাসারই তীব্রতম রূপ—কাব্যে আর কথা-সাহিত্যে যাকে 'প্রেম' নাম দেওয়া হয়েছে। এ শুধু সন্তান-লাভের আকূতি। এ প্রেম নির্দ্দিষ্ট কোনো একজনের সঙ্গে না হলে, অন্যজনের সঙ্গে হতে কোথাও বাধে না। এ শুধু সমাজ-চেতনার সাধারণ প্রকাশ মাত্র ; মানুষ এর স্রষ্টা। কিন্তু সন্তান-বাৎসল্য প্রাকৃতিক, তার অনিবার্য্যতা অনস্বীকার্য্য। সন্তান শরীর-মনের অংশ, সন্তান আত্মার অভিন্ন প্রকাশ! সন্তান-স্নেহ সমাজ-চেতনায় বাধিত হয় না, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিচ্ছিন্ন হয় না—কুক্কুরী-মাকরী-মানবীর মধ্যে তার দুর্ব্বার ধারা সমান খরতর।"

কথাগুলো 'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তীর মুখে বলিয়েছেন আলোদা। কিন্তু আশ্চর্য্য, এতো নাম থাকতে আলোদা তাঁর বইএর নায়িকার নাম 'অবন্তী' রাখলেন কেন ? রাখলেন, তাঁর সাহিত্যে অবন্তীকে অমরত্ব দেবার জন্য। কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল! ছিল। 'জলদর্চ্চি'র নায়িকা অবন্তী চিরকুমারী নগরী—শত সম্রাটের সে প্রেয়সী, লক্ষ সন্তানের সে জননী—কুন্তীর মতই মহিয়ময়ী মা! কিন্তু তার সঙ্গে শিশু-বিদ্যালয়ের এই অবন্তীর মিল কোথায় ? হ্যাঁ, মিল আছে এই শিশু-বিদ্যালয়ের শিশুদের 'মা' হওয়ার মধ্যে।

'জলদর্চ্চি' বইখানা চিত্রায়িত হচ্ছে। আগামী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন মিঃ সাহার 'মন্দার' চিত্রমন্দিরে সে-ছবি প্রদর্শিত হবে।

যাবে অবন্তী দেখতে। উৎপলা বার বার বলেছে তাকে যেতে। কারণ বইটা আলোদার লেখা, আর ওতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে শ্রীমান জীবন। এ ছবি অবন্তীর না দেখলেই চলে না!

উৎপলা নিজে এসে জীবনকে নিয়ে গেল ঐ ছবিতে অভিনয় করতে। 'জলদর্চ্চি'র নায়ক একুশ বছরের এক বালব্রহ্মচারী—তারই চরিত্র অভিনয় করবে জীবন। উৎপলাকে প্রশ্ন করেছিল অবন্তী, কেন সে জীবনকে দিয়ে অভিনয় করাতে চায়? উত্তরে উৎপলা স্বীকার করেছে যে— 'সিদ্ধেশ্বর বলে গেছে, জীবন সাধু হবে।'

সত্যি সাধু ওকে হতে দেবে না উৎপলা, তাই অভিনয়ে সাধু-ব্রহ্মচারী বানিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে দিতে চায়। কেন উৎপলার এত আশঙ্কা জীবন সম্বন্ধে? জীবনকে অত্যন্ত স্নেহ করে উৎপলা—হয়তো ছোটবেলায় পেয়েছিল অপর্ণার ঐ ছেলেটাকে, তাই স্নেহ এত প্রবল। কিন্তু জীবনকে কিছুতেই অপর্ণার ছেলে বলে মনে হয় না। কে জানে কার ছেলে জীবন! উৎপলাও তো জানেনা জীবন কার ছেলে। জীবনের সন্ন্যাস নেবার ফাঁড়াটা যদি কেটে যায় তো যাক্ ঐ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। কারণ, অবন্তীও চায় না যে, জীবন সন্ন্যাসী হোক। অথচ সিদ্ধেশ্বর ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সন্ন্যাসী করবার জন্যই। না, সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে? গাঁজা খাবে আর চুরি-ডাকাতি করবে তো!

না-না-না···অবন্তী চিন্তাটা ঘুরিয়ে নিল। সব সন্ন্যাসীই গাঁজা খায় না। সিদ্ধেশ্বরের মত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও আছে। আছে এবং থাকবে। 'জলদর্চ্চি'র মধ্যে আলোদা বলিয়েছেন যুবনাশ্বের মুখে:

"এই ভারত সনাতন সাধকের দেশ। এখানকার আকাশে-বাতাসে অনাদিকাল থেকে সিদ্ধ সাধকের সৎচিন্তা চিরজাগ্রত রয়েছে। তার প্রভাব থেকে অতিবড় বর্ব্বরও নিস্তার পায়না বলেই এখানে ডাকাতরা করে কালীপূজা; মাংস ভোজনের আগে ছাগশিশুকে নিবেদন করতে যায়

মানুষ দেবমন্দিরে ; মদকে বলে কারণ-বারি ; শিশু এদেশে 'ভোলানাথ' ; নারী এখানে নারায়ণী। এই ভারতের প্রতি ধূলিকণায় আছে ঋষি-পদরেণু, যার শক্তি বিজাতীয় বিধর্ম্মীকেও প্রভাবিত করে সত্যধর্ম্মে, মানবধর্ম্মে। বারনারীর অন্তরেও এদেশে তৎকালীন স্বামিনিষ্ঠা স্বতঃ জাগ্রত। বৃদ্ধা বেশ্যা এদেশে তপস্বিনী। পতিতা এখানে পরম প্রেমময় ভগবানকে পাবার জন্য প্রেমে-ভক্তিতে পূজারতা ! তাই আশা করবো, একদিন এই ভারতের বাণী পৃথিবীর বাণী হবে—পরম বাণী হবে মানুষেব !"

আপনার মনে চিন্তা করতে করতে অবন্তী অফিস-ঘরে এসে দেখলো চিঠি এসেছে। খামের চিঠিখানায় তারই নাম লেখা শিরোনামা, বাকী সব শিশু-বিদ্যালয়ের। আগে সাধারণ চিঠিগুলো পড়ে নিল অবন্তী ; কারণ খামে ওকে চিঠি লেখার মত ওর কেউ আছে বলে মনে পড়ে না। কে জানে, কী খবর থাকবে ! শেষে খুলল, আশ্চর্য্য হয়ে পড়তে লাগলো চিঠিখানা :

"কল্যাণীয়াসু,

অবন্তী, দীর্ঘকাল তোমার খবর জানি না, আশা করি ভাল আছ। যে সুমহান কাজে জীবন উৎসর্গ করেছো, ঐ কাজই অনাসক্ত ভাবে করে চল—ওতেই তোমাব চরম সিদ্ধি লাভ হোক্, এই কামনা করি।

তোমার-আমার সম্পর্ক মানব-জগতের নয়, অবন্তী, এ বন্ধন আত্মার ! অনাদিকালের আত্মীয়তার এই বন্ধন আমাদের মুক্তির আনন্দে চির-জ্যোতির্ম্ময় ! তাই যে-দিন তোমার দৈহিক আবেদনের আকর্ষণে আমি গৃহত্যাগ করেছিলাম—সেইদিনই সঙ্গ নিয়েছিলেন আমার পরম-দেবতা, একটা কাগজের মোড়কে বাঁধা আমার পৈতৃক বিগ্রহ রূপে। আজও তিনি সঙ্গেই এবং আজও প্রতিক্ষণে আমাকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তোমার-আমার সম্পর্ক দেহগত নয় ! আত্মার অর্দ্ধাংশ

তুমি—আমার সাধনার পরম সহায় তুমি! তোমাকে আশ্রয় করেই আমার জীবন-দেবতাকে আমি লাভ করবো। তোমার সঙ্গে কোনোদিনই আমার বিচ্ছেদ নেই!

তোমার দৈহিক স্পর্শ না পেয়েও, তোমার স্বামিত্বের গৌরব আমি লাভ করেছি, অবন্তী! এ-যে আমার কত জন্মের তপস্যার ফল, আমি জানি না। তোমার দেহ আজ আমার চোখে চিন্ময়, তোমার প্রেম আজ আমার অন্তরে পরম ঐশ্বর্য্য!

নারীর দৈহিক পবিত্রতা অথবা পতনের মূল্য মানবীয় ধর্ম্মে যাই হোক, অবন্তী, অধ্যাত্মধর্ম্মে আত্মা চিরনির্ম্মল, আর আমি তোমার সেই নির্ম্মল আত্মার অর্দ্ধাংশ—এই সত্য প্রতিক্ষণ অনুভব করি, আর বিশ্ব-দেবতাকে প্রণাম জানাই! আমার গৌরব, আমি যোগ্যা সহধর্ম্মিণী লাভ করেছি।

দেবতাত্মা হিমালয়ের দূর-দুর্গম অঞ্চলে চলে যাব আগামী কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়—লোকালয় থেকে বহু বহু দূরে, যেখানে ঋষিগণের অধ্যাত্মচিন্তা জমাট হয়ে আছে বরফের সঙ্গে, যার গলিতধারা জাহ্নবী-জলে বয়ে চলে তোমাদের মর্ত্ত্যলোকে। সেই সুদূর আর যেন আমাদের দূর মনে না হয়, অবন্তী—প্রেম আমাদের নিকটতম করে রাখুক সর্ব্বক্ষণ—দুটি জীবন আমাদের এক হোক প্রেম-দেবতার চরণমূলে—এই প্রার্থনা তাঁর চরণে।

ইতি—সিদ্ধেশ্বর”

চোখের কোণা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো অবন্তীর। কুমারী অবন্তী, পতিতা অবন্তী, পাতকী অবন্তী এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সহধর্ম্মিণী। এ গৌরব যিনি ওকে দান করলেন, তিনি মানবরূপী প্রেমদেবতা—তিনি সর্ব্ব ক্ষেমঙ্কর শিব, তিনি চিরজ্যোতির্ম্ময় জলদর্চ্চি—যিনি বিষ্ঠাতেও সমান স্নেহে কিরণসুধা দান করেন! সিধুর উদ্দেশে প্রণাম জানাতে

গিয়ে অবন্তীর মনে হোল—প্রণামের আগে সিধুর স্বাক্ষরকে সে পরিপূর্ণ রূপেই গ্রহণ করবে সীমন্তে। পূজামণ্ডপে এসে অবন্তী প্রতিমার চরণারবিন্দ থেকে কিঞ্চিৎ সিঁদুর নিয়ে সীমন্তে লেপন করলো।

সব শিশুরা জেনেছে, 'মা' আজ চলে যাবেন। বিষাদমলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা বাইরে। অবন্তী এসে বলল তাদের,

—মা আমাকে তোদের 'মা' করে রেখে যাচ্ছেন! আবার আসছে বছর আসবেন। আমি তো রইলাম তোদের মা—কাঁদছিস কেন সব!

শিশুরা কী সান্ত্বনা পেল কে জানে, কিন্তু অবন্তী যেন ও-কথা না বলে পারলো না। ওর সঙ্গে যোগ করলো,— আগামী কোজাগরীর দিন তোদের কলকাতা নিয়ে যাব 'সিনেমা' দেখাতে—

—মা পয়সা দিয়েছে?— একটা বাচ্চা মেয়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, মা টিকিট কিনে দিয়ে যাবেন।— হাসলো অবন্তী।

ট্রেন থেকে নেমে জীবন এসে ঢুকলো। অবন্তী ওকে কিছু বলবার পূর্ব্বেই দীর্ঘক্ষণ ধরে জীবন প্রণাম করলো প্রতিমাকে, তার পর অবন্তীকে। অবন্তী আশীর্ব্বাদ করে প্রশ্ন করলো,

—কেমন ছিলি, জীবন! কোথায় থাকতিস কলকাতায়? পলাদির বাড়ীতে?

—না, একটা ভাল বোর্ডিংএ আমায় রেখেছিলেন মা। অভিনয় ভালই তো করলাম, মাসিমা! সবাই খুব প্রশংসা করলো—কিন্তু ও তো শুধু অভিনয়—

—তা হোক। তোকে কি করে মানালো একুশ-বছরের ব্রহ্মচারী?

—তা মানাবে না কেন? আমি তো খুব লম্বা; আর ওঁরা চুলদাড়ী দিয়ে মেক-আপ করে দিতেন। আমি-ই 'আমাকে' চিনতে পারতাম না। ছবিটা 'রিলিজ' হলে দেখবেন—আমাকে নাকি চমৎকার ব্রহ্মচারী মানিয়েছে!

—এই কোজাগরীতে তো হচ্ছে 'রিলিজ'? তা, তুই চলে এলি কেন?

—ভাল লাগলো না, মাসিমা। শুনলাম, আমি সত্যিকার সন্ন্যাসী হয়ে যাবার ভয়ে, মা আর আপনি যোগ-সাজস করে আমাকে অভিনয়ের সন্ন্যাসী করে দিলেন। তাতে আমার ভাগ্যিটা নাকি বদলে যাবে; না, মাসিমা?

—না বাবা, ভাগ্যি কি আর বদলায়! তোমার যা হবার, তুমি তাই হবে। এসো, প্রসাদ নাও।— অবন্তী ওকে প্রসাদ দিল। জীবন নিল দু'হাত পেতে। অন্য সব শিশুদের থেকে সে অনেক বড়, তবু এখনো শিশুই তো! ওকে দিয়ে উৎপলা অভিনয় করালো। কে জানে, কেমন হবে সে অভিনয়! তবে জীবন বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। কিন্তু উৎপলার কেন এত চিন্তা জীবনের জন্য? কথাটা আবার ভাবলো অবন্তী। জীবনের বয়স বড় জোর চৌদ্দ হতে পারে, দেখায় অবশ্য আঠারো বছরের মত। শরীর এবং স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল তার। মনেই হয় না যে, সে বেঁটে বাঙালী। কিন্তু কি হবে এসব ভেবে!···

কিন্তু না-ভেবে পারে না অবন্তী। জীবনকে অবলম্বন ক'রে ওর চিন্তা ওরই জীবনের অলিতে-গলিতে ঘুরতে লাগলো; বাল্যের অজয়-কূলে নয়— বারাণসীর বিপর্য্যয়কর দিনে, কলকাতার কলঙ্কিত রাত্রিতে, বোম্বাইএর বিভ্রান্ত পথে। মনে পড়তে লাগলো কত ঘটনা কত অঘটন—কত কথা কত অকথিত আনন্দ-বেদনার অক্ষয় মুহূর্ত্ত! কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর শুধু মনে পড়তে লাগলো—এক নারীলোভী যুবকের ক্ষুধিত দৃষ্টি কেমন করে ধীরে ধীরে এক অপার্থিব প্রেমদৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে! সেই দৃষ্টি-স্মৃতিই আজ অবন্তীর জীবনে শিলালিপি—না—অবন্তীর জীবনের স্পন্দন সেই দৃষ্টি! সে দৃষ্টি ওর প্রিয়তম স্বামী সিদ্ধেশ্বরের।···ভাবতে গিয়ে

আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অবন্তীর। মনে হোল, ঐ অপরূপ বধূ-গৌরব লাভ করবার জন্য নারী সব লাঞ্ছনা সহ্য করেও স্বামীর ঘরে আত্মসমাহিতা থাকতে পারে—থাকতে পারে আত্মস্থা হয়ে। একজনের অন্তরের বন্ধনে বাঁধা থাকাই নারীর চরম এবং পরম আশ্রয়। নারীর জীবনে ওর থেকে বড় আশ্রয় আর কিছু আছে বলে মানেনা অবন্তী।

বর্ত্তমান যুগের বিপর্য্যয়কর সভ্যতা নারীকে আজ বহির্মুখী জীবনে এনেছে। কিন্তু তার অন্তর-জীবন আজও অন্তর্মুখী—হয়তো চিরকালই সে অন্তরে অন্তর্মুখী থাকবে। নইলে অবন্তীর মত বহু-বিলাসিনী আজ সীমন্তে সিঁদুর পরে সাধু সিদ্ধেশ্বরের চরণমূলে অর্ঘ্য অর্পণ করতো না। কিন্তু থাক্ এখন এসব চিন্তা...

নিজেকে সম্বরণ করলো অবন্তী। চিন্তাটা ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। প্রতিমা-বিসর্জ্জন শেষ হয়ে যাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা খেয়ে যে-যার 'সীটে' শুয়েছে—অধিক রাত্রে অবন্তী জানতে পারলো, জীবন তখনো খায়নি। পূজর ঘরে একা বসে আছে। বিস্মিতা অবন্তী তৎক্ষণাৎ পূজার ঘরে গিয়ে দেখল—শূন্য বেদীর সম্মুখে পদ্মাসনে বসে রয়েছে জীবন—বাহ্যজ্ঞানহীন পাথরের মূর্ত্তি যেন। একি ব্যাপার! জীবন কি অভিনয়ের যোগী হতে-হতে 'সত্যি যোগী' হয়ে উঠলো! কিন্তু দুশ্চিন্তাটাকে সবলে সরিয়ে অবন্তী কাছে এসে ক্ষীণ প্রদীপালোকে দেখলো জীবনের মুখ—ধ্যানস্তিমিত এক বালব্রহ্মচারী যেন! অবাক বিস্ময়ে অবন্তীর কণ্ঠে আকস্মিকভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো,
—জীবন · !

—অ্যাঁ— চোখ মেলে চাইল জীবন। যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে সে অকস্মাৎ। অবন্তী ধীরে ধীরে বলল,

—এসব কি বাবা, জীবন! রাত হয়েছে। খাওনি এখনো—

—হ্যাঁ, যাই— জীবন উঠে পড়ল। কিন্তু ও টলছে। অবন্তী আলো দেখিয়ে দেবার আগেই জীবন অদৃশ্য হয়ে গেল। রাত জ্যোৎস্নাময়। অবন্তী দেখতে পেল, জীবন খাবার ঘরে না-গিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকলো গিয়ে। হয়তো আজ আর খাবেনা কিছু। থাক্। ওকে কিছু বলতে আর ইচ্ছে নেই অবন্তীর এখন। চলে এল অবন্তী নিজের ঘরে। শুয়ে-শুয়েও ভাবতে লাগলো—কার ছেলে এই জীবন! কোথায় পেল ও এমন প্রকৃতিগত অনাসক্তি? আশ্চর্য্য তো! কিন্তু জীবন কার ছেলে, জানা সম্ভব নয়। স্বয়ং উৎপলাই জানে না। অপর্ণা যে ওর মা নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেছে অপর্ণার পালিয়ে-যাওয়ার মুহূর্ত্তেই। কারণ, প্রেম মানুষের জীবনে পাত্রবিশেষেই আবদ্ধ নয়, পাত্রান্তরে তার স্ফুরণ হতে পারে পুনর্ব্বার। কিন্তু রক্তমাংসজাত সন্তানের প্রতি মমতা অমোঘ, অক্ষয়। অপর্ণা সেই অনিবার্য্য স্নেহকে অস্বীকার করে গেছে। জীবনের পিতার খোঁজ পাওয়া অসম্ভব জেনেই, উৎপলা চেয়েছিল সিদ্ধেশ্বরকে তার জন্মদাতারূপে পরিচিত করতে। সিদ্ধেশ্বরও রাজী ছিল, কিন্তু তাতে অবন্তীকে জীবনের মাতৃত্ব স্বীকার করতে হবে। কারণ অবন্তী সিদ্ধেশ্বরের সহধর্ম্মিণী, এক এবং অদ্বিতীয়া—অথচ জীবনের বিষয় কিছুই অবন্তী জানে না। জীবনের জন্মের জটিলতা এমনি দুর্গম যে, অবন্তী তার মা-রূপে পরিচিতা হতে সাহস করেনি।

কিন্তু জীবন কি সত্যি সন্ন্যাসীর মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে? যদি তাই হয় তো, কোথায় পেল সে এই রক্তধারা? কে তার পিতা! সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয় নয়। হলে, সে-কথা সিদ্ধেশ্বর অনায়াসে প্রকাশ করতো অবন্তীর কাছে।··· ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে অবন্তী।

জীবন কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে নিদ্রাহীন চোখে চেয়ে আছে। আকাশ আলোকিত ক'রে রয়েছে একাদশীর চাঁদ। জানালাপথে দেখছে

জীবন, অজয়ের সাদা বালুবেলায় পড়েছে চন্দ্রকিরণ—শারদ-তরঙ্গিণীতে প্রতিফলিত হচ্ছে শত চন্দ্র—কাশবনে বয়ে চলেছে স্নিগ্ধ সমীর। জীবন দেখছে—এই বিশ্বপ্রকৃতি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ওকেও সৃষ্টি করেছেন! তিনিই ওর পিতা-মাতা। এ ছাড়া জীবনের আর পিতৃপরিচয় নেই। কিন্তু মানুষের সমাজে পিতৃ-পরিচয় যে একান্ত দরকার, সেই সত্য জীবন এবার কলকাতার বোর্ডিংএ থেকে ভালভাবেই অনুভব করে এল। আর উপলব্ধি করে এল—মানুষের জীবন কোথাও শান্ত নয়, সুস্থ নয়, স্বস্থ নয়। সর্ব্বত্রই মানুষ অশান্ত হয়ে ছুটছে কিসের পানে, সে জানে না। তার বহির্মুখী চিত্ত বাইরের শত-সহস্র ব্যাপার নিয়ে মত্ত থেকে মানবত্বকে অস্বীকার করে চলেছে প্রতিক্ষণ। তার অন্তর্মুখী মন অনন্তের অভিসার-পথকে অগ্রাহ্য করে চলেছে প্রতিমুহূর্ত্তে।

কথাগুলো ঠিক এই ভাষাতেই ভাবছিল জীবন—কারণ, 'জলদর্চ্চি' ছবিতে অভিনয় করবার সময় এই ভাষাই ও ব্যবহার করেছে। ওর কচি-কোমল মনে সেই অপরূপ ভাষার আবেদন অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার তুলছে কাব্যের মত; ওর স্বপ্নাতুর চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মচর্য্যের বিশুদ্ধ জীবনানন্দ যেন গৈরিক রঙের ছোপ ধরিয়ে দিল!

অভিনয়ে যদি এই হয়, তাহলে সত্যকার সন্ন্যাস-জীবন কি! কতখানি তার মাধুর্য্য! কি ভাবে সে-জীবনে যেতে পারে জীবন?… ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল সাধু সিদ্ধেশ্বরের কথা—তিনি ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সঙ্গে করে; যেতে দিলেননা মা আর মাসিমা।…

উঠে জীবন নদীধারে বেড়াতে চলে গেল ভোর না হতেই।

কোজাগরীব দিন ট্রেনে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অবন্তী আসবে কলকাতায়। সবশুদ্ধ প্রায় একশো বিশ জন ওরা।। কিন্তু যাবার সময় জীবন জানালো, সে যাবে না। অবন্তী বিস্মিত হয়ে শুধোলো,

—কেন জীবন? যাবি না কেন?

—না মাসিমা, অনেক সিনেমা দেখে এলাম এই ক'মাস! নিজের অভিনয়টা আর দেখবার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া ও আমি 'প্রজেকশ্যনে' দেখেছি আগেই।

—লোকে কি বলে, শুনবি না? তুই নাকি ভাল অভিনয় করেছিস—

—হ্যাঁ, কিন্তু ওটা তো অভিনয়, মাসিমা—ও ভণ্ডামী। আমি তো সত্যি সাধু নই!—জীবনের কথার স্বরে বেদনার অভিমানটা কিন্তু অবন্তী ধরতে পারল না; হেসে বলল,

—মানুষের জীবনটাই অভিনয়, জীবন!

—না, মাসিমা! জলদর্চ্চির সংলাপে আমি বলেছি—"মানুষের জীবনই সত্য—লোভে-পাপে ক্রোধে-কামে তার মলিনতা ঘটতে পারে, কিন্তু প্রেমে সে সত্য—সে নিষ্কলঙ্ক—সে অনভিনেতা…সে অতিমানব…"

—ওসব আলোদার কথা, জীবন, তুই ওর মানেই বুঝবি না!—তাহলে যাবি-না তুই?

—না। আমি ঐ কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করবো, মাসিমা। কলকাতা আমার ভাল লাগে না। আপনারা যান—

জীবনকে আর বেশী পিড়াপিড়ি করলো না অবন্তী। যেতে মন নাই তো, থাক্। সদলবলে সে চলে গেল কলকাতা।

ওদের জন্য 'সীট রিজার্ভ' রাখা হয়েছে। গিয়ে বসলো সেখানে। 'জলদর্চ্চি' আরম্ভ হোল পর্দ্দায়।

অপরূপ সুন্দর ওর প্রত্যেকটি চরিত্র। ভাব এবং ভাষা তারই যোগ্য। নিমেষহীন চোখে দেখছে সকলে। একুশ বছরের এক

বালব্রহ্মচারী নবোঢ়া বধূকে চোখের জলে ভাসিয়ে, চলে গেল পথে—পরিব্রজ্যায়! অশ্রুসজল হয়ে উঠলো দর্শকদের চোখগুলি।

বিরতি।

আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। অবন্তী, উৎপলা, সীমা ব্যালকনির গদী-আঁটা চেয়ারে বসে। বহু দর্শকই রয়েছেন ওখানে, যাঁরা টিকিট কিনে 'শো' দেখতে এসেছেন। ওঁদের একজনের বাচ্চা ছেলে একটা—হাফ-প্যাণ্ট পরা সুন্দর ছেলেটি! অন্ধকারে এতক্ষণ সে চুপ করে বসে ছিল—আলো জ্বলতেই ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল সামনের সরুমত জায়গাটায়। উৎপলাদের দিকেই দৌড়ে এল ছেলেটা। চমৎকার দেখতে ও, তাই সকলের নজর পড়ল ওর পানে। কে একজন বলল, —আইসক্রীম খাবে, খোকা?

জবাব না দিয়েই ছেলেটা উৎপলার কোলের কাছে এসে পড়ল।

—কে ছেলেটি? কার ছেলে? ও খোকা! শোনো, শোনো··· সীমা ওকে ধরতে গেল।

নাঃ, ছেলেটা ছুটে পালালো ওর মার কাছে। আধাবয়সী একটি মহিলা সীমার দিকে তাকিয়েই যেন পাণ্ডুর হয়ে গেলেন। ছেলেটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আঁচলে ঢেকে তিনি পাশের স্বামীকে বললেন কি যেন। আধমিনিটের মধ্যেই ওঁরা উঠে গেলেন ওখান থেকে। সীমাও তৎক্ষণাৎ বেরুতে চাইল; কিন্তু, ওর ভাগ্য—ছবির দ্বিতীয়ার্দ্ধের জন্য আলোও নিবলো ঠিক সেই সময়। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সীমা উৎপলার ঘাড়ের উপর।

উৎপলা সস্নেহে ওকে তুলে দেখলো, চোখের জলে ওর দু'গণ্ড ভেসে যাচ্ছে। ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলো,

—কি হোল, সীমা! কী হোল?

—ঐ ছেলেটা আমার খোকন—আমার···

বহু চেষ্টা করেও সেই দম্পতীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * *

করুণায় বিগলিত-হৃদয়া উৎপলা সারারাত্রি ঘুমুতে পারেনি সীমার অশ্রুপঙ্কিল মুখখানা মনে ক'রে। বিনিদ্র রজনীতে ও শুধু ভেবেছে—দীর্ঘ কয়েকবৎসর পূর্ব্বের এক তমসাময়ী দুর্য্যোগ রাত্রি—ভাঙা ইমারৎ···ডাষ্টবীন···বিরলবর্ষণ বিদ্যুদ্দীপ্ত আকাশ···সদ্যোজাত শিশু! নাঃ! উৎপলা এতকাল পরে আবার ওসব কথা মনে করে কেন? চিরকুমারী উৎপলা তার শিশু-আশ্রমে শতাধিক শিশুকে পালন করে—তাদের সকলের 'মা' সে। তার ক্ষুধিত মাতৃত্ব ওখানেই তৃপ্তিলাভ করবে—ভাবছে, কিন্তু উৎপলার জ্বালাময় দেহখানা যেন ক্রমাগত ক্ষুব্ধ হতে হতে গুম্‌রাতে আরম্ভ করেছে—ঐ শিশুদের সঙ্গে উৎপলার দেহের, রক্তের, মাংসের কোনো সম্পর্ক নেই;—ওরা শিশু, ওরা স্নেহ পাবার দাবী রাখে—কিন্তু, সে স্নেহ কর্ত্তব্যে বন্দী, করুণায় আত্মসচেতন—মানবত্বের মনোবিলাস। আত্মহারা মাতৃত্বের তো ওখানে প্রকাশ হবে না!···

ভোর হলেই উঠে পড়বে উৎপলা, কিন্তু ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙলো ঝি'র ডাকে। ঝি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকছে উৎপলাকে। কী ব্যাপার! উৎপলা তাড়াতাড়ি উঠে প্রশ্ন করতেই জানতে পারলো, অবন্তী কি একটা জরুরী চিঠি পাঠিয়েছে। চোখে-মুখে জল না দিয়েই উৎপলা চিঠি খুললো—

"পলাদি, রাত্রে এখানে ফিরেই জানতে পারলাম, জীবন চলে গেছে। কোথায় গেল, জানি না। সে নিজে যে-চিঠি লিখে রেখে গেছে, তাও তোমার কাছে পাঠালাম। রাত্রের ট্রেনেই লোক পাঠাচ্ছি তোমার কাছে। এর পর কী করা দরকার, অবিলম্বে জানাও।

ইতি—অবন্তী"

ওরই মধ্যে জীবনের লেখা একটা চিঠি রয়েছে। উৎপলার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে যেন। জীবন লিখেছে :

"শ্রীচরণকমলেষু,

মা,-মাসিমা! আপনাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করছি,—আমি মাতাপিতৃ-পরিচয়হীন বালক। পৃথিবীতে আমার কেউ নাই, কিছু নাই—এই সত্যজ্ঞান আমাকে সব সময় ডাক দিচ্ছে তাঁর চরণ-পানে, যিনি বিশ্বজগতের পিতামাতা! আপনাদেব অগাধ স্নেহ-ভালবাসা আমাকে আট্‌কে রাখতে সমর্থ হোল না—ক্ষমা করবেন। অভিনয়ের মিথ্যে সন্ন্যাসী হয়ে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চলে যাচ্ছি সেই সাধুবাবার কাছে, যিনি আমাকে বিশ্বদেবতার দুয়ারে পৌছে দিতে চেয়েছেন। আমি জানি, বাবা আমায় চরণে ঠাঁই দেবেন। আমার অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনা করবেন।

প্রণত—জীবন"

চোখের জলেই উৎপলার রাত্রি জাগর-ক্লান্ত চোখদুটো ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন! কে জীবন উৎপলার? যাক্ গে না! কেন উৎপলা তার জন্য কেঁদে মরছে? না-না-না! জীবন যে উৎপলার জীবনাপেক্ষা প্রিয়—জীবন যে উৎপলার··· কে জানে জীবন তার কে!

—গাড়ী আনতে বল, এখুনি বেরুতে হবে—বলে উৎপলা তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বেরিয়ে পড়ল শিশু-বিদ্যালয়ের পথে। কিন্তু কি হবে সেখানে গিয়ে? জীবন তো সেখানে নেই! দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে উৎপলার বুকের ব্যথাটা দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠলো। গাড়ীর আসনে শুয়ে পড়ল উৎপলা।···